

नवम वर्ष, काष्ठिन, १७७२ ।

सबुज पत्र ।

सम्पादक-श्रीरामच चोधुरी ।

পেনাঙের পথে



১৯১২ সালে আমি একবার মালয় উপদ্বীপে পেনাঙে গিয়েছিলুম। তখন আমি এম্ এ পড়ি। ষাবার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে যাই, আসবার সময় ফিরি তৃতীয় শ্রেণীর বা ডেকের যাত্রী হ'য়ে। যেতে আসতে দিন পনেরো ষোলো ধ'রে বাইরের জগতের একটা অংশ বেশ একটু দেখা-শোনা গিয়েছিল, বিশেষতঃ আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জাতের যাতায়াত সম্বন্ধে তল্ল একটু অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছিল। এখন এক যুগ কেটে গেলেও এই ভ্রমণের সব দৃশ্য আর ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসছে।

ক'ল্কাতা স্টেডেন-গার্ডেনের সামনের ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়ল এক শুক্রবার বেলা তিনটে আন্দাজ। ক'ল্কাতা থেকে কালাপানী হ'চ্ছে আনুমানিক নব্বুই মাইল নদীপথ, কিন্তু কালাপানী পঁউছুতে জাহাজ আমাদের নিয়ে ফেললে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টার উপর—রবিবার-দিন দশটা আন্দাজ আমরা সমুদ্রে প'ড়লুম। শুক্রবার যাত্রা ক'রে জাহাজ খিদিরপুরের ডেকের কাছে আটকে রইল সাতদিন। রাতে কিছু কিছু মাল নিলে, আর বিস্তর ছাগল ভেড়া তুললে। জাহাজের ব্যাপার, সব একেবারে নোতুন, তার উপরে আবার নানারকমের আওয়াজ, গোলমাল। এ সবে রাত্রে ঘুম হ'ল না। তার পরদিন তোরে জাহাজ ছেড়ে ডায়মণ্ড-হার্ভর পেরিয়ে বিকালের দিকে সাগ-

রের কাছে এসে আবার দাঁড়াল। শুলুম সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, তাই জাহাজ আর সেদিন এগোবে না। জাহাজ লঙ্গর ফেলে দিলে, আর সমস্ত বিকাল আর রাত্রিটা সাগরের মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাটাতে হ'ল। গঙ্গার মোহানায় বিকালে নদীর বুকে ব'সে দূরে ডাক্তার সবুজ গাছপালার পিছনে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে-ঢাকা আকাশে সেদিন অতি চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা গেল।

এই দেড়দিন তো ভাগীরথীর মধ্যেই আটকা প'ড়ে গেলুম। সময়টার সদ্যবহার করা গেল আমার সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জ'মিয়ে। নানান জাতের লোক, আর তর-বেতরর। ক্যাবিনের যাত্রী বেশী ছিল না। যে কয়জন যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী হিঁদু আমি একাই ছিলাম। আর জাহাজের ডাক্তারটী ছিলেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণসন্তান।

প্রথমেই আলাপ জমানো গেল আমার ক্যাবিনের সহযাত্রী একটী বিহারী মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনি যাচ্ছিলেন জাপানে, সাবান না কি তৈরী করা শিখতে। বেশ সদালাপী প্রিয়ংবদ শিক্ষিত যুবক, গ্যাশানালিফট, নানা দিকে খোঁজখবর রাখেন। সব বিষয়ে বেশ বুদ্ধিমান ব'লে মনে হ'ল। আরো দেখলুম যে ইনি একটু ধর্ম-প্রাণ মুসলমান। দেখতুম যে নমাজ-টমাজ নিয়মমত প'ড়তেন, আর মাঝে মাঝে বেশ মন দিয়ে কোরাণও প'ড়তেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে তিনি আরবী জানেন না, বা দু চার কথা যা জানেন তা কিছুই নয়, তবুও তিনি কোরাণ প'ড়ে মনে শান্তি পান। এ ভাবটী আমি আরও অনেক মুসলমানের দেখেছি—আরবী না বুকেও ভক্তিভাবে কোরাণ প'ড়ে সহজেই পুণ্যের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ

লাভ করেন, আর ঈশ্বরের অনুমোদিত ধর্মকার্য্য করছেন জেনে বেশ একটু আধ্যাত্মিক আরাম পান। হিন্দুদের মধ্যেও এই ভাবটা বিয়ল নয়। বহু পূর্বে কলকাতায় দেখেছিলুম, এক neo-ক্ষত্রিয় স্বর্ণকারের দোকানের ভোজপুরী দরওয়ান, সদর সড়কের উপরে টুলে বসে, টামের ঘড়ঘড়, মোটরের ভেঁপু, পথচলতি লোকের কথাবার্তা প্রভৃতি

মারকম আওয়াজের মধ্যে তারস্বরে সংস্কৃত গীতা পড়ছে। দেখে মনে ভারী পুলক হ'ল। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার পাঠ শুনে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, “মহারাজ, আপ গীতা পড়তে হৈ, আছী বাত ; আপ সনস্ক্রিৎ জানতে হৈ ?” তাতে সে একটু বিরক্ত-মতন হ'য়ে বললে, “আরে বাবু, সনস্কিরিৎ জান্লা-সে কা হোই, খালি একরা পাঠসে জৌন্ পুন্ বায়, উ সমুঝ্লাসে কম নৈখে,—সংস্কৃত জেনে কি হবে, খালি এর পাঠে যে পুণ্য হয়, সে বোঝার চেয়ে কম নয়।” অর্থাৎ কিনা “আবৃষ্টিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।” এই যে না বুঝে শাস্ত্র বা মন্ত্র আওড়ানো, এটা হচ্ছে যে জাতীয় culture অর্থাৎ মানসিক আর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন কোনও মানুষ মেনে নিয়েছে, সেই culture-এর সঙ্গে যোগ রাখার একটা প্রয়াসের বিকার মাত্র। সমাজগত cultural জীবনে হয়তো এর একটা স্থান আছে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে এর স্থান কতটা, সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। আবার কোনো জাতির পক্ষে কোন ভাষায় মন্ত্র আওড়ানো বা কোন রকমের অনুষ্ঠান তার যথার্থ নিজস্ব culture-এর পরিপোষক হ'তে পারে, তা নিয়েও বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু সে সব তর্ক, সে-সব বিচার এখন এক্ষেত্রে তুলবো না। বিষয়টি বিশেষ জটিল। আপাততো, যাঁরা সংস্কৃত বা আরবী না বুঝেও খুব নিবিষ্ট

মনে বা ভক্তিবোধে গীতা বা কোরা পড়েন, তাঁরা aesthetes in sound, অর্থাৎ কেবল ধ্বনিবিশেষ থেকে আনন্দ-রস সংগ্রহ করবার শক্তি রাখেন বলে, তাঁরা শব্দের মোহ থেকে ধর্মের ভাব-বিলাসে পঁউছুতে পারার যোগ্য সরল আর বিশ্বাসপূর্ণ মনোবৃত্তির অধিকারী বলে, আর তাঁদের একটা দিকে একাগ্রচিত্ততা আছে স্বীকার ক'রে, আমি তাঁদের অশ্রদ্ধা করি না।

অবাস্তুর কথা থাক। আমাদের এই বিহারী সহযাত্রীটী নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রতেন। এক ডাক্তার-বাবু ছাড়া শিক্ষিত লোক আর কেউ জাহাজে ছিলেন না, তাই এঁর সঙ্গে জাহাজে ক'দিনে একটু ঘনিষ্ঠতা ঘ'টেছিল। এখন কিন্তু এঁর নামটা মনে প'ড়ছে না, যদিও বারো তেরো বছরের পরেও ভদ্রলোকের মুখটা ও চেহারাটা স্পষ্টভাবে মনে আঁকা রয়েছে। জাহাজের বন্ধুত্ব, আর কোনও শহরে এক বাসায় থাকার জন্তু বন্ধুত্ব, এ দুটা বড়ো চমৎকার জিনিস। যতদিন জাহাজে আমরা একসঙ্গে ভাসছি, বা যতদিন একত্র এক বাড়ীতে বাস ক'রছি, এক ঘরে সকালসন্ধ্যা খাওয়াদাওয়া ক'রছি, এক বৈঠকখানায় ব'সে আড্ডা দিচ্ছি, ততদিন কী ঘনিষ্ঠতা, কী বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলা, পরস্পরের সঙ্গে চিরদিন ধ'রে চিঠির আদানপ্রদান রাখবার কী প্রতিশ্রুতি! তারপর জাহাজ গন্তব্য স্থানে পঁউছে গেলেই, বা বাসা বদলালেই, সব ইতি। বেশ মনে আছে এই আট দিনের মধ্যেই পরম-অস্বস্ত-হ'য়ে-ওঠা বিহারী বন্ধুটির নামধাম সব লিখে নিয়েছিলুম, তিনিও আমার নামঠিকানা নিয়েছিলেন,—কিন্তু আট দিন পরে পে নাড়ে যে ছাড়াছাড়ি, তারপর আর দেখা হয় নি, চিঠি লেখাও হয়

মি। বিহারী ভদ্রলোকটি জাহাজের কথা বেশ বড় একখানি উদূঁ চিঠিতে লিখছিলেন। ব'ললেন যে “জমানা” ব'লে এক উদূঁ সাময়িক পত্রিকা বার হয়, তাতে প্রকাশ করবেন। এই “জমানা” কাগজ কয় খণ্ড এঁর কাছে ছিল। বানান ক'রে ক'রে তখন উদূঁ প'ড়তে শিখছি। এই কাগজের উদ্দেশ্যসূচক বচন হিসেবে একটী ফারসী বয়েৎ তোলা র'য়েছে দেখলুম—“অগর্ জুমানহ্ বা-তু ন-সাজ্জদ্, তু বা-জুমানহ্ সাজ্জ” —যার ভাবার্থ হ'চ্ছে, “যদি যুগ তোকে না মানে, তুই যুগকে মেনে চল।” বেশ জ্ঞানবানের মতো কথা ; সকলেই এই কথা মেনে চললে ছুনিয়া বড়ো শাস্তির ছুনিয়াই হ'ত !

আমাদের জাহাজের ডাক্তার বাবুটি বেশ লোক ছিলেন। ফর্সা চেহারা, গৌফ ছাঁটা, চোখে সোনার চশমা, দোহারা গড়ন, একটু ভারিক্কে রকমের লোক। তাঁর নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর বেশ একটা স্বাভাবিক বোধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সৌজন্য ক'রে তাঁর ক্যাবিনে প্রবেশ ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার অধিকার আমায় দিয়েছিলেন। জাহাজে ডাক্তারী ক'রলে লোকে ডাক্তারী ভুলে যায়, এরকম একটা কথা শুনেছিলুম;—দেখে শুনে মনে হ'ল কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। জাহাজে শ'তুই যাত্রী চ'লেছে, আইন-মোতাবেক জাহাজওয়াল কোম্পানীকে একজন ডাক্তার রাখা চাইই। দশ বারো বছর আগে, যখন আমি পেমাঙ যাই, তখন পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে যে-সব জাহাজের ক'লকাতা বন্দরের সঙ্গে যোগ ছিল, সে-সব জাহাজে ডাক্তারীর কাজ বেশীর ভাগ বাঙালী এল্-এম্-এস্ এম্-বি-রাই ক'রতেন। এখন কি অবস্থা জানি না। আমাদের ডাক্তার বাবু সকালে উঠে ডেক-যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে একবার রৌঁদ

ঘুরে আসতেন। অসুখটসুখ তেমন তো কারু একদিনের জন্ম দেখিনি। একদিন ডাক্তারের ঘরে ব'সে আছি, এমন সময়ে দেখি, একজন ইংরেজ অফিসার এসে হাজির। কলে আঙুল কেটে গিয়েছে, কি ওষুধ লাগাতে হবে তা নিজেই ব'লে চেয়ে নিয়ে গেল। পেনাঙের পথে মাঝে এক বিকাল এক রাত ধ'রে খুব ঝড়বৃষ্টি হ'য়েছিল, তাতে ঠাণ্ডায় হাওয়ায় পরিশ্রমে একজন খালাসীর নিউমোনিয়া হয়, ডাক্তার বাবুকে গিয়ে তাকে দেখতে হ'য়েছিল। ষাঁই হোক, প্রায়ই বেকার হ'য়ে ডাক্তার বাবুকে ব'সে থাকতে হ'ত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এটা ওটা কথা কইতুম। অনেক বিষয়ের সন্ধান চাইতুম, যা তাঁর প্রমাণের অভিজ্ঞতায় পড়া উচিত ছিল ব'লে মনে হ'ত। ডাক্তার বাবুর কিন্তু বড়ো বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখতুম না। তবে তিনি সাহিত্যানুরাগী লোক ছিলেন, সাহিত্য-চর্চা ক'রেই সময় কাটাতেন। সঙ্গে তিনি নিয়েছিলেন মাদ্রাজের কোন পাকা ব্যবসাদার প্রকাশক কর্তৃক ছাপিয়ে প্রকাশিত, রেনন্ডসের “মিস্ট্রীজ্ অভ্ দি কোর্ট্ অভ্ লগুন,” বারো না ষোলো ভলুমে। জাহাজ খানা যাচ্ছিল জাপান অবধি—জাপান পর্যন্ত যাওয়া আর জাপান থেকে ফিরে আসা, এ কয় সুদীর্ঘ সপ্তাহ কাটাবার জন্ম তিনি একমাত্র সম্বল ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন এই বইখানি, যতদূর মনে আছে আর কোনও বই তাঁর কাছে ছিল না। আর দেখতুম এটা তিনি বেশ তারিয়ে তারিয়ে প'ড়তেন।

ডাক্তারেরই স্বগোষ্ঠীর আর একটা লোক জাহাজে ছিল—একটা পাঞ্জাবী মুসলমান যাত্রী—সে নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দিলে, ব'লে যে মালয় উপদ্বীপে কোন রবারের বাগানে ডাক্তারী করে—

সিঙ্গাপুরে যাবে। লোকটা নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু কথাবার্তায় চালচলনে বুদ্ধিমত্তায় ভাব্যতায় ৫০৮ বছর ধ'রে কলেজে-পড়া ছেলের মতো কিছু দেখলুম না। আমাদের ডাক্তার বাবু একে অবিমিশ্র তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন—আর এও তাতে কোনরকম আপত্তির বা অপছন্দর ভাব দেখায় নি; বরং ডাক্তার এলে বেশী কথাটথা ব'লত না, একটু সমীহ ক'রেই চ'লত। ডাক্তার বাবু আমায় ব'ললেন যে, বিস্তর মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী শিশি-ধোওয়া বা কম্পাউণ্ডার মালয় দেশে গিয়ে ডাক্তার ব'নে বসে, আর কফি রবার বা নারকলের বাগানে গিয়ে চাকরী নিয়ে ভারতীয় আর চীনে কুলীদের মধ্যে সহস্রমারী হ'য়ে থাকে। আমাদের এই পাঞ্জাবীটা যাচ্ছিল তার কর্মস্থলে, সম্মুখ। লোকটাকে দেখে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বয়সের ব'লে মনে হয়, কিন্তু মাথার চুল অনেক পাকা, খুঁতিতে একটু দাড়ী, রঙ কালো, খর্ব্বাকার, গালে মুখে না-কামানোর দরুণ খোঁচা খোঁচা দাড়ী, মাথায় একটা ময়লা কালো ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপী, পরণে লাল ডুরে ছিটের তিলে ইজের, গায়ে গলা-খোলা ক্যানানোর চেক-কাপড়ের কোট, আর খুব বাহারে এক টাই গলায়, অতি ময়লা এক কলারকে অবলম্বন ক'রে। পাঞ্জাবী ব'ললে যে দীর্ঘকায় সৌষ্ঠবময় গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, তলোয়ারের মতো-নাক, শ্মশ্রুমান শিখ বা রাজপুত বা মুসলমানের ছবি আমাদের মানসচক্ষে এসে পড়ে, এ লোকটির চেহারায় তার কিছুই নেই। নোতুন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে কর্মস্থানে যাচ্ছে; সঙ্গে একটা বৃদ্ধা, বীণ হ'তে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হ'তে পারে। বছর তেরো-চোদ্দর গৌরবর্ণ একটি মেয়ে, অতি হ্রস্বকায়, পরণে গোলাপী

রঙের জাপানী বা ফরাসী রেশমের পাজামা, জরীদেও । নাগরা জুতা
 পায়ে, গায়ে সবুজ রঙের ছোবানো মলমলের পিরিহান, তার উপরে
 সাদা, সূতোর ফুলতোলা বিলিতি মলমলের দু'পাট্টা বা চাদর—এই
 পোষাকে দু' একবার জাহাজের মধ্যে সরু পথে আমাদের দৃষ্টিগোচর
 হ'য়েছিল । এই পোষাকের লাল সবুজ রঙের দুটো তুলির পোঁচ
 যেন জাহাজের ভিতরে বাইরে সুন্দর জগতের একটা স্বপ্ন জাগিয়ে
 তুলত । জাহাজের খালের দুর্গন্ধের মধ্যে, কয়লার গুঁড়োর ছড়াছড়ির
 মধ্যে, এক পাশে জড়ো ক'রে রাখা চীনে বাবুচীখানার আর গোয়ানীজ
 রান্নাঘরের এঁটোকঁটা আলুর খোসা কপির পাতার মধ্যে, ইঞ্জিনের
 রকমারি বিকট ভীষণ ককশ ধ্বনির মধ্যে, হঠাৎ একবার আধবার
 দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে মনে হ'ত যেন মোগল যুগের ছবি থেকে
 কোনও শাহজাদী নেমে এল,—যদিও মোগল শাহজাদীদের পোষাকটা
 ঠিক এরকম নয়, আর ছবিতে তাদের মুখ বোর্কা বা চাদরে ঢাকা
 থাকে না, খোলা ক'রেই আঁকা হয় । জাহাজে তুলে দিতে এদের
 সঙ্গে আত্মীয় কেউ আসে নি, দূর পাঞ্জাবেই এদের আত্মীয়স্বজনের
 কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হ'য়েছিল বোঝা গেল । মেয়েটা আর তার
 সঙ্গে রুদ্ধা দু'জনকেই বোর্কা বা ঘেরাটোপ পরিয়ে জাহাজে তোলা
 হয় ; “মক্কা-বুড়ীর” সাজে এদের পা কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের সিঁড়ি
 দিয়ে ওঠা আর নামা, এই সব যখন দেখছিলুম, তখন এক-গলা
 ঘোমটাদেওয়া বাঙালী মেয়েদের—ছেলেমেয়ে কোলে কাঁধে ফেলে,
 তাঁদের মাঝে মাঝে ঘাড়-ফিরিয়ে মুখ-খিচায়মান কর্তাদের পিছনে
 ছুটতে ছুটতে ট্রেণে ওঠবার সময়ের অবস্থা স্মরণ ক'রেও, এই ঘেরা-
 টোপ পরা, প্রতি মুহূর্তে (না দেখতে পাওয়ার জন্য বোধহয়) প্রায়

হুন্ডী-খেয়ে-পড়া বেচারীদের জন্য • একটু বেশীরকম দুঃখু হ'য়েছিল। জাহাজে ক্যাবিনের যাত্রী বেশী ছিল না, তাই এরা স্বামী স্ত্রীতে একটা ক্যাবিন পেয়েছিল। কিন্তু ক্যাবিনের ভিতরের গরম আর ভাপসা দুর্গন্ধের কথা স্মরণ ক'রলেও আমাদের উপর ডেকের খোলা বাতাসে ব'সে থেকে হুৎকম্প হ'ত; আর সেখানে এই মেয়েটিকে সমস্ত দিন ব'সে থাকতে হ'ত—নিরুপায়, ভারতীয় আশ্রাফ বা ভদ্র মুসলমান ঘরের পর্দানশীন মেয়ের আক্র রাখতেই হবে—একি যে-সে কথা! তার স্বামীর সঙ্গে দূর দেশে ঘর ক'রতে চ'লেছে—এটা ভেবে যে একটু আনন্দ হবে মান, তার জো ছিল না— কারণ এই লোকটার মুখগানা আর ধরণ-ধারণ মনে প'ড়ত, আর সঙ্গে সঙ্গে উপরে ডেকে এসে আমাদের কাছে তার রবার লার কফী বাগানের মাদ্রাজী কুলীমেয়েদের সম্বন্ধে দুটো রসিক কথা ব'লে আমাদের খুশী ক'রে দেবার চেন্টার দৃশ্যটীও মনে আসিত।

আমরা এই ক'জন তো হ'লুম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—বিহারী, জাপানযাত্রী, এই পাঞ্জাবওয়াল, আর আমি। দু'জন কচ্ছী খোজা ব্যবসায়ী, বোম্বাইয়ে মুসলমান, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে যাচ্ছিলেন। একজনের নাম হাজী মোমিন ভাই, আর একজনের নাম হাজী আব্দুল্লা ভাই—না-এরকম একটা কিছু। দু'জনেই সুপুরুষ দেখতে—মুখে চাপদাড়ী, মুসলমানী কায়দায় গৌফ খুব ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা,—বেশ অভিজাত শ্রেণীর উপযুক্ত, রূপকারের উপযুক্ত লম্বা সরু সরু আঙুল, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা,—আচারে ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, আঙুটিতে চেনেতে, আতরের খোশ-বো'তে ধনী ব'লে বুঝতে বেশী দেরী হ'ত না। একটু comfortable

bourgeois-সুলভ স্কুলোদর,—সঙ্গে চাকর ছিল, রোজই মুর্গী মেরে পোলাও কোর্মা রेंধে খেতেন। নেমাজ পড়তেন নিয়ম মতো, আর তসবীর মালা নিয়ে ঘুরতেন। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠান পালনের আর কোনও' বালাই রাখেন নি। আমরা যে সময়ে যাত্রা করি, সেটা তখন হ'চ্ছে মুসলমানদের রমজান মাস, রোজার উপবাসের সময়। এঁরা তখন রোজা রাখেন নি। আর এদিকে আমি দেখেছি, জাহাজের বাঙালী মুসলমান খালাসী সারাদিন উপোস ক'রে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটছে, আর সন্ধ্যার সময় চাঁদ দেখে, বড়ো টিনের পরাতের উপর ছোলা ভিজানো আর পেঁয়াজরশুনের কুচী রেখে চার পাঁচ জনে চিল চারদিকে ঘিরে ব'সে সমস্ত দিনের পর নাস্তা ক'রছে। আমি মোমিন নাট্ট আকুলা ভাইদের জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম,—“সাহেবান্, আপলোন্ নামে হাকর রোজা রাখতে নেহীঁ কোঁ ?” তার উত্তরে এঁরা বেশ ব'লোচ্ছলন, “বাবু সাহেব, মোসাফেরের আনার রোজা কি ?”—অর্থাৎ “পথি শূদ্রবৎ আচরেৎ।” মোমিন ভাই আকুলা-ভাইরা যাচ্ছেন যবদ্বীপে। এঁরা লাখো লাখো টাকার চিনি যবদ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে আমদানী করেন প্রতি বৎসর, হাজার হাজার টাকার ছোটোখাটো সহরের বাজার এঁদের মুঠোর মধ্যে,—বোম্বাইয়ে, কল্কাতায়, পূর্ববঙ্গে নানা জায়গায় এঁদের আড়ৎ আছে। যবদ্বীপে গিয়ে এঁদের চিনির কারবারের সম্বন্ধে কি সব ব্যবস্থা ক'রে আসবেন ব'লে যাচ্ছেন। এই কোম্পানীর জাহাজেই এঁদের চিনি আসে। আমার মনে হ'ল, এঁরা বিনা খরচার টিকিটে যাচ্ছেন, কোম্পানী বড়ো খ'দের ব'লে খাতির ক'রে স্থান দিয়েছে। জাহাজওয়ালারা যে সব মহাজনের মাল-টাল বেশী ক'রে বয়, মাঝে মাঝে প্যাগেজটা-আস্টা

দিয়ে তাঁদের মান্য রাখে। আর স্বভাবতই এই সব মহাজন দরকার প'ড়লে নিজেদের প্রাপ্য এই সম্মানটুকুর অধিকার ছাড়েন না। পোম্বাভালাস্ বেকটাঙ্গা পিল্লেই হ'চ্ছেন তামিল চেট্টী মহাজন, ক'লকাতা থেকে মাদ্রাজ, টুটিকোরিন, জাফনা, কোলোম্বো তাঁর মস্ত আমদানী রপ্তানী কারবার আছে, অনেক লাখ টাকার ব্যবসা—তিনি কালীঘাটের চেট্টীদের মন্দিরে স্ত্রীকৃত্য বা কার্তিক ঠাকুরের অনেক টাকার জহরতের গয়না ক'রে দিয়েছেন; তিনি তাঁর ছেলে আর ভাইপোকে কোলোম্বো পাঠাতে চান ক'লকাতা থেকে—তাঁর দুখানা প্যাসেঞ্জ টিকিটের দরকার। ক'লকাতার এক বড়ো ইংরেজ সম্রাট আর জাহাজওয়াল কোম্পানী তাঁর মাল বয়—চেট্টী টিকিটের দরবার করবার জন্য একেবারে আপিসের বড়ো ঘরে এসে হাজির। কি? না, “চাব্, দোটে টিকিট দেও, জাটী নেই মাদ্রাজ, দোটে ফাটু, কলাচ, কোড়োম্বো।” কালো ভাতের হাঁড়ির মতো গায়ের রঙ, মাথার আঁকেকটা কাঁয়ে উড়ে খোঁপা বাঁধা, তার উপরে লাল ক'লকাতা মাদ্রাজী পাগড়ী, সমস্ত কপাল জুড়ে সাদা বিভূতির চিহ্ন, গোঁফ-দাড়ী পরিষ্কার ক'রে কামানো, খালি গায়ে বুকে হাতে বিভূতির ছাপ, গলায় মস্ত চওড়া জরীপাড়ের ধবধ'বে সাদা মলমলের চাদর জড়ানো, পরণে আধ হাত আলুতারঙের পাড়ওয়াল কাপড়, তার কাছার একটা খুঁট ঝুলছে—নখের মতন বড়ো বড়ো হীরের দুই কানফুল কালো রঙের মধ্যে দুই কানে জল্জল্ ক'রছে, খালি পা— এ হেন দ্রাবিড় সভ্যতার মূর্তিমান অবতার এসে আমাদের ক্ষীণকায় স্কচ্ বড়ো সাহেবকে জড়িয়ে ধরে আর কি! সাহেব চেয়ারে ব'সে তটস্থ, ন যর্যো ন তস্মো! পিল্লের কদর তিনি বেশ বোঝেন, তাকে

চটাতো চান না, অথচ দুখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট দিতেও একটু ইতস্ততো ক'রছেন—এমন সময়ে, “চাব্, তুম্ দো টিকিট্ দেও, জাটি নেই” ব'লতে কলতে, মুখে চুমুকুড়ি দিতে দিতে চেড়ি অনর্গল সাহেবের সামনে এসে, টেবিলের ওধারে সাহেব ব'সে আছে, বুকে হাত বাড়িয়ে তার খুঁতী ধ'রে চুমু নিতে লাগল! সাহেব তো তখন প্রমাদ গণে' চীৎকার ক'রে উঠলেন—Robertson, Robertson, come quick, tak' this fellow awa', gie him twa first-class to Colombo—man, he is trryin' to kiss me! আপিসের যে বাবুটী ফ্রী প্যাসেজের টিকিটে নামটাম লিখে সাহেবের দস্তখত করিয়ে টিকিটটা পাস করিয়ে আনলেন, চেড়ীমশায় খুসী হ'য়ে তাঁকে দুটা বাঁধা সিকি উপহার দিয়ে ছুটে পার্লিয়ে গেলেন, পাছে আর কেউ কিছু চেয়ে বসে, বা যাঁকে এই অর্থ তিনি দিলেন, তিনি ফিরিয়ে দেন।

ক্যাবিনের যাত্রী এই ক'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। জাহাজ কালাপানীতে পড়বার পরে ক্যাবিনের যাত্রী আর একটা হ'ল— একটা বাঙালী মুসলমান ছেলে। জাহাজে বিস্তর ভেড়া ছাগল ষাচ্ছিল। কে পাঠাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোনও ধবর আমার জানা ছিল না। পরে সব জানতে পারি। বেলিলিয়স্ হ'লে একজন ইহুদী এই জানোয়ার চালানের কাজ ক'রে এককালে খুব দু-পয়সা রোজগার করে। ছাগল, ভেড়া বাঙলা দেশে বা পশ্চিমে কিনে, জাহাজে ক'রে ক'লকাতা থেকে মালয় উপদ্বীপে পেনাঙ্ সিঙাপুর অঞ্চলে চালান হয়, সেখানে সব কেটে বিক্রী হয়। (গরু বোধহয় যায় না, কিন্তু ক'লকাতা থেকে মুন দিয়ে জারিয়ে গোমাংস

খুব যায় ওদেশে,—সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়া গেল যে, এই রকম jerked beef বছরে কত লক্ষ মণ ক'রে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী হয়—নিখিল ভাবত-গোরক্ষনী-সভার দৃষ্টিও নাফি এদিকে আকর্ষিত হ'য়েছে)। বেলিলিয়স্ এখন পরলোকে। বেলিলিয়সের বাড়ী ছিল হাওড়ায়, বেলিলিয়সের বংশে কেউ নেই, মাত্র তাঁর বিধবা স্ত্রী ছিলেন,—কিছুকাল হ'ল তিনিও মারা গিয়েছেন। তাঁর মস্ত বাড়ী, বাগান সব তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীকে দান ক'রে গিয়েছেন, কিছু টাকাও দিয়ে গিয়েছেন, সেই বাড়ীতে এখন হাওড়া বেলিলিয়স্ স্কুল স্থাপিত হ'য়েছে। বেলিলিয়সের ব্যবসা এখন চালাচ্ছেন—অর্থাৎ ১৯১২ সালে চালাচ্ছিলেন—ভূগলী না বর্দ্ধমান জেলার কতকগুলি মুসলমান। শুনলুম অন্য রপ্তানী আর আমদানি কাজও এঁদের আছে। এঁরা বেশ ভদ্রলোক। পেনাঙে এঁদের এক আফিস আছে। পেনাঙে নেমে এঁদের আফিসেই আমায় ডেরা নিতে হ'য়েছিল, এঁদের বিশেষ সৌজন্যের পরিচয়ও পেয়েছিলুম। পেনাঙে এই তিন চারজন বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী, তাঁদের বাঙালী হিন্দু কেরাণী দু একজন নিয়ে একটা আড্ডা জমিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে জাহাজের বা হাঁসপাতালের ডাক্তার আর অন্য অন্য ভ্রাম্যমাণ বা 'থিতু' বাঙালী ভদ্রলোকের সমাগম মাঝে মাঝে হ'ত। বেলিলিয়স্ কোম্পানীর নামে তখনও ব্যবসাটা ছিল। জানোয়ারগুলোকে জাহাজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যার, তাদের ঘাস জল দেয় ৪:৫ জন ক'রে নীচ শ্রেণীর ক'লকাত্তাই মুসলমান—যারা বেশীর ভাগ পশ্চিম থেকে এসে ক'লকাতার অধিবাসী হ'য়ে গিয়েছে, বাঁকা বাঙলা বা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী যারা বলে, ক'লকাতার যত বাবুর্জীখানা আর কাফীখানা যারা সরগরম

রাখে, যাদের মধ্যে থেকে গাড়োয়ান, কসাই, ইংরেজ আর ফিরিজি বাড়ীর চাকর-খানসামা, আর গাঁটকাটা গুণ্ডা প্রভৃতি হয়। এখন আমাদের জাহাজে এই বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীদের একটি ছেলে যাচ্ছিল, ১৮।১৯ বছর বয়সের হবে, পেনাঙে তাদের আফিসে কাজকর্ম শিখবে বলে। এদের ফার্মের একজন বুড়ো চাকর, যে অনেকবার ছাগল-ভেড়ার তদারকে ক'লকাতা-পেনাঙে যাওয়া-আসা ক'রেছে, সে ছিল সঙ্গে, আর বুড়ো ছেলেটিকে খুব যত্ন করে' নিয়ে যাচ্ছিল। ভেড়া ছাগলের মধ্যে, ষ্টীমারের শামিয়ানা-ঢাকা খোলা ডেকের উপর, কলকব্জার আশেপাশে, জানোয়ারগুলির তদারক করবার জন্য লোক-গুণ্ডা যেখানে মাথাগোঁজ্বার জায়গা ক'রে নিয়েছিল, সেখানে এদেরই মধ্যে ছেলেটীও প্রথম ২৪ রাত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কালাপানীতে জাহাজ প'ড়লে পর, ছেলেটীর চক্কর লাগে। তখন বুড়ো চাকরটী জাহাজের একজন সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে, তার সুপারিশে জাহাজের সাহেব কেরণীকে বলে ছেলেটীকে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিনে, যেখানে আমাদের আব্দুল্লা ভাই মোমিন ভাইরা ছিলেন, সেখানে এনে হাজির ক'রলে। তখন জাহাজ নীল জল কেটে বেশ মৃদুমধুর দুল্ভে দুল্ভে চ'লেছে; সকালবেলা, প্রথম শরতের মিষ্টি রোদ্দুর, আমরা উপরের ডেকে ব'সে কজনে কথাবার্তা আলাপ-সলাপ ক'রছি—বিহারী মুসলমান ভদ্রলোক, খোজা দুজন, আর আমি; মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু এসে দু চারটী কথা কইছেন। এমন সময়ে আমাদের এই বাঙালী মুসলমান ছেলেটীকে সঙ্গে নিয়ে তার অনুচর 'old Adam' তাঁর মালপত্র ঘাড়ে ক'রে উপস্থিত হ'ল—সঙ্গে সারেংও ছিল,—আশ্বাস দিচ্ছিল ছেলেটীকে।—ক্যাবিনটা বড়ো;

একটা খালি বাস্কের তলায় আসবাবগুলি রাখলে—একটা টিনের তোরং, আর একটা বিছানা। ছেলেটা অতি কাচুমাচু ভাবে এল। বুড়ো তাকে বেশ উৎসাহ দিয়ে বললে—“এসো, ভিতরে এসতে ভয় ক’রো না—এই তো খোজারা র’য়েছে—এনারাও মোসলমান,—লাও, এক কাজ করো—তোমার তোরং থেকে কোরাণ-শরীফখানা বের করো—বেশ, এখন এক কাজ করো, ওইখানে ওই বাতীটার গায়ে ওখানা টেঙিয়ে রাখো।” তার কথামতো ছেলেটা রঙীন ছিটের আর লাল সালুর থ’লেয় ঢাকা, ফিতে দিয়ে বাঁধা মস্ত একখানা বই বার ক’রে বিজলী আলোর ডাঁটীতে ঝুলিয়ে দিলে। তাকে ঠিকঠাক করে বসিয়ে দিয়ে বুড়ো চ’লে গেল। কোরাণ-শরীফখানা হঠাৎ বার ক’রে বাতীটার গায়ে “টেঙিয়ে” রাখবার উদ্দেশ্যটা বুঝলুম না—তবে বোধহয় ক্যাবিনের দখলদার খোজা-মিঞাদের কাছ থেকে স্বধর্ম্মী-হিসাবে বাঙালী মুসলমান ছেলেটি যাতে একটু সহানুভূতি পেতে পারে, সেই ইচ্ছেয় বুড়ো তার মনিবের বাড়ীর ছেলের ইসলামীত্ব এই রূপে জাহির ক’রে গেল। খোজারা কিন্তু সে কারণে যে তার প্রতি বিশেষ “আন্তি” দেখালে, তা মনে হ’ল না। যাক—ছেলেটা অতি নিরীহ ভালোমানুষ ধরণের; ভদ্রঘরের বাঙালী হিন্দু ছেলের থেকে কোনও পার্থক্য চেহায়ায় চালচলনে কথাবার্তায় ধরা যায় না। আমি এর সঙ্গে আলাপ জমালুম। তখন বেলিলিয়স্ কোম্পানীর খবর পেলুম। কিন্তু ছোকরা বড়ো লাজুক—বেশীক্ষণ সে তার ভেড়ার রাখালদের মধ্যে গিয়েই কাটাত, ক্যাবিনে বোধহয় রাত্তিরে খালি খুমোবার জন্য আসত। এর অনুমতি নিয়ে কোরাণ-খানা দেখলুম—চামড়ায় বাঁধা বড়ো বই, মোটা মোটা হরফে আরবী মূল, সঙ্গে সঙ্গে নীচে উদুতে

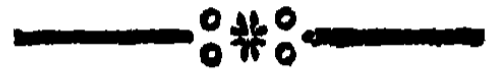
তরজমা, পাতার আশে-পাশে উদূতে টীকা। মূল বা তরজমা দুইয়ের একটীও বইয়ের মালিক প'ড়তে পারে না। বইখানি সঙ্গে আছে, ইসলামীর নিশানা হিসাবে—আর বোধহয় potent charm হিসাবে; —রমায়ণমহাভারতের মতন কোরাণ ঘরে রাখলে বা সঙ্গে থাকলে বিপদ-আপদ হয় না, ভূত-প্রেত জীন-শয়তানের অদৃশ্য উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ছোকরা বছরখানেক, কি তার বেশীর জন্ম পেনাঙে যাচ্ছে। সঙ্গে কিছু বাঙলা বই নিয়ে যাচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তার তোরং থেকে কতকগুলি বাঙলা বই বার ক'রে আমায় দেখালে। মীর মশারর হোসেনের “বিষাদ-সিন্ধু” বোধহয় একখানা ছিল, আর ছিল “তজকিরাত-আওয়লিয়া”র বাঙলা অনুবাদ, গিরীশচন্দ্র সেন কৃত, নববিধান সমাজ থেকে প্রকাশিত। বইখানি হ'চ্ছে সূফী ভক্ত আর সাধকদের জীবন-চরিত নিয়ে, মূল বই ফার্সী ভাষায়। অতি উপাদেয় বই, আগে আমার একটু আধটু পাতা-উল্টানো ছিল, জাহাজে ব'সে বইখানা ছেলেটির কাছ থেকে নিয়ে একবার ভালো ক'রে পড়ে ফেল্লুম। বইখানার নামপত্রে ইংরিজি অক্ষরে বইয়ের নাম লেখা ছিল—Tazkirat Al-Awliya। গুজরাটী খোজাদ্বয় ইংরিজি প'ড়তে পারেন দেখাবার জন্ম বইখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে বানান ক'রে ক'রে নামটী প'ড়লেন; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—“ইয়ে ক্যা হৈ?” আমি তাদের ব'ল্লুম যে এই বিষয়ের বই। তখন তাঁরা বিষয়ের গুরুত্বটি উপলব্ধি ক'রলেন, তাঁরা বেশ ধর্মপ্রাণভাবে খুশী হ'লেন, আর বাঙলা ভাষারও তারিফ ক'রলেন, যাতে এমন সব আধ্যাত্মিক বিষয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়। আমিও সুযোগ পেয়ে দু চারটে আধ্যাত্মিক বচন—যেমন তাপসী রাবেয়ার জীবন-চরিত থেকে

—তাদের সম্মুখে দিতে লাগলুম ; তাঁরা শুনে ইসলামের মধ্যে কতো সব ভালো ভালো কথা আছে তা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে আগাকে উপদেশ দিলেন, নিজের ধর্মের গৌরবে একটু গদগদ ভাবও হ'লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গৌরবের একটু অংশ, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই সব ভালো ভালো কথার বাহন-হিসাবে বাঙলা-ভাষাকে, আর সমঝদার-হিসেবে বাঙালী জাতকেও দিয়ে ফেললেন ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

পদ্মা ও রবীন্দ্রনাথ ।



পদ্মার একটু বিশেষত্ব আছে—ইহা বিশেষ করিয়া বাংলার নদী । গঙ্গার সহিত ইহার নাড়ির যোগ আছে—কিন্তু পথের যোগ নাই । সমস্ত ভারতবর্ষের ধারাকে হঠাৎ অস্বীকার করিয়া কেমন যেন দুর্দম গতিতে, ভগীরথের শঙ্খ-স্বনিত পথকে উপেক্ষা করিয়া, স্বৈর-শাসনে পাগলী কোন্ দিকে ছুটিয়া চলিল । এ যেন মণিপুর রাজকন্যা পুরুষাচারিনী মৃগয়ামত্ৰা চিত্রাঙ্গদা । ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ পৌরাণিকতার গ্রানিটস্তরের ভিত্তিতে সুদৃঢ় ; বাংলার সমুদ্রমহুনে এখনো শেষ হয় নাই । সমুদ্রের অঙ্ক হইতে নূতন মাটি প্রতিদিনই এখানে আলোতে উদ্ভাসিত হইতেছে । বহু শাখানদীর সঞ্চিত পলিতে বাংলার জমি নিত্য নব-গঠিত, ও প্রতিমুহূর্তেই সরস । ভারতের অন্যান্য নদীর একটি নির্দিষ্ট পথ আছে, কিন্তু পদ্মার মানচিত্র কোনদিন প্রস্তুত হইবে না । এই পথভ্রষ্টা নদী পুণ্যভূমি আৰ্য্যাবর্ত ত্যাগ করিয়া পাণ্ডুবর্জিত অনাচারী ব্যাধিকরাত অধ্যুষিত বাংলাদেশে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত । ইহা কবির মতই খামখেয়ালী । মেঘে গ্লান, শরতে স্বচ্ছ, শীতে শান্ত এই পদ্মা ; কূলে শশ্য, জলে নৌকা এই পদ্মা ; বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে সমাকুল ; বৈশাখের মেঘপতাকার দূর সঙ্কেতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ ; উত্তর তীরের ঝাউঝাড়গ্রামী ঘনায়মান কলগর্জিতা ; স্নেহশীলা জননীর

শ্যার কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নৃত-নয়না; কখনো নৃত্যশীলা
মটিনীর মত দ্রুত চরণচঞ্চল্যে কলহাস্তময়ী; কখনো শবরীদুহিতা
শ্যামা শর্করীর মত উচ্ছ্বসিত কোঁতুকে ধনুনিবন্ধপাণি যুগ্মতীর-
ভূগীরা; শ্রাস্ত-অঞ্চলা শরৎশেষের ক্ষীণশশিকলাটির প্রায় কখনো
দিক্শয্যাপ্রাস্তলগ্না। বর্ণবৈচিত্রাহীন বাংলার সমুদায় প্রাস্তুরতল-
শায়িনী, একাকারা, বিরাট, বিশাল, উদাস, উদার এই পদ্মা; জগতের
সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে দীর্ঘ, সব চেয়ে করুণ, সব চেয়ে একঘেয়ে
একখানি আদিঅস্ত্যহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা।

এ হেন পদ্মার তীরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিশু-কাব্যকলাকে লইয়া
গিয়া বসিলেন। প্রত্যক্ষ সচলতার মত, পৃথিবীর স্পন্দমান নাড়ির মত
বিরাট নদীটি বহিতেছে; উভয় তীরে মৌন লোকালয় চিরদিন নিশ্চল।
পদ্মার ও পদ্মাতীরের এই অপূর্ব দৃশ্য অধিকাংশ লোককেই বিচলিত
করে—আর ইনি তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ইহা কবির চিত্তে গভীর
রেখা অঙ্কিত করিল। নদীর এই অপ্রতিহত অনবচ্ছিন্ন গতি একটি
অখণ্ড সচলতা সমর্পন করিল তাঁহার হৃদয়ে ও কাব্যে।

“আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন
করে’ নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা
করি, তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষপশুর মধ্যে
যে চলাচল, তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগা-
গোড়াই চল্চে; সেই জন্মে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার
সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক
ভাবে পদচালনা করে, অঙ্গ চালনা করে, আমাদের মনটার আগা-
গোড়াই চলেছে। সেইজন্মে এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল

মানস শক্তির মধ্যে বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙচে চুরচে এবং চলেছে—মনের ইচ্ছার মত সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গি এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মত, আর বিচিত্র শস্য-শালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মত।”

(ছিন্ন-পত্র)

বাংলার আব্বাহাওয়াতে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে অনায়াসে সংস্কারকে সে উত্তীর্ণ হইতে পারে। পদ্মাতে যেমন দেখিলাম—তেমনি দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গীত-কলাতে। অন্তত যাহা ধ্রুপদ, এখানে আসিয়া তাহা খেয়াল হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মা যেমন বিশেষ করিয়া বাংলার—কীর্তন তেমনি বিশেষভাবে বাঙালীর—তাহা কিছুতেই আর প্রাচীন রীতিকে না মানিয়া, খোলে করতালে উদ্দাম নৃত্যভঙ্গীতে উদ্ভাল হইয়া উঠিল।

প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা নেশা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে নানা দিক হইতে স্পর্শ করিয়াছে।

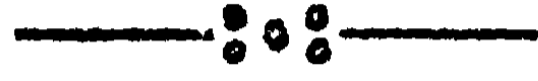
এই সচলতা কবির আর্ট ও কাব্যকে জড়তা হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর্টের পক্ষে জড়তার মত বালাই আর নাই; কোনো অবস্থা বিশেষে বন্ধ হওয়াতেই তাহার সমাধি; গণ্ডি-বন্ধ আর্ট সকল অবস্থার সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারে না—আর সকলেই জানেন একাত্মতার (Sympathy) অভাবই আর্টের মৃত্যুবাণ। এই সদাসচলতাই তাঁহার কাব্যকে চিরনূতন করিয়া রাখিয়াছে। যৌবনে পদ্মার তীরে এই গতির মন্ত্র তিনি লাভ করিয়া সমস্ত জীবন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; অবশেষে জীবনের সায়াছে একদিন শ্রীনগরে মানসোৎকর্ষবলাকার

পক্ষবিধুনে সেই গতিকেই প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলেন
অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।” আর একদিন সেই পুরাতন
পদ্মার গতিকেই মূর্তিমতী দেখিলেন প্রয়াগের গঙ্গা-ঘমুনায়। তিনি
তাই বলিলেন “তাকাস্নে ফিরে, সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে।”

এই চির-জাগ্রত গতিতেই তাঁহার কাব্যের নবীনতার বীজমন্ত্র।
তাঁহার সমগ্র কাব্য-অধিকারের ভিতর কেহ এমন একটিও কবিতা বাহির
করিতে পারিবেন না, যাহা গতিমন্ত্রচ্যুত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের
পক্ষে এই গতির মূলমন্ত্রটি কতখানি তাহা মনে রাখিয়া, আমরা সোনার
তরীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রী প্রমথনাথ বিশী ।

প্রসাধন ।



সৃষ্টির আদিযুগ থেকে স্বভাবসুন্দর রমণীমুখকে সুন্দরতর করবার জন্মে অজস্ররকম চেষ্টা চলছে । দেশে দেশে যুগে যুগে কত প্রসাধনদ্রব্যেরই যে আবিষ্কার হয়েছে, তার আর সংখ্যা করা যায় না ; এবং এই আবিষ্কারকার্যে কবি থেকে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীই সমানভাবে হাত মিলিয়ে আসছে ।

প্রাণীজ, খনিজ, জলজ, উদ্ভিজ্জ—কোন বস্তুই এই প্রসাধন-তালিকা হ'তে বাদ পড়েনি । চন্দন চূয়া কুঙ্কুম কস্তুরী, লোধ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, সিন্দূর, কজ্জল, কাঁচপোকা, গুব্বেরপোকা, রুজ পাউডার, রং, এমন কি গোবর পর্য্যন্ত ফেলা যায় না—ঋষি কপালের লেখা !

যুগে যুগে রুচি অনুযায়ী প্রসাধনদ্রব্যের বিভিন্নতা থাকলেও ভিতরের ভাবটি কিন্তু চিরন্তন—রমণীমুখকে সুন্দর করতে হবে । চেষ্টা যত্নের প্রাবল্য দেখে এক এক সময় সন্দেহই হয় যে, রমণীমুখ আসলে বোধ করি সুন্দর নয়, আর রমণীরা তা জানেন বলেই আভরণ এবং আবরণের এত ঘটা!—এ প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য অসম্ভব ; কারণ পুরুষের চোখ রমণীমুখের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করবার জন্মে সৃষ্টি হয় নি, আর রমণীর মন পুরুষের কাছে ঠিক মনের কথাটা ভুলেও স্বীকার করবার জন্মে প্রস্তুত নয় । কিন্তু আসল জিনিষকে বাড়াবার নামে

নকল দিয়ে আসলকে ঢেকে ফেলাটা প্রসাধনের একটা গোপন টাটকা, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে হিসাবে গুণনকে শ্রেষ্ঠ প্রসাধন বলা যেতে পারে, কেননা তা পূর্ণ-আবরণ; সুতরাং সৌন্দর্য্য বাড়াবার চরম উপায়। গুণনমোচনে সৌন্দর্য্যের নানা ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। প্রসাধন বাদ দিলেও রূপের অনেক ত্রুটি ধরা পড়বে, এই আশঙ্কা রমণীর প্রসাধনপ্রিয়তার একটা কারণ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু পুরুষেরা এ বিষয়ে এত সাহায্য করবে কেন? চন্দন চয়ন, মুক্তা উত্তোলন, কস্তুরী অন্বেষণ থেকে আরম্ভ করে 'কাঁচপোকা-শিকাররূপ দুঃসাহসিক কাজ সমস্তই পুরুষে সম্পাদন করেছে ও করছে। আমার মনে হয়, পুরুষের কর্মপ্রিয়তার ঞায় সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাও মজ্জাগত; কিন্তু আশেপাশে সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের অভাবও একান্ত পরিস্ফুট। সকলে কবি হ'লে হয়ত কোন অশুবিধা থাকত না; তাঁদের দিকে চেয়েই মাসে অন্ততঃ পঁচিশটা দিন কাটিয়ে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন যা কাছে আছে, তাকেই মেজে ঘসে' মাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে জেনেশুনেও ঠকবার পরিতৃপ্তি থেকে পুরুষ নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। সেই জন্মেই পুরুষ চিরদিন প্রসাধন-রস্তুর আবিষ্কার-নিরত, আর রমণী তারই প্রয়োগপটু; প্রকৃতির এই প্রধান দুটি পক্ষের প্রবল তাড়নায়, প্রসাধন-শিল্পটা প্রায় পাগলামি লোকের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

প্রসাধন ব্যাপারটা যে নকলের সেরা, তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই; কিন্তু আসলের কাঠামো না পেলে নকলটা কি এতদিনকার পরমায়ু পেতে পারত? নাক, মুখ, চোখ, কান, গণ্ড, জ্র ললাটের গঠন সম্বন্ধে দেশ ও কালভেদে রুচিভেদ অবশ্য চিরকালই রয়েছে ও

থাকবে। এক দেশের নিন্দিত কটা চুল অন্য দেশে স্বর্ণালকরূপে বন্দিত। তথাপি রুচির এই পার্থক্য সত্ত্বেও মানবমনে নিশ্চিতই সৌন্দর্য্য-বোধের একটা কোন স্থির মাপকাটি আছে। সেই মাপকাটিতে আমরা যার পরিমাপ করি, তা রূপ নয়,—শ্রী। রূপ ও শ্রী দুটি ভিন্ন বস্তু। রূপের বিচার চোখে, শ্রীর পরখ মনে। রূপের রুচি পরিবর্তনশীল, শ্রীর রুচি চিরন্তন। সেই জন্যই বোধ করি, প্রকৃত শিল্পীর হাতে আঁকা বিদেশী সাজে সজ্জিত, বিদেশী ভাবাপন্ন রমণীচিত্রেও মন মুগ্ধ হয়; যদিচ চোখ বলে, সে রূপ নিয়ে ঘর করা চলে না। রূপ শ্রীর সহায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক সময় শ্রী হচ্ছে রূপনিরপেক্ষ। এমনতর প্রায়ই দেখা যায়,—বর্ণ গৌর নয়, মুখচোখের ঢং মাপ ও ছন্দ কবিজনের উপমাবস্তু থেকে অনেক তফাতে,—তবু সেই মুখ দেখেই মন মুগ্ধ হচ্ছে। আবার নাক কান চোখ চুল রং সবই ভালো, অথচ মন ঠিক প্রসন্ন হচ্ছে না,—এর দৃষ্টি শুও বিরল নয়। মুখশ্রীর তারতম্যই এর কারণ। এমন-কিছু একটা তফাৎ দুখানি মুখের মধ্যে কোথাও আছে, যাতে সৌন্দর্য্যের উপকরণসত্ত্বেও একখানিকে মন স্ত্রী ব'লে উঠতে পারে না, এবং অন্যখানিতে তার অভাব জেনেও আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ এমন-কিছু পদার্থটিকেই আমি শ্রী বলতে চাচ্ছি; স্বাস্থ্য হয়ত বা এর আংশিক উপকরণ, কিন্তু সে স্বাস্থ্য ঠিক মেহের স্বাস্থ্য বলতে যা বুঝায়, তা নয়। এই মুখশ্রীর স্বরূপ কি ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়, মুখের উপর মনের যে ছাপ পড়ে, তাই মুখশ্রী। সাপের ফণা স্তন্দর কিন্তু স্ত্রী নয়, কারণ হিংস্রতার ছাপ তাতে মাখানো। বাঘের মুখ স্তন্দর তা'তে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কি একটা উগ্রতা তাতে আছে যে, প্রাণ তা দেখে প্রসন্ন হয়ে ওঠে না।

মুখের স্বক কোমল না হলে'ও, মনের কোমলতা অনেক মুখে সুপরি-
স্ফুট থাকায় তাকে শ্রীসম্পন্ন মনে হয়। স্নেহ, প্রীতি, দয়া, উদারতা
প্রভৃতি শাস্ত্র পবিত্র স্মনোভাবের আশ্রয়ে কুরূপার মুখেও যে ক্ষণি-
কের শ্রী ফুটে ওঠে, তা অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। সেদিনও
কয়লাখাদের এক কুলী রমণীকে দেখে কুরূপের দৃষ্টান্তস্বল মনে
হবার পরক্ষণেই, সে যখন তার কোলের কচি ছেলেটিকে নতমুখে স্তম্ভ-
পান করাতে আরম্ভ করলে, আমি তার মুখের সৌন্দর্য্যশ্রী দেখে
চমকে উঠলাম। দেখলাম সেই মলিন দর্পণেও মাতৃস্নেহের অপরূপ
আলোকের প্রতিবিম্ব পড়ে' তাকে প্রকৃতই সুন্দর করে' তুলেছে।
মনে আছে, অশ্রুভারাক্রান্ত এক ভিখারিণীকে দেখে যেদিন সুন্দরী
মনে হয়েছিল, ঠিক পরের দিনই তাকে হাস্তে দেখে মনের মধ্যে
বিরোধ জেগে উঠেছিল,—ভেবেছিলাম, একটি দিনে এর চেহারা এমন
খারাপ কি করে' হল! বেদনার বিষণ্ণ-মুখশ্রীকে হাসি কি এমনি
করেই হাল্কা করে দিয়েছে?—অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, হ্রী ও
ধীশক্তিযে যে রমণীকে আজ পরমাসুন্দরী বলে' মনে হয়েছে, কাল
কলহ করতে দেখে তারি কুৎসিত মুখশ্রীতে মনটা কি পরিমাণ আঘাত
পেয়েছে।

যে সুরূপা নয়, তার রূপের প্রসাধনচেষ্টায় সঙ্গতি আছে, কেননা
ঘন রং পাউডারে ফিকে হয়, ছোট চোখ কজ্জলে টানা দেখায়, কোন
কোন কেশতৈলে নাকি টাকের উপরও চুলের ঞ্চার চেউ খেলে।
কিন্তু প্রকৃত সুরূপারও প্রসাধনচেষ্টার অর্থ কি? আমি অনুমান
করি, রূপ জানে শ্রীই আসল, আর সেই ক্ষণে নিজেকে শ্রী বলে'
চালিয়ে দেবার চেষ্টাতেই রূপ প্রথমে প্রসাধনের আশ্রয় নিয়েছিল।

লজ্জার আশ্রয়ে গণ্ডে যে অপূর্ব রক্তশ্রী ফুটে ওঠে, তাকেই অনুকরণ করতে গিয়ে সাদা পাউডারের উপর লাল রঙের ছোপ; স্নেহপ্রীতির নিবিড়তায় নয়ন পল্লবে যে কোমল ছায়া পড়ে, তাকেই মূর্ত্ত করবার চেষ্টায় চোখের কোলে কঙ্কল।

কিন্তু বাহিরের কোন প্রসাধনে শ্রী আজও ধরা দেয়নি; তার প্রসাধন স্বতন্ত্র। • সদ্বৃত্তি, কোমলতা, উদারতা, উচ্চচিন্তার অনুশীলন ও সৎকার্যের অনুষ্ঠানই শ্রীর প্রসাধন। নিত্যনিয়ত সৎচেষ্টার সাহায্যে শ্রী অধিকতর উন্নত হয় তা নয়,—কুৎসিৎও সুন্দর হ'তে পারে, যা রূপ-প্রসাধনের রাজ্যে অসম্ভব। বুদ্ধ চৈতন্য কৃষ্ণ খৃষ্টের শ্রী নাকি অনুপম ছিল। সে কথা যে অলীক নয়, তার প্রমাণের একান্ত অভাব জগতে আজও হয়নি। প্রচুর শ্বেত শ্মশ্রুতেও রবীন্দ্রনাথের মুখের চিররহস্যময় যৌবন-স্বপ্ন শ্রী ঢাকতে পারে নি; শীর্ণতা ও বার্কক্য সঙ্গেও মহাত্মার মুখ বিরাট কোমল বিশ্বপ্রেমে পরম শ্রীমান। আমার মনে হয়, ভারতের নারীসমাজ বহুদিন পূর্বেই প্রসাধনের এই রহস্য-টুকু ধরতে পেরে সীতাসাবিত্রীকেই সৌন্দর্যেরও আদর্শ বলে' মেনে আসছেন, আর আজও রূপমতী না লিখে' শ্রীমতী বলেই সই করে থাকেন। প্রসাধনের এই দিকটার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিলে তাঁরা যে সত্যসত্যই শ্রীমতী আখ্যার যোগ্যতর অধিকারিণী হবেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; অন্ততঃ অভিভাবকের অর্থব্যয় বাঁচিয়ে তাঁরা যে তাঁদের সমধিক শ্রদ্ধাভাগিনী হবেন, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বিদায়ে ।



জীবন-ঘাটের আধেক সোপান প্রায় ত হলাম পার,
যে ক'টা ধাপ রয়েছে আর বাকী,—
ভাঙন-ধরা শেওলা-পিছল তাও যে চারিধার—
পার হ'তে আর পারব সে ক'টা কি ?
দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির পাতে,
আসছে কানে কালো জলের ডাক ;
তবু আমায় ফিরতে বলিসু তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ !

(২)

প্রথম যেদিন তরুণ প্রাণের যাত্রা হ'ল শুরু,
সঙ্গে সেদিন কেউ ছিলনা আর ;
নূতন চলার আবেগভরে বক্ষ দুৰু দুৰু,
চক্ষে তরল দৃষ্টি সুষমার ;
কানের কাছে কোকিল ডাকে আকুল কলতানে,
ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলে পা ;
দখিন বায়ু বুনো ফুলের গন্ধ বয়ে আনে,
কিছুই যেন নিষেধ মানে না ।

(৩)

পথের মাঝে জুটল সাথী, কেউবা খানিক চলে'

সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেল আগে,
কেউ-বা কোথাও পড়ল বসে' কিছুই নাহি বলে',

জানিনা কোন্ গোপন অনুরাগে !
কেউ বা চলে, কেউ-বা আসে, কেউ-বা ফেলে যায়,

সঙ্গী বলে' পারেও নাহি পাই ;
আপন বেগে চলছে চরণ চলার আকাঙ্ক্ষায়,
ফিরে' দেখি—সময় তারো নাই !

(৪)

প্রথম কুড়ির চাতাল পরে লাগল নূতন নেশা,

পথের চেয়ে পথের সাথী পরে,
ফুলের গন্ধ যেন বা কার কেশের গন্ধে মেশা—

জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশ ভরে ।
চলতে গিয়ে বসে' পড়ি, বসতে গিয়ে চলি,

ভুল হয়ে যায় চলায় না-চলায়,
কানের কাছে বউ-কথা-কও প্রথম কথা বলি',
বলাতে চায় কোন্ সে অ-বলায় !

(৫)

এম্নিতর নেশান ঝাঁকে কাটল কতদিন,

হাতের সাথে হাতটি দিয়ে বাঁধা,

দুই কুড়ি ধাপ পেরিয়ে এলাম, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ,
 পায়ে পায়ে পাই যে শেষে বাধা !
 পাখীর কণ্ঠ মিলিয়ে আসে ঝোড়ো হাওয়ার হাঁকে,
 ফুলের গন্ধ মিলায় সে যে ধীরে;
 সঙ্গীজনের টুটল নেশা কালো জলের ডাকে,
 চোখের দৃষ্টি মিলায় নদীনীরে ।

(৬)

সম্মুখের ঐ চাতাল ভরি' নানা লোকের ভিড়—
 মন্দিরেতে উঠছে কলরব;
 চলার গতি সবার যেন আসছে হয়ে থির,
 আসন নিতে ব্যস্ত দেখি সব;
 ঠেলাঠেলির কলধ্বনি উঠছে চারিভিতে,
 তারি মাঝে নদীর গরজন;
 নিরুৎসাহ মূর্তিগুলি জাগায় শুধু চিতে
 অর্ধমৃতের চিত্র স্মৃতিষণ ।

(৭)

ঐ যেখানে ঢেউএর শেষে নদীর পরপারে—
 কাপ্সা আঁখির দৃষ্টি-অস্তুরালে,
 অজানা ঐ আঁধার-ঘেরা অচিন বেড়ারধারে
 সন্ধ্যাবধু তারার বাতি'ছালে,—
 ঐখানে ঐ সূদূর পারের নূতন পথের শেষে
 মোর তরে কি বাজছে সাঁঝের শাঁক !

এ পার—সে ত দেখাই গেল—যাব যে এ পারে—
যেখানে এ নীল মোহানার বাঁক !

(৮)

লাগছে গায়ে শীতের হাওয়া, জাগছে শিহরণ,
• ভাবছি আজ এ জীবন-সীমানাতে—
নূতন সাথীর নূতন রূপটি কি মনোহরণ,
কি পরিচয় হবে বা তার সাথে !
যে ক'টা ধাপ রইল বাকী, হোক বা না হোক সারা,
পার পাব ত—যতই বাধা থাক;
তোরা আমায় করিসু ক্ষমা, ভালোবাসিসু যারা,
পেছন থেকে দিসুনে আজ আর ডাক ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

অবাধ্য ।

(গোড়ার কথা ।)

সুশীল যখন আট বছরের ছেলে, তখন বাপু ম'য়ের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় ।

দশমাসের সুশীলকে দাদামশাই ও দিদিমার কাছে রেখে আশুবাবু দূরদেশে চলে যান । সঙ্গে গিয়েছিল সুশীলের মা ও বড় ভাই । কি কারণে হঠাৎ তিনি বিদেশবাসী হলেন, তা' ভ্রমসমাজে প্রকাশ না করাই ভাল ।

সুশীলের দাদামশাই ও দিদিমা অপুত্রক । কাজেই সুশীলকে পেয়ে তাঁদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলে গেল । সুশীল সেই স্নেহের নীড়ে আশ্রয় পেল । সেখানে সে আদরঘরের কোলে মাগুম হতে লাগল ।

বছরের পর বছর কেটে চলল । ক্রমেই আশুবাবু ও তাঁর স্ত্রীর দেশে ফেরবার দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, দিদিমার মন ততই একদিকে যেমন আনন্দে ভ'রে যাচ্ছিল, অপর দিকে তেমনি কিসের আতঙ্কে তাঁর বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠছিল—প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছিল । গভীর রাতে ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে চেপে ধরে চুমোর পর চুমো দিয়ে তাকে কাতর করে তুলতেন; সুশীল কিছু বুঝতে পারত কিনা জানিনা, কিন্তু এ স্নেহের পীড়ন সে অবাধে সহ্য করত ।

শেষে সুশীলের মা বাপ দেশে ফিরে এলেন । সুশীলকে তাঁর সহর থেকে দিদিমার কাছ হ'তে গ্রামে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে

গেলেন। সুশীল অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল নিছক কৌতুহলের বশে মা বাপের সঙ্গে গেল। দিদিমার স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় গোপন বেদনার ভারে নুয়ে পড়ল, বুকফাটা কান্নার চাপে কণ্ঠে স্বর ফুটল না, মুখ থেকে কথাটী পর্য্যন্ত বের হ'ল না; নীরবে নতমুখে ছেলেকে বিদায় দিলেন। সুশীল জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে দেখলে—তাদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, সদরমহল অন্দরমহল, বড় বড় বাগান—শান-বাঁধানো পুকুর। এ সবতে কিন্তু তার মন বসছিল না। সুশীলের নতুন নতুন খেলার সাথী জুটতে লাগল—তার নিজের দুই ভাই এক বোন—পাড়ার কত ছেলে, তাদের কতরকমের খেলাধুলা হাসিগল্প। এতেও সুশীলের মন পাওয়া গেল না। সে সহরে দিদিমার সেই ছোট বাড়ীখানিতেই ফিরে যেতে চায়। বাপ মা কত ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলে—সে বুঝা চেষ্টা। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলে—“হ্যাঁরে সুশীল, তুই নাকি চলে যাবি?” সুশীল উত্তর করলে “হাঁ, কলকাতায় মায়ের কাছে যাব।” “আবার কবে আসবি?” “আর আসব না।” “সে কিরে, তোর ভাইবোনের জন্মে, বাপমায়ের জন্মে মন কেমন করবেনা?” সুশীল এর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে যেন কত অপ্রতিভ হ'য়েই চুপ ক'রে রইল।

সেদিন দিদিমার কি আনন্দ, যেদিন স্থির হ'য়ে গেল যে সুশীল দিদিমার কাছে থেকেই কলকাতায় স্কুলে পড়াশুনা করবে। আশু-বাবুর স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন, “বেশ ত, ছেলেটাকে পর ক'রে দিলে?” “পর ক'রে দেব কেন? সুশীল এখনও ছেলেমানুষ, যার কাছে শিশুকাল থেকে মানুষ, তাকে ছাড়া কি থাকতে পারে? বড় হ'লে জ্ঞান হ'লে কি আর অমনটা থাকবে?” “কি জানি আমার কেমন

ভয় করে।” পাড়ার লোকেরা কানাকানি করলে—“আচ্ছা ভাই, বাপের পয়সাটাই বড় হ’ল, ছেলেটাকে পর ক’রে দিলে?” “তোমরা মনে কর্ছ ছেলেটা পর হ’য়ে যাবে—ভুলেও তা মনে স্থান দিও না। এ হ’ল বুদ্ধিমান লোকের ‘পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা’। ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ’য়ে উপায় করতে শিখলে, তখন দেখবে বাপমায়ের কেমন আপনার হ’য়ে যাবে; দাদামশাই দিদিমার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না।”

সুশীল স্কুলে লেখাপড়া শিখতে লাগল। লম্বা ছুটি পেলে সে বাপমায়ের কাছে এক একবার গিয়ে বেড়িয়ে আসত। ক্রমেই সে উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন পেলে। দাদামশাই ভাল private tutor খুঁজতে লাগলেন। দিদিমার এক ভাইপো এসে সুশীলের পড়াশোনা দেখবার ভার নিলে—অবশ্য বিনা বেতনে। নিকটেই কোন্ লেনে তাদের বাড়ী। সে একজন graduate। এখনকার দিনে graduate বলতে যা বোঝায়, হরেন মোটেই তা’ নয়। যে বিশ্ব-বিদ্যালয়-কারখানা থেকে বৎসর বৎসর ছাপমারা graduate কাতারে কাতারে বেরিয়ে আসছে, graduate হরেনের জন্মস্থান অবশ্য সেইখানেই, কিন্তু তা’হ’লেও সাধারণ B. A. M. A.-দের সঙ্গে হরেনের আকাশপাতাল তফাৎ—সে সত্য সত্যই শিক্ষিত। তার ভাগ্যে জুটেছিল সেই সত্য শিক্ষা, যাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, এবং মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে। এই শিক্ষিত যুবক সুশীলের guardian tutor-এর মত তাকে দেখাশোনা করতে লাগল। এমন সময় দাদামশাই মারা গেলেন।

সুশীলের মা আশুবাবুকে বলেন—“একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম

কি যে, সুশীলকে এইবারে এইখানে নিয়ে এলে ভাল হয় না?”
 “কেন?” “সেখানে মা ত একা—বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক
 নেই—সুশীল যদি লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়, বদছেলের সঙ্গে মিশে নষ্ট
 হয়ে যায়?” “না গো না, সে ভয় করবার কোন কারণ নেই, সব
 বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে।” “তাহলেই হল। দেখছ ত বড় ছেলেটা
 লেখাপড়া শিখলে না, আর তুমিও চেফটা করলে না; তা’ নাহ’লে কি
 আর শিখত না? কিছু না কিছু শিখত বই কি? একটা পাশও
 নিদেন পক্ষে করতে পারত।” আশুবাবু এবার একটু গরম হয়েই
 বলেন—“পাশ ক’রে কি হবে? আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে?”
 সুশীলের মা বেশ একটু বিস্মিত হ’য়েই উত্তর করেন—“কি বলছ
 তুমি?” “বলব আমার মাথামুণ্ডু—বলতে কিছুই চাইনা আমি।
 দেখে নিয়ো পরে তোমার কোন্ ছেলে মানুষের মত হয়। লেখাপড়াই
 বল আর যা’ই বল, পয়সা উপায়ের জন্মেই ত সব? দেখে নিয়ো
 তোমার কোন্ ছেলে পয়সা উপায় ক’রে দশজনের একজন হয়ে
 আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে—তোমার বিদ্বান ছেলে কি মূর্থ ছেলে—সেটা
 দেখে নিয়ো।”

সুশীল যখন Matriculation পড়ে, তখন একদিন এমন একটা
 ঘটনা ঘটল, যা’ যাদুদণ্ডের স্পর্শের মত মুহূর্তের মধ্যে হরেনের পুনঃ
 পুনঃ-বলা একটা কথাকে জীবন্ত ক’রে তুলে সুশীলের চক্ষুর সামনে
 খাড়া করে ধরলে। হরেন তার সঙ্গীদের প্রায়ই বলত—অনেক
 কিছুর অভাবে আমাদের জাতি আজ পতিত, তার মধ্যে সকলের
 চাইতে বড় এবং বেশী অভাব হচ্ছে—স্বাধীন চিন্তার অভাব।
 বর্তমানে দেশের প্রতিভাবান ও ভাবুক পুরুষেরা এই কথাটাই

আমাদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা ক'রছেন। সত্যই আমরা ভাবতে ভুলে গিয়েছি—নতুন কিছু চিন্তা ক'রতে হ'লেই আমরা শিউরে উঠি।

শনিবার দিন স্কুলে Debating Club-এ সূশীলের কোন সহপাঠী সীতাকে বনবাস দেওয়ার জন্মে রামচন্দ্রকে খুব বাহাদুরী দিচ্ছিল, নিজের ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলী উভয়ের কাছ থেকেই বাহবা পাচ্ছিল। এমন সময় সূশীল উঠে প্রতিবাদ করলে। শিক্ষকেরা এর পূর্বেও লক্ষ্য করেছিল সূশীলের নির্ভীক স্বভাব এবং কোন কোন বিষয়ে তার স্বাধীন উক্তি। তাহলেও বিশেষ কোন তিরস্কার তা'কে সহ্য করতে হয়নি, কেননা সে 'ভাল ছেলে'। কিন্তু আজ আর রক্ষা নেই—দেব-চরিত্রে দোষারোপ! ভগবানের লীলাখেলার নিন্দাবাদ! হেড মাস্টার বিষম ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ করে, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কর্কশ কণ্ঠে—“থাম থাম জ্যাঠা, ফাজিল over-active কোথাকার” ইত্যাদি ব'লে তিরস্কার করে তাকে বসিয়ে দিলেন। সূশীল তৎক্ষণাত্ Club হতে বেরিয়ে এল—আর কখনও ঢোকে নি।

সন্ধ্যাবেলা সূশীল হরেনকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মামা, পাঁচ জনের কল্যাণের খাতিরে একজনের কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে কিনা? “যেতে পারেও বটে, আবার না পারেও বটে। কেন, কি হয়েছে?” “আজ Debating Club-এ রামচরিত্র আলোচনা হচ্ছিল”—ব'লে সূশীল সব কথা আগাগোড়া খুলে প্রকাশ করলে। হরেন মুচ্কে হাসলে—সে হাসিতে রাগেরও আমেজ ছিল। তারপরে বলে—“যাক্, ওরকম graduate”—সূশীল বাধা দিয়ে বলে “তিনি M A., B. L.” “তাইত, ভদ্রলোক ওকালতি কল্লেই ভাল করতেন না? শিক্ষক সাজবার কি দরকার ছিল? আর ওঁর একারই বা দোষ দিই

কেন? পেটের দায়ে কত ভদ্রলোক ঐরকম শিক্ষকতার অভিনয় করছেন। যাক্গে ও কথা, এখন আসল কথা শোন। তুমি যদি দিদিমার শত বারণ না মেনে, আদৌ তাঁর মুখ না চেয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়, আর সেই অপরাধে তোমার নির্বাসন-দণ্ড হয়, এবং তোমার বিরহ সহ্য করতে না পেরে দিদিমা মারাও যান—তাহ'লেও তোমার এতটুকুও অপরাধ নেই। কিন্তু তাই বলে রামের সীতা নির্বাসন কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। প্রজারা সীতার চরিত্রে যে সন্দেহ ক'রেছিল, রামচন্দ্র ভালরূপেই জানতেন সীতাচরিত্র তার কত উপরে; তবুও তিনি প্রজার সম্ভ্রামের খাতিরে, রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্মে সত্যের অপমান করলেন। কিন্তু Victor Hugo-র Jean Valjean কি করেছিলেন? যখন তাঁর কানে গেল যে তাঁরই গা-ঢাকা দিয়ে থাকার ফলে একজন নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড হবার উপক্রম হ'য়েছে, তিনি তখনই মরণের মুখে ছুটে গেলেন সেই নিরপরাধীকে বাঁচাতে। তিনিও বেশ বুঝেছিলেন যে, তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে-তোলা যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—যার উপর নির্ভর করছিল কত নরনারীর জীবিকা—তাঁর অবর্তমানে তা' অচিরে ভেঙে পড়বে, এবং কত নরনারীকে অনশনে শুকিয়ে মরতে হবে। তবুও তিনি সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণই রেখেছিলেন। মাত্র একটী লোকের দাবী এতগুলো লোকের দাবীর চাপে মারা পড়েনি। তাইত বিচার কলেই বলতে হয় যে, বাঙ্গালীর রামচন্দ্রের চাইতে Victor Hugo-র Jean Valjean জীবনের ওই জায়গাটাতে বড় আদর্শের অনুসরণ ক'রেছিলেন।”

বিদ্যুৎগতিতে স্কুলের এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হ'য়ে সূশীলের মা

বাপের কানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।" তাঁরা শুনলেন—সুশীলকে যে পড়ায়, যার সঙ্গে সে দিবারাত্র মেলামেশা করে, সেই যুবকটী ধর্ম্য মানেনা, সমাজ মানেনা, মা বাপের অবাধ্য, একেবারে স্বেচ্ছাচারী। কাজেই সুশীল যে অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আশুবাবু তখনই কল্কাতায় এসে শাশুড়ীকে বোঝালেন—“আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যা ভয় ক'রেছিলুম তাই হয়েছে— ছেলেটা অধঃপাতে যেতে বসেছে। আর একদণ্ডও ওকে এখানে রাখা উচিত নয়। তবে ওর পরীক্ষা নিকটেই, এখন স্কুল পরিবর্তন করায় ওর নিজেরই ক্ষতি হবে। পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই ওকে এখান থেকে সরাব।” তারপরে সুশীলকে ডেকে কড়া সুরে তিরস্কার ক'রে, তাকে হরেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বিশেষ ক'রে বারণ ক'ল্লেন, এবং হরেনকেও দু' একটা মূঢ় শ্লোষোক্তি ক'রে বিদায় দিলেন। সুশীল 'হ্যাঁ' কি 'না' কোন উত্তর না দিয়ে, বাপ যা যা ব'লে গেলেন, নীরবে নতমুখে সব শুনে গেল।

শেষ কথা।

আশুবাবু অনেক টাকার মালিক হলেও, বিশেষ দারে না পড়লে খাওয়াপরা ছাড়া কোন কিছুতে এক পয়সাও ব্যয় করতে কেউ কখনও তাঁকে দেখে নি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে যাওয়া তাঁর মতে একটা বাজে খরচ। হিসেব করতে পারা আর চিঠি লিখতে পারা— এই হলেই যথেষ্ট হ'ল, কেননা তাহলেই তাঁর ব্যবসায় কার্য্য বেগ চলে যাবে। কল্কাতা সহরে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি দেখে, তাদের মত দোকানদার ব'নে যাওয়াটাই জাতীয় উন্নতির একটা প্রশস্ত

পাথ ব'লে যাঁরা গলাবাজী করে থাকেন, আশুবাবু তাঁদেরই শিষ্য। বড় ছেলেকে ব্যবসায় শেখাচ্ছেন। মেজ ছেলেটার পরীক্ষা হয়ে গেলেই তাকেও ঐ কার্যে ভর্তি ক'রে দেবেন— এই তাঁর মতলব।

সুশীলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আশুবাবু তাঁর মতলব খুলে বলেন। এ জায়গা ত্যাগ কিম্বা ব্যবসায় শিক্ষা কোনটাই তার দ্বারা হবে না; সে চায় লেখাপড়া শিখতে— সুশীল ধীর নম্রভাবে এই কথা বাপকে জানালে। আশুবাবু রেগে আগুন হ'য়ে, এই অবাধ্যতার জন্তে দিদিমা ও হরেনকে দায়ী ক'রে তাঁদের দুজনকেই শ্লেষোক্তি করতে লাগলেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে পাছে রাগের বশে পিতার অপমান ক'রে ফেলে, এই ভয়ে সুশীল কথাটা না ক'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু বুঝলেন ছেলে তাঁর বাধ্য নয়। তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর স্ত্রী বলেন,—‘তা বেশ ত, ছেলে যদি লেখাপড়া শিখতেই চায়, শিখুক না।’ “দেখ তুমি মেয়ে-মানুষ, যা বোঝনা তাই নিয়ে কথা কইতে এস না।” বকুনি খেয়ে তিনি চুপ করলেন। আশুবাবু তাঁর এই দুঃখের ইতিহাস পরিচিত মাত্রকেই জানালেন। একদিন তাঁর অনুরোধে হেড-মাস্টার মশাই হরেনকে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবার জন্তে তার বাড়ীতে এলেন। দুজনে কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা হওয়ার পর, মাস্টার মশাই হঠাৎ আজকালকার ছেলেদের অবাধ্যতার কথা তুললেন, তুলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেন,— “আপনার সুশীল যেন পিতৃদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে।” হরেন মাস্টারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। তাই সে এ অভিযোগের সরল উত্তর না দিয়ে বলে—“কি করব বলুন, এটা যে বিদ্রোহেরই যুগ। সুশীল সেই

যুগধর্মেরই মানস্কা ক'রেছে।” “তাই বলে কি বিদ্রোহের দমন করতে হবে না ?” “কি উপায়ে ?” “সমাজের বাঁধন এখন আলগা হ'য়ে গেছে। আবার কঠোর আইনে সমাজকে শক্ত ক'রে বাঁধন দেখি, ছেলেরা কেমন অবাধ্য হ'তে পারে।” “অর্থাৎ আপনি চান ছেলেদের মানুষ না গ'ড়ে তুলে পোষা জনোয়ার বানিয়ে তুলতে। তা'ত পারবেন না, মাষ্টার মশাই। অসম্ভব! যে বান ডেকেছে! আপনাদের 'সামাল' 'সামাল' চীৎকারই সার হবে। সামলাতে পারবেন না কিছুতেই—ভেসে যাবেই যাবে।” “আপনি তাহলে দেখচি বিপ্লব চান ?” “হ্যাঁ, তাই চাই। আপনিই বা বিপ্লবের নামে আঁতকে উঠছেন কেন? বিশ্ব-সভ্যতার বিকাশ ত বিপ্লবেরই মধ্য দিয়ে।”

এ সব কথা হেড-মাষ্টারের মনের মত না হ'লেও, প্রতিবাদ করার মত তাঁর পুঁজি না থাকায় তিনি চুপ ক'রেই রইলেন। যে উদ্দেশ্যে এলেন তা' যখন সফল হ'ল না, তখন তাঁর গলার চড়া সুর কোমল পর্দায় নেমে এল। তিনি বেশ শান্ত সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—“আচ্ছা হরেন বাবু, ও সব কথা ছেড়ে দিন; আমি বলি কি, পিতার প্রতি পুত্রের ত একটা কর্তব্য আছে ?” নিশ্চয় আছে”। “কিন্তু আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় সুশীল সে কর্তব্য পালন করছে না।” “আপনি কি শুনেছেন ?” “আমি শুনেছি আশুবাবু সুশীলকে যা করতে বলেছিলেন, তাতে তা'র ভালই হ'ত। অথচ”—হরেন বাবা দিয়ে বললে—“ভাল হ'ত ? তার সর্বনাশ হ'ত ! ছেলের যে কিসে ভাল হয়, তা' এ সমাজের ক'জন বাপ জানেন ? পরস্রা উপায়, বিবাহ আর পরিবার পালন করেই ত ছেলে একটা মানুষ হ'য়ে উঠেছে বলে

তাঁদের ধারণা। সুশীল চায় লেখা পড়া শিখতে, তার বাপ তাতে বাধা দিয়ে চান তাকে দোকানদার বানাতে। সুশীল তাতে কিছুতেই মত দেয়নি—এই তার অপরাধ। তার কর্তব্যের ক্রটি যে কোথায়, আমি ত খুঁজে পাই না। বাপের অর্থপিপাসার শাস্তি করতে গিয়ে নিজের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি না ক’রে চিরকাল মূর্থ থাকাটা কারুর কোনমতেই কর্তব্য হ’তে পারে না। বরং নিজেকে ও-ভাবে বঞ্চিত করা—পাপ। বাপের আদেশ—দিদিমাকে ত্যাগ করতে হবে। তাঁর ধারণা তাহ’লেই ও বাধা হবে। সুশীল তাতেও নারাজ। অতএব সুশীলের ভারী অন্যায়। বলে দিতে পারেন মাস্টার মশাই, পিতা হ’লেই তার এত বড় অধিকার কোথা হ’তে আসে যে, পুত্রকে তার বিচারশক্তি, তার স্বাধীনতা, তার ভালমন্দ জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায়বোধ সমস্তই পিতার খেয়ালের অথবা স্বার্থের পায়ে বলি দিতে হবে? যিনি সুশীলকে মানুষ ক’রেছেন—যিনি তার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী—তাঁকে যদি সুশীল পিতার আদেশে সত্য সত্যই ত্যাগ ক’রে যায়, তবে সে যার পরিচয় দেবে তা কখনই পিতৃভক্তি নয়—তা’ নিছক কৃতঘ্নতা। এ কথা স্বীকার করতে চান না তাঁরাই, যাঁদের পিতৃভক্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে ‘পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্য’, যাঁরা পিতৃভক্তির আদর্শ রাখতে জঘন্য বর্বরোচিত মাতৃহত্যারও অনুমোদন ক’রে থাকেন।” “আপনি কি ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা নিয়েছেন, না নেবেন?” “কেন বলুন দেখি? সত্যি কথা বলতে গেলেই বুঝি হয় ব্রাহ্ম না হয় খৃষ্টান হ’তে হবে?” “খৃষ্টানদের কথা আর কইবেন না। তারা আবার সত্যি কথা কয়? এত বড় ভুল বিশ্বাস আপনার কি ক’রে হ’ল জানি না। খৃষ্টানদের কাগজখানা পড়ে দেখবেন দেখি, তাতে হিন্দুদের কিরকম মিছামিছি

গালাগালি করে ?” “তা করে বটে। কিন্তু সময় সময় আবার সত্যি কথাও বলে। যেমন একদিন একজন লিখেছিল মনে আছে— সে দেশ রসাতলে যাবে, যেখানে নারীজাতি ছেলেমেয়ে সৃষ্টির যত্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। শুনতে কটু হ’লেও কথাটা বড় বেশী সত্যি না মাস্টারমশাই ?” হেড্-মাস্টার জবাব না খুঁজে পেয়েও কথা চাপা দেবার জন্মে বলেন—“শুনেছিলুম আপনি নার্কি ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা নেবেন ?” “যা শুনেছিলেন সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর দীক্ষা নেবার আমার কি প্রয়োজন হ’ল, আমি নিজেই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।” “ধর্মাস্তুর গ্রহণ করতে গেলে”—হরেন বাধা দিয়ে বলে—“ধর্মাস্তুর আবার কি ? ধর্ম ত এক। আমারও যা, আপনারও তা, মুসলমানেরও তা, খৃষ্টানেরও তা—সকল দেশে সকল যুগে সকল মানুষের সেই একই ধর্ম। তা’ ছাড়া অন্য কিছু হ’তে পারে না।” “আপনি কোন্ ধর্মের কথা বলছেন ?” “আমি বলছি সত্যের পথে চলা আর মানবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই ত ধর্ম। আমরা ভিতরের এই সার তত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের খোসাকে নিয়েই ছড়োছড়ি কোলাহল ক’রে মরছি। তাইতেই ত এতরকমের ধর্মমত গড়ে উঠেছে। আর তারই ফলে ত কত না বাদবিসম্বাদ, কত না কাটাকাটি রক্তারক্তি। তবে এমন দিন আসছে—সেদিনের হাওয়া বইতে শুরু হ’য়েছে—যেদিন মানুষ সত্য-ধর্মকে চিনবে—ধর্মাস্তুর বলে আর কিছু থাকবে না।” হেড্-মাস্টার দেখলেন গতিকং ভাল নয়— তিনি যা শুনেছিলেন তা’ বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্যই এ যুবক ভগবান-মানে না, ধর্ম মানে না, সমাজ মানে না, শিক্ষা দীক্ষা কিছুই মানে না।

এত বড় নাস্তিক উচ্ছৃঙ্খল যুবক কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি আর বিশেষ কিছু না বলে বিদায় নিলেন।

সুশীলের বাপ হেডমাস্টারের মুখে সব কথা শুনে ত স্তম্ভিত ! ছেলেটাকে এই বেলা বশে না আন্তে পারলে ভবিষ্যতে ছেলেটাও ত ঐরকম কিস্তুত কিমাকার জীব হ'য়ে উঠবে। আরও দু'একবার সুশীলকে ফেরাবার চেষ্টা করলেন। সুশীলের সেই একই উত্তর। আশুবাবু তখন নিরুপায় হ'য়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হ'লেন। গুরুদেব নাকি বড় বুদ্ধিমান। তাঁরই যুক্তিতে আশুবাবু কতবার কত মুস্কিলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেবার খাতিরে তিনি সারাদিন আদালতে ঘুরে বেড়ান। কেননা মোকদ্দমা মামলায় তিনি পাকা ওস্তাদ। আপনার লোককে পর ক'রে দিয়ে পরকে আপনার করতে তাঁর মত মাথা ঘামাতে কাউকে দেখা যায় না। তিনি আশুবাবুকে যুক্তি দিলেন ছেলের বিবাহ দিতে। তিনি নিজেই ঘটকালী করে তাঁর এক ধনী শিষ্যের মেয়ের সঙ্গে সুশীলের বিবাহ স্থির করলেন। পাশ্চুরা ছেলে—দর অনেক টাকা, আশুবাবু দাঁও মারবার আশায় উদ্গ্রীব হ'য়ে রইলেন। কিস্তু যে বিয়ে করবে তার মত করাবে কে?—গুরুদেব নিজেই গেলেন। গুরুদেব কত শাস্ত্রবচন আওড়াতে লাগলেন—সুশীলকে সম্মত করার জন্মে। কিস্তু যা' উত্তর পেলেন, তাতে তাঁর পিত্তি অবধি জ্বলে উঠল। অথচ রাগ প্রকাশ করলে ত চলবে না। কাজেই ভিতরের রাগ সাবধানে ভিতরে চেপে রেখে বেশ প্রসন্ন মুখেই বল্লেন—“দেখ বাবা, তুমি শিক্ষিত ; তোমাকে এ সব কথা বলাই বাহুল্য। পিতামাতাকে সম্মত করা পুত্রের জীবনে একটা প্রধান কর্তব্য। জানত

ত্রৈতাযুগে রামচন্দ্র, স্বাপরে ভীষ্মদেব,—” “দেখুন ভীষ্মের ত্যাগস্বীকার খুবই বড় ; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা যায় না । তাঁর অতবড় ত্যাগস্বীকারের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যটা যেন লজ্জায় মুখ ঢেকে আছে । হলেনই বা বাপ—তাই বলে তাঁর অগ্নায় অসংযমের পথ খোলসা ক’রে দিতে হবে ?” “বাবা সুশীল, তোমার বুদ্ধিব্রিপর্যায় ঘটেছে । ভগবান তোমায় স্মৃতি দিন”—উদাসীনভাবে এই শুষ্ক আশীর্ব্বাদ ক’রে গুরুদেব চলে গেলেন ।

হতাশ হ’য়ে গুরুদেব ফিরে এলে আশুবাবু ক্রোধে আত্মহারা হ’য়ে চীৎকার ক’রে উঠলেন—Rascal আপনারও অপমান ক’রেছে ? আজ হ’তে সে আমার কেউ নয় !” “ছি বাবা, ওকথা বলতে নেই । এখনও এক যুক্তি আছে ওকে ফেরাবার । দেখ বাবা ! টাকা বড় জিনিষ । তা’কে গিয়ে ভয় দেখাও যে, এরকম অবাধ্য হ’লে বাপের বিষয়সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকবে না, দেখি ছেলে বশে আসে কি না ।” আশুবাবুর অস্তরটা রাগের আগুনে তখনও টগুবগু ক’রে ফুটছিল—বল্লেন “কিন্তু জানবেন গুরুদেব ! এততেও যদি ও পাজি নচ্ছার বাধ্য না হয় ত সত্যিই ও আমার ত্যজ্য পুত্র । এই আপনার পা ছুঁয়ে আমি শপথ কল্পুম ।” গুরুদেব ত্রস্তব্যস্ত হ’য়ে দূরে সরে গিয়ে পরিতাপের সুরে বলে উঠলেন—“ছি ছি ছি বাবা, কি করলে ! রাম ! রাম ! রাম ! নারায়ণ ! একি হ’ল ঠাকুর ? যাক বাবা, রাগ না চণ্ডাল ! এখন চল স্নান আহার ক’রে ঠাণ্ডা হবে চল ।”

কিন্তু আশুবাবুর রাগ অত শীঘ্র ঠাণ্ডা হবার নয় । তিনি কল্কাতায় এসে সুশীলকে ডেকেই আরম্ভ করে দিলেন “পাজি নচ্ছার কোথাকার ! এতখানি যে স্পর্ক হবে তোমার, তা’ আমি স্বপ্নেও

ভাবিনি। তুমি এতদূর উৎসর্গ গিয়েছ, এমন অবাধ্য উচ্ছ্বল হয়েছ যে, গুরুদেবকে পর্য্যন্ত অপমান করতে তোমার বাধুল না! আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মাত্র একটা কথা; তোমার কাছে জানতে এসেছি—তুমি আমার বাধ্য হবে কিনা?” সুশীল ধীর নম্র ভাবে কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, আশুবাবু বাধা দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—“কোন কথা শুনতে চাইনা আমি! তুমি আমায় এক কথায় বল—আমার বাধ্য হবে কিনা?” সুশীল তবুও কি জিজ্ঞাসা করতে গেল, আশুবাবু আবার চীৎকার করে উঠলেন—“চোপরাও! আর একটা কথাও না। শুধু বল তুমি আমার বাধ্য হবে কিনা? বল ‘হ্যাঁ’ কি ‘না’।” এবার বেশ শান্ত গস্তীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল ‘না’। “না? আচ্ছা জেনো আজ হ’তে তুমি আমার কেউ নও—আমার বিষয়সম্পত্তির একটা কানাকড়িতেও তোমার এতটুকু অধিকার নেই—আর জীবনে কখনও আমার বাড়ীতে ভুলেও মাথা গলিও না।” আবার তেমনিই শান্ত গস্তীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল “আচ্ছা।”

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কেদারাছায়ানট—যৎ ।

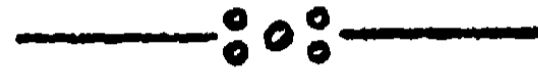


তোমার ব্যথার দানে উঠল ভরি' চিত্ত আমার, যবে,
বল কার চরণে নিবেদিব এই সে ডালি তবে ?
আজি আকাশ বাতাস কুমুম লতা
 গুঞ্জরে কোন্ ম্লান বারতা,—
 কি অপরূপ ব্যথা জাগায় মর্ম্মরের রবে ?
যাতে ভ'রে ওঠে চিত্ত রাঙা ব্যথারই গরবে !

আজি ভুবন-জোড়া বেদন-তারে
 রণিয়ে ওঠে বারে বারে,
 তাই বুঝি মন আন্মনা আজ হাটের কলরবে ?
দিতে জীবন-বীণায় ব্যথার রাগে সাড়া উছল স্তবে !

শ্রীদিলীপকুমার রায় ।

চাষী ।



আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার ভিত্তি খোঁড়া হয়েছে লাঙ্গলের ফলায়। মানুষ যে আদিতে অসভ্য যাযাবর ছিল, তার কারণ স্থিতি-শীল সভ্য হয়ে তার প্রাণে বাঁচবার উপায় ছিল না। অন্নের পশু ও পালিত পশুর অন্নের সন্ধানে তাকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিক্রম করতে হ'ত। পরিচিত ভূভাগ স্বল্পপশু ও তৃণবিরল হয়ে উঠলে, অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র বিধা চলতো না। কৃষির রহস্য আয়ত্ত করে' তবেই মানুষ এ ভবঘুরে অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। চাষের ক্ষেতকে কেন্দ্র করে' তারই চারপাশে গ্রাম, নগর, স্বদেশ, স্বরাজ্য গড়ে উঠেছে। এই সব স্থায়ী আবাসে চাষের অন্নের কৃপায় মানুষের মন, শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, ভাব ও জ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টিতে রত হয়েছে। তার কর্মকুশলতা অজস্র ধারায় সহস্র পথ কেটে চলেছে। এই সভ্যতার জন্মের সন তারিখ ঠিক জানা নেই। কিন্তু মানুষ যেদিন চাষের ক্ষেতের কারখানায় ছায়া-পৃথিবী থেকে অন্ন চুঁয়িয়ে নেবার সজীব কলের সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কার করেছে সেই দিনই এর জন্মদিন।

মাটির চাষ সভ্যতাকে বহন ক'রে এনেছে, কিন্তু সে সভ্যতা চাষীকে বহন করতে পারে নি। চাষী চিরদিনই সভ্যতার ভারবাহী মাত্র হয়ে আছে। সে হচ্ছে সভ্যতার মূল। মাটির নীচে থেকে রস

টেনে সে সভ্যতার ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে,—কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সে কখনও জানবে না।

এর কারণ সভ্যতার জন্মকথার সঙ্গেই জড়ান রয়েছে। মানুষের যাযাবর জীবন ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য। জমিয়ে জমিয়ে অবাধে বাড়িয়ে তোলা যায়—ধনের এমন আকার ছিল না বলে, ধনী ও নির্ধনের উৎকট প্রভেদ তখন সম্ভব ছিল না। সমাজের এক ভাগ অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের মোটা অংশ ভোগ করবে, এ ব্যবস্থার উপায় ও অবসর অতি সামান্য ছিল, এ জন্ম সমাজের মধ্যে দাসপ্রভু সম্বন্ধ গড়' উঠতে পারে নি। বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব সকলকেই এমন নিরবচ্ছিন্ন করতে হ'ত যে, সে দাসের দলের এক ভাগের আর প্রভু হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। চাষের জ্ঞানের ফলে মানুষ সে স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও স্বর্গরাজ্য ও সেইদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহুজনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে' খাটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফল ক্রমে জমা ক'রে সে ক্ষমতাকে ক্রমে বাড়িয়ে চলতে পারে। যারা বলী ও কৌশলী, এ চেফ্টায় তাদের প্রলোভনও ছিল প্রচুর। যাযাবর জীবনে যারা অভ্যস্ত, চাষের পরিশ্রম তাদের কাছে বিশ্বাস ও অতিমাত্রায় ক্লেশকর। ক্ষুধার তাড়নায় গুরু শ্রম, আর তার শান্তিতে অথও আলস্য,—এই ছিল যাযাবর জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা। এর তুলনায় চাষীর শ্রম কঠোরতায় লঘু, কিন্তু সে শ্রম প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রম,—অনভ্যস্তের কাছে যা সব চেয়ে পীড়াকর। সে পরিশ্রম করতে হয় বর্তমানের ক্ষুধার তাড়নায় নয়, ভবিষ্যতের অনাহারের

আশঙ্কায়। কারণ সে পরিশ্রমে বর্তমানের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে এই অনভ্যস্ত, চিরফলপ্রসূ, নিয়ত পরিশ্রমের গুরুভার বলবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা চিরদিনই দুর্বল ও হীনবুদ্ধিদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে।

সত্যতার ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এর উদাহরণ ছড়ান রয়েছে। সভ্য গ্রীসের রাজ্যগুলিতে চাষী ছিল ক্রীতদাস; আর এ ব্যবস্থা ভিন্ন সভ্যতা কি করে' টিকে থাকতে পারে, গ্রীক পণ্ডিতেরা তা ভেবে পান নি। রোমান সভ্যতা সাম্রাজ্যের পথে পা দিতেই হাতের লাঙল তুলে দিয়েছিল দাসদের হাতে। ইউরোপের মধ্যযুগে ও রুশিয়াতে সেদিন পর্য্যন্ত চাষী ছিল নামে ও কাজে দাসেরই রূপান্তর। হিন্দুর শাস্ত্রে চাষের কাজ বৈশ্যের, অর্থাৎ আর্য্যের—যার বেদে অর্থাৎ বিদ্যায় অধিকার আছে। শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রের পুঁথিতেই লেখা আছে, কিন্তু সুদূর অতীত থেকে চাষের লাঙল ঠেলেছে শূদ্র, যে শূদ্রকে “দাস্তায়ৈব হি সৃষ্টিঃসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা”—স্বয়ংভু সৃষ্টিকর্তা দাসদের জন্মই সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা ধনতন্ত্রের যেমন দুই দিক—ধনসৃষ্টি ও ধনবিভাগ; সভ্যতারও তেমনি দুই দিক—সৃষ্টি ও বিভাগ। শরীর ও মনের যা সৃষ্টি ও সম্পদ, তার সৃষ্টির কাজে নানা সভ্যতার মধ্যে বড় ছোট, ভাল-মন্দ ভেদ আছে; কিন্তু বিভাগের কাজে সব সভ্যতার এক চাল। সভ্যতার সৃষ্টির বড় ও শ্রেষ্ঠ অংশ ভাগ হয় অল্প ক'জন্যের মধ্যে, যা অবশিষ্ট তাই থাকে বাকী সকলের জন্মে,—যদিও শ্রমের ভাগটা তাদেরই বেশী।

যে সভ্যতা নিজেকে আধুনিক বলে' গর্ব্ব করে, তার শ্রেষ্ঠত্বের

প্রধান দাবী এই যে, বিভাগের এই উৎকট বৈষম্য সে ক্রমে কমিয়ে আনছে। জ্ঞান ও রসের সৃষ্টিকে অল্প ক'জন্যর জন্মে তুলে না রেখে, যার শক্তি আছে তারই আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার সে নানা পথ কেটে দিচ্ছে। শরীরের জন্ম যে বস্তুসম্ভার, তাকে ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং স্বল্পভাগ্য ও সাধারণবুদ্ধি লোকের মধ্যে কেবল প্রয়োজনের মাপে বেঁটে দেওয়া সম্ভব না হ'লেও, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম যা প্রয়োজন তা থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয়,—সেদিকে তার চেষ্টার বিরাম নেই; এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শকেও সে ক্রমে উঁচু দিকেই টেনে তুলছে। পূর্বে যা ধনীর বিলাস ছিল, তাকে সে অল্পবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য্য করেছে। তার জন্মে ধনীর ব্যসনের আয়োজন ও পরিমাণ কমাতে হয় নি, তা বরং বেড়েই চলেছে। তবুও যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে হচ্ছে বস্তুসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছে, তারই প্রয়োগ। এই কৌশলের বলে স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে, অল্প লোকে, অতি সামান্য সময়ে প্রয়োজন ও বিলাসের যে বৃহৎ সামগ্রীসম্ভার উৎপন্ন করতে পারে, ইতিপূর্বে সমস্ত দেশব্যাপী লোকের বহুদিনের চেষ্টাতেও তা সম্ভব ছিল না। এই কৌশলের নাম 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম'।

আধুনিক 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' সভ্যতার এই দাবী, তার জন্ম ও লীলাভূমি পশ্চিম ইউরোপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও যতই পার্থক্য থাকুক, ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণের যোগান যতই নগণ্য হোক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের সভ্যতার ভারবাহীরা অনেক বেশী

পরিমাণে সে সভ্যতার ফলভোগী হয়েছে। এ সভ্যতার ষাড়া মাথায় রয়েছে, এ যে তাদের উন্নতির জন্য ঘটেছে তা নয়। ষাড়া ধনে ও বুদ্ধিতে প্রবল, তারা নিজেদের লাভের লোভেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম-এর গোড়াপত্তন করেছে। কিন্তু তার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে ভারবাহীদের দল বাঁধবার সুযোগ ঘটেছে, এবং দলের চাপেই তারা ও-ফল আদায় করেছে। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর সম্ভাবনা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন সৃষ্টিকৌশলে যোগানের পরিমাণ যদি না বেড়ে যেত, তবে ধনিকের ভাণ্ডার খালি না করে শ্রমিকের খলি ভরান কিছুতেই চলতো না।

কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেশগুলিতে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, চাষীকে নিয়ে প্রাক-ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম তার কোনই সমাধান করতে পারে নি; সমস্যাটিকে এক পা দূরে হটিয়ে রেখেছে মাত্র। পূর্ব যুগের সভ্যতা যে গোঁজামিল দিয়ে এর মীমাংসার চেষ্টা করতো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা খুব ব্যাপকভাবে সেই গোঁজামিলই চালাতে চাচ্ছে।

সভ্যতার নিত্য সমস্যা হচ্ছে, জীবনের পুষ্টি ও আনন্দের যা উপকরণ আবিষ্কার হয়েছে, কি করে তা যথেষ্ট উৎপন্ন করে' সমাজের মধ্যে এমন করে বেঁটে দেওয়া যায়, যাতে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কেউ বাদ না পড়ে, অথচ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগের আকর্ষণেরও অভাব না হয়; আর প্রকৃতি যাদের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে জন্ম দিয়েছে, তাদের সেই শক্তিপ্রয়োগের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের কি করে' ব্যবস্থা করা যায়। এর একটির উপর নির্ভর

করে সভ্যতার স্থিতি, অগ্ৰটির উপর তার বৃদ্ধি। এ পর্য্যন্ত কোনও সভ্যতা এ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্ম যে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সব সভ্যতা তার বোঝা চাপিয়েছে সমাজের একটা অংশের উপর, যাকত বাকী অংশটা ঐ পরিশ্রম থেকে মুক্ত হ'য়ে সভ্যতার ভোগ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট উপকরণ ও অবসর পায়। সব সভ্যতার অন্তরেই এই ভয় যে, ঐ পরিশ্রমের ভার সমাজের এক অংশের মাথা থেকে লাঘবের জন্ম সকলের উপর ভাগ করে' দিলে, সভ্যতা সমাজের সকলের পক্ষেই বোঝা হয়ে উঠবে। ওর ভোগের উপাদান কারও ভাগ্যে জুটবে না, ওর বৃদ্ধির সংযোগ ও অবসর কারও ঘটবে না। কাজেই সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্ম বলে হোক, ছলে হোক, সমাজের একদল লোককে তার ভারবাহী করতেই হবে, এবং খুব সম্ভব সে দল লোক হবে সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল।

ইন্ড ষ্ট্রিয়াল যুগের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভ্য সমাজে সভ্যতার এই ভারবাহীর দল ছিল চাষী। কারণ কৃষিই ছিল প্রতি সমাজের জীবিকার মূল উৎস। ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, কৃষিকে বাদ দিয়ে এক নূতন ধরনের কারুশিল্পে সমাজের বৃদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগ করলে তার ফল ফলে বেশী। কৃষি জীবিকার যে উপকরণ উৎপন্ন করে, সমান পরিশ্রমে এতে তার অনেক গুণ বেশী পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে দেখা গেল যে, এই সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার ভারবাহীদেরও অনেক পরিমাণে তার ফলভোগী করা কৃষিসভ্যতার তুলনায় সহজসাধ্য। কারণ এতে যে অল্প সময়ের পরিশ্রমে অনেক বেশী ফল লাভ হয় কেবল তাই নয়,

এ ব্যবস্থায় কৃষির জন্য দেশের অধিকাংশ লোককে দেশময় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে থাকতে হয় না, স্থানে স্থানে অল্প জায়গার মধ্যে তাদের সম্ভবত্ব হ'তে হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী না থেকে নগরবাসী হয়। এবং গ্রাম্য হ'ল সভ্যতার বোঝাবাহী বর্কবর, আর নাগরিক তার ফলভোগী বিদগ্ধজন। সহরের দলবদ্ধ লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যা' সহজসাধ্য, সারা দেশে ছড়ান চাষীর জন্য সে ব্যবস্থা অতি দুঃসাধ্য।

ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমের এই পরিণতিতে ইউরোপের অনেক সমাজ-হিতৈষী ভাবুক স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁরা বলছেন এখন যদি ধনীর লাভের লোভ ও বিলাসের দাবী কমান যায়, এবং কাউকেও অলস থেকে পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করতে না দিয়ে পরিশ্রমের তার সকলের মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন অল্প সময়ের পরিশ্রমেই সমাজের সকলের প্রয়োজন ও অল্পস্বল্প বিলাসের উপযোগী ধন উৎপন্ন হতে পারে। আর সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল, সৃষ্টি-কৌশলীদের তার সৃষ্টির এবং অন্য সকলের তার রসগ্রহণের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের ব্যবস্থা হয়। সভ্যতার ভারবাহী হতভাগোর দল সমাজ থেকে লোপ পায়।

বিনা আগুনে এই অন্নপাক কি করে সম্ভব হবে? উত্তর অতি সহজ,—পরের আগুনের উপর পাকপাত্র চাপিয়ে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ চায় কৃষির পরিশ্রম ও তার আনুসঙ্গিক সমাজব্যবস্থার অসুবিধা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। অথচ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমের আদি ও অন্ত চাষীর পরিশ্রমের উত্তর নির্ভর করেছে। তার শিল্পের উপাদানও যোগাবে কৃষি, বিনিময়ও যোগাবে কৃষি। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ

থেকে কৃষির পরিশ্রম দূর করার অর্থ—অন্য সমাজের উপর সেই পরিশ্রম দ্বিগুণ করে চাপান, প্রতি সমাজে চাষীর যে সমস্যা ছিল, কতকগুলি সমাজ থেকে তা সরিয়ে অন্য কতকগুলি সমাজের ঘাড়ে তুলে দেওয়া ; পৃথিবীর প্রতি সভাদেশের একদল লোককে তার সভ্যতার ভারবাহী না করে', কতকগুলি সভাদেশের সভ্যতার ভার অন্য কতকগুলি দেশকে দিয়ে বহন করানো ; যে ছল ও বল প্রত্যেক সভ্য সমাজের একভাগ লোক অন্য ভাগের উপর প্রয়োগ করতো, সেই ছল ও বল আত্মীয়তার বাধা নিরপেক্ষ হয়ে মনুষ্যসমাজের একভাগের উপর প্রয়োগ করতে বাধা করা ।

যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে । এই সংঘর্ষেই রোমান সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বগ্দাদের মুসলিম সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে । ইন্ডোষ্ট্রিয়ালিজম্ সেই সংঘর্ষেরই এক মূর্তি । চাষের পরিশ্রম অস্বীকার করে' এও চাষীর পরিশ্রমের ফল লুটতে চায় । যে ধন ও ধনী একে চালনা করছে, তারাও মুখোত যাযাবর । এক দেশ থেকে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে প্রয়োজনমত চলে বেড়াতে তাদের কিছুতেই বাধা নেই । এবং এর হাতে বিনিময়ের বাটকাড়া থাকলেও, অন্য হাতে যাযাবরের শান্তি অস্ত্র বাহাল রয়েছে ।

সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্ডোষ্ট্রিয়ালিজম্ তার মীমাংসা নয় ; কারণ ও ব্যবস্থা মানুষের সমাজকে এক করে দেখে না এবং দেখতে পারে না । মানুষের এক অংশকে ভারবাহীতে পরিণত না করে', সভ্যতাকে কেমন করে বাঁচান ও বাড়ান যায়, সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে

ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজমের এর কোনও উত্তর নেই। মানুষের সভ্যতার চরম সমস্যা হচ্ছে চাষী। যেদিন চাষীকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, ফলভোগী করা সম্ভব হবে, কেবল সেইদিন সভ্যতার সমস্যার স্বার্থ মীমাংসা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রমাণ হবে গ্রীকপাণ্ডিত্যের কথাই সত্য,—দাসের শ্রম ভিন্ন সভ্যতার চাকা
অচল।

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

ঐদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র (১) ।*

শান্তিনিকেতন,

২২শে জুন, ১৯১৮ ।

সাদর সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

আপনার ১৯শে জুন তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইলাম । আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়টির সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুদ্ধি, তাহা এই :—

(১)

পশুপক্ষীদিগের জ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন নাই; তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কারই তাহাদের গুরু ।

(২)

মনুষ্যের অন্নবস্ত্রাদির অভাবমোচনের জন্য কৃষিবিদ্যা, বস্ত্রবয়ন-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা আবশ্যিক; এবং আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্য আত্মা-বিষয়ক এবং পরমাত্মা-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যিক ।

* মহৎ হৃদয় সামান্য জিনিষেও আপনাকে প্রকাশ করে । স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি, আমার বিশ্বাস তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য । দ্বিতীয় পত্রখানিতে আত্মশক্তির উদ্বোধন সম্বন্ধে অন্ন হু-চার কথাই তিনি যা বলেছেন, সেই জলন্ত বাণী আমাদের মধ্যে নব চেতনা সঞ্চারিত করুক । অসীম করুণাময়, সদানন্দ মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বরূপে প্রণাম করে এই ক'থানি চিঠি সকলের কাছে নিবেদন করছি ।

শ্রীঅধিরাম চক্রবর্তী ।

(৩)

শিক্ষা দুইরূপ, শুনিয়া শেখা এবং দেখিয়া শেখা। অম্মের ভিতর নানা প্রকার পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এটা আমাদের শুনিয়া শেখা; অম্মের ভিতর কত প্রকার কি কি পুষ্টিকর পদার্থ আছে—রসায়ণবিৎ পণ্ডিতের তাহা দেখিয়া শেখা। শুনিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—পরোক্ষ-জ্ঞান; দেখিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—অপরোক্ষ জ্ঞান।

(৪)

অপরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হস্তগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বপুরুষগণের এবং বর্তমানকালের সাধুসজ্জনের নিকট হইতে শুনিয়া শেখা পরোক্ষ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়।

(৫)

আপনি চান অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান।

(৬)

সকলেই আমরা ন্যূনাত্মিক পরিমাণে আত্মাকে জানি। আদবেই যদি আমরা আত্মাকে না জানিতাম, তবে আত্মার অভাব-মোচনের জন্য আমাদের মাথাব্যথা হইত না; তাহা হইলে আপনিও আমাকে ১২শে তারিখে পত্র লিখিতেন না, আমিও এ-পত্র লিখিতাম না। আত্মা আমাদের সর্ববাপেক্ষা নিকটের বস্তু, অতএব আত্মাকে আমরা সর্ববাপেক্ষা কম জানি, এইটিই আমাদের দুঃখ—একেবারেই যে জানিনা তাহা নহে।

(৭)

সমুচিত আত্মজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা যদি আমাদের নিকটতম এই আত্মাকে চৈতন্যময় আত্মারূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই সঙ্গে আপনাতে এবং সর্বত্রগতে চৈতন্যময় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি। আপন আত্মাকে আমরা ছায়া-ছায়ারূপে বা ঝাপসা ঝাপসা রূপে দেখি বলিয়া পরমাত্মাকেও অন্ধ শক্তিরূপে দেখি।

* * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পত্র (২) ।

শান্তিনিকেতন,
১লা জুলাই, ১৯১৮।

সাদর নিবেদন—

আপনার ২৯শে জুন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সকল কথার সবিস্তরে উত্তর দিতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না। আমি তাহার সম্বন্ধে যাহা সার বুঝি, তাহাই সংক্ষেপে বলি; বোধ করি তাহাতে আপনার আকাঙ্ক্ষা কতকটা মিটিতে পারিবে।

(১)

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

(২)

যাঁহার যে অবস্থা, তাহা কতক পরিমাণে তাঁহার অনুকূল, কতক পরিমাণে প্রতিকূল।

(৩)

এইরূপ অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া মনুষ্য নিতান্ত পশুবৎ অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো অগ্রসর হইতেছে।

(৪)

অগ্রসর হইতেছে কিসের জোরে? নৌকা অগ্রসর হয় কিসের জোরে? দাঁড়ের জোরে এবং বায়ুর জোরে। মনুষ্য অগ্রসর

হইতেছে আত্মার প্রভাবে এবং পরমাত্মার প্রসাদে। বায়ু অদৃশ্য—
দাঁড় দৃশ্য; তেমনি পরমাত্মার প্রসাদ অব্যক্ত—আত্মপ্রভাব ব্যক্ত।
আত্মপ্রভাব কি? না—আত্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি।

(৫)

মনুষ্য যদি আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস করিয়া, প্রতিকূল অবস্থার
সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইত—তুকানে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া
থাকিত— তাহা হইলে মনুষ্য, হয় অনেককাল পূর্বে মারা পড়িত,
নয় বংশপরম্পরাক্রমে পশুদিগের স্থায় মোহাক্রমভাবে জীবনযাত্রা
নির্বাহ করিত।

(৬)

ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য হাল ছাড়িয়া দেয়
নাই—সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয় নাই—ঈশ্বরদত্ত আত্ম-শক্তিকে কাজে
খাটাইতে বিরত হয় নাই। বিজ্ঞান-বীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া
দূরতম নক্ষত্রগণের গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন, অদৃশ্য পরমাণু
অপেক্ষা “কোটিগুণ সূক্ষ্মতর ভড়িতাণুর” (Electron-এর) গুপ্ত
সমাচার অবগত হইতেছেন; জীবশরীরের মধ্যে ব্যাধিজনক এবং
আরোগ্যজনক জীবাণুদলের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার
গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন। ধর্ম্যবীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া
ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রিপুদমনাদি করিয়া আত্মার নিগূঢ় তত্ত্বসকলের
গুপ্ত সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন
যে, আত্মা পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুর স্থায় সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও
সুখদুঃখ হইতে নির্লিপ্ত। আত্মার দর্শন পাওয়ার গুণে ইহাদের
সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

(৭)

প্রতিকূল অবস্থা মনুষ্যের প্রসুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে—এই হিসাবে প্রতিকূল অবস্থাও অমুকূল অবস্থারই আর এক মূর্তি। প্রতিকূল অবস্থা যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিত।

আত্মশক্তির উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানি না। আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোনো অভাবই থাকেনা। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার আত্মশক্তির নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মশক্তি—অর্থাৎ, জগৎব্যাপারে যে শক্তি খাটিতেছে সেই ঐশীশক্তি—কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

(৮)

আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা যতক্ষণ না পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ বুঝিতে পারা সম্ভবে না।

(৯)

গীতাশাস্ত্রে আছে “উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং । না আত্মানং অবসাদ-য়েৎ” ॥ আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। একবার যদি রাশি রাশি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে আত্ম-শক্তিকে রীতিমত উদ্দীপন করিয়া তুলিতে আমি পারি বা তুমি পার, তবে

দেখিতে পাইবে যে, জাগ্রত আত্মশক্তির শ্রায় মঙ্গল জগতে আর কিছুই নাই। তাহা সকল রোগের মহৌষধ। তা শুধু না—আমার আপন আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল জানিতে পারিলে পরমাত্মার আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের আপনার আত্মশক্তিকে আমরা যদি মনে করি যে, তাহা অস্তি সামান্য বস্তু— তাহা থা'ক্ ; আত্মশক্তি যেমন ঘুমা'তেছে ঘুমা'ক্ ; এখন আমার সাহায্যে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্—কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করা যাক্ আগে, আত্মশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা দেখা যাইবে তাহার পরে; হীরাকে যদি মনে করি কাঁচের বেলায়ানি—তবে আমরা আপনারই বা কি, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই বা কি—কিছুরই মধ্যে সার কিছুই পাইব না ; সবই আমাদের নিকট অসার এবং অপদার্থ বলিয়া মনে হইবে। আমাদের আপনার আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল, তাহাই যদি আমরা না বুঝিতে পারি—তবে পরমাত্মা যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব ?

* * * * *

আমি আপনি সাধনার পথে ততটা অগ্রসর হই নাই যে, অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র (৩) ।

শান্তি নিকেতন ।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১ ।

কল্যানীয়েষু,—

* * * * *

* * গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা তাহার গায়ে স্পর্শাকরে লেখা
রহিয়াছে—একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই তোমার নিকট তাহা
ঢাকা থাকিবে না । প্রথমেই রহিয়াছে ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ । ওঁকার একটি
মাত্র শব্দ, কিন্তু তাহার অর্থ সমস্ত জগৎ ছাড়াইয়া উঠিয়া পূর্ণব্রহ্মে পরি-
সমাপ্ত হইয়াছে । বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং ক্ষুদ্র
ব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ও সমস্তের মূলাধার সগুণ এবং নিগূণ
ব্রহ্ম—এ একটি শব্দের মধ্যে সমস্তই সম্বুক্ত রহিয়াছে । পত্রের সে
সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিতে আমি অসমর্থ,—সেইজন্য তুমি এখানে
আসিলে তোমাকে উপনিষৎ খুলিয়া তাহা আমি দেখাইয়া
দিব । ওঁকারের এইরূপ নিগূঢ় অর্থ অন্তশ্চক্ষুর গোচরে আনিবার
জন্য ভূভুবঃ স্বঃ এই তিনটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে । পৃথিবী
হইতে সপ্তম স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত জগৎ মোট বাঁধা রহিয়াছে । আমাদের
এই সূর্য যেমন একাই সমস্ত সৌরজগতের সার সর্বস্ব, তেমনি আদি
সূর্য অর্থাৎ পরমাত্মার আত্মশক্তি সমস্ত জগতের সার সর্বস্ব । তৎ

সবিতুর্বরেণাম্ ভর্গঃ—সেই আত্মশক্তি, তাহাই সর্ব জগতের জ্ঞান
প্রাণ এবং জ্যোতিঃ। তাঁহাকে ঋষিরা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করি-
তেন। এবং তাঁহার নিকট হইতেই সেই ধীশক্তি প্রার্থনা করিতেন,
যাহা মর্ত্য জীবগণের মাথার মণি এবং সর্বমঙ্গলের আকর।

এইটুকু আপাততঃ তোমাকে লিখিলাম, কিন্তু এর মধ্যে ঢের কথা
লুকান রহিয়াছে—দেখা হইলে বলিব। * * * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ নাটোরের মহারাজ



মহারাজা কগদিসুনাথ রায়ের মৃতদেহের শেষ সংস্কারের পর আমরা পাঁচজন যখন শ্মশান থেকে ফিরছিলুম, তখন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ আমাদের বলেন যে, আজ বাঙলার শেষ ভদ্রলোককে আমরা হারালুম।

এই কথাই স্বর্গীয় মহারাজা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনের কথা।

আমরা সকলেই ভদ্রলোক, অর্থাৎ—বাঙলায় যাকে ভদ্রশ্রেণী বলে, আমরা সকলেই সেই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু ভদ্রতা নামক গুণটি আমাদের সকলের মধ্যে সমান পরিস্ফুট নয়। ও বস্তুটি যে কি তা বলা কঠিন, যদিচ ও গুণের সাক্ষাৎ পেলে আমরা সকলেই তা চিন্তে পারি। গত নাটোরের মহারাজার চরিত্রে ও ব্যবহারে এ গুণটি এতই অসামান্য ছিল যে, তাঁকে বাঙলার শেষ ভদ্রলোক বলাটা অত্যুক্তি নয়।

আমরা এ যুগে ভদ্রতা নামক গুণের যতই কেন না আদর করি, আমাদের ভিতর সকলে সে গুণে গুণাশ্রিত হতে কোনরূপ চেষ্টা করেন না। ভারতবর্ষ থেকে নানারকম আর্ট দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এবং এ কথাও আমরা সকলেই জানি যে, ভদ্রতা নামক জীবনের আর্টটাও আমরা অনেক অংশে হারিয়ে ফেলেছি। এর নানা কারণ আছে,

কিন্তু এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ও চর্চা করবার আমাদের প্রবৃত্তিও নেই, অবসরও নেই। আমরা ভাল লোক হতে পারি মন্দলোক হতে পারি; কিন্তু সৌজন্য গুণটিকে আমরা তেমন লোভনীয় মনে করিনে, বা তাঁর ষথার্থ চর্চাও করিনে। সুতরাং যে জগদিস্রনাথ সৌজন্যের অবতার ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা যে তাঁর শেষ ভদ্রলোক হারালে, এ কথা বলায় নিখ্যা কথা বলা হয় না। অন্ততঃ তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এ কথাই কোনও প্রতিবাদ করবেন না। আর তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বাঙলা দেশে কম নয়। কারণ যঁার সঙ্গে তাঁর মাত্র দুদিনের পরিচয়, তিনিও মহারাজকে বন্ধু হিসেবেই দেখতে শিখেছিলেন। কারণ মহারাজ স্বভাবতই মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে বন্ধু হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই উদার অমায়িকতা আভিজাত্যেরই একটি বিশিষ্ট গুণ।

মহারাজের সকল ব্যবহার সকল কথাবার্তার ভিতর যা বিশেষ করে ফুটে উঠত, সে হচ্ছে তাঁর আভিজাত্য।—আমরা এ যুগে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সকলেই অল্পবিস্তর ডিমোক্রাসির ভক্ত হয়ে উঠেছি। এ ভক্তিরও যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে, এবং কোন কোনও হিসেবে ডিমোক্রাসিই ষথার্থ আদর্শ। কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, জন-সাধারণের আর যা গুণ থাকুক না কেন, আভিজাত্য নামক গুণটি তাদের শরীরে নেই। আমরা আজও এতটা ডিমোক্রাট হয়ে উঠিনি যে, আভিজাত্যের মর্যাদা আমরা বুঝতে পারি নে। বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষে আভিজাত্য লাভ করে না। সব ফুলই ফুটে ওঠবার জন্য অনুকূল অবস্থার অপেক্ষা রাখে। বাঁহিরের অবস্থা মানুষের ভিতরকার গুণকে ফুটিয়ে তোলবার সাহায্য করতে পারে অথবা বাধা দিতে পারে; কিন্তু যঁার প্রকৃতিতে যা নেই, তাঁর সৃষ্টি

করতে পারে না। সুতরাং মহারাজার চরিত্রের যে গুণ তাঁর বন্ধুবান্ধবকে বিশেষ করে মুগ্ধ করত, সে গুণের বাঁজ তাঁর অন্তরেই নিহিত ছিল।

আমরা সকলেই ভদ্রলোক, ও সমাজে বাস করতে হলে আমরা সকলেই কতকপরিমাণে সৌজন্যের চর্চা করতে বাধ্য এবং করেও থাকি। তবে যে গুণ ভদ্রসমাজ-সামান্য—সে গুণ এ ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচ জনের কাছে অসামান্য বলে ঠেকত কেন? এর কারণ তাঁর ব্যবহারের ভিতর এমন একটা অপূর্ব শ্রী ছিল, যা আমাদের ব্যবহারের ভিতর নেই।

এই শ্রী জিনিষটি কি, তা কথায় বুঝিয়ে বলা কঠিন। বড় জোর একটা ইংরাজী কথার সাহায্যে বলতে পারি, এটি হচ্ছে একটি aesthetic quality। মহারাজার সকল কথায় সকল কাজে সকল ব্যবহারেই যা বিশেষ করে ফুটে উঠত, সে হচ্ছে তাঁর প্রকৃতির এই aesthetic ধর্ম। শ্রী জিনিষটি হচ্ছে প্রাণের একটি ধর্ম। ও বস্তু জড়জগতে নেই। তাই জড়পদার্থে যখন আমরা প্রাণের এইরূপ আরোপ করি, তখন তার নাম হয় পালিস। কিন্তু পালিসের চাকচিক্য চিরকালই বাইরের জিনিষই থেকে যায়, আর শ্রী জিনিষটি ভিতর থেকে বাইরে ফুটে বেরোয়।

মহারাজা নাটোর যে সঙ্গীতের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, এ কথা সর্বলোক-রিদিত। এ বিষয়ে তিনি একজন বড় গুণীও ছিলেন। পাখোয়াজি হিসেবে তিনি বাঙলার ভিতর একজন অগ্র-গণ্য গুণী ছিলেন। তাঁর চাইতে ঢের বড় ওস্তাদ পাখোয়াজি এ দেশে অবশ্য আছে, বিশেষত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে। এই বড় বড় ওস্তাদরা পাখোয়াজি যেসকল বড় বইয়ে দিতে পারতেন, যেসকলজন করতে

পারভেন—মহারাজার পক্ষে তা করা অসাধ্য ছিল। কিন্তু এ যন্ত্রে তাঁর তুল্য মিষ্টি হাত আর কারও ছিল না। এক কথায় তাঁর মৃদঙ্গ বাদনের ভিতর শ্রী নামক গুণটি পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত।

বাজনায় তাঁর হাত যেমন মিষ্টি ছিল, আলাপে তাঁর মুখ তেমনি মিষ্টি ছিল। যঁরা তাঁর যৌবন-সুহৃদ—তাঁরাই নন্দ্যসুহৃদ কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সেকালে তাঁর কথাবার্তার ভিতর যে রস ছিল, শুধু তাই নয়—তেজও পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর প্রতি কথা একটি সরস সতেজ মনের পরিচয় দিত। আমি জীবনে এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত জগদিন্দ্রনাথের তুল্য সুরসিক দ্বিতীয় ব্যক্তি আর দেখি নি। সামান্য আলাপের ভিতরও যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—তা যিনি মহারাজার সঙ্গে কখনো মনখুলে আলাপ করেছেন, তিনিই তা জানেন।

সংসার-বিষবৃক্ষের যে কাব্যামৃতরসাস্বাদ ও সজ্জনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে দুটিমাত্র অমৃতোপম ফল, এ কথা মহারাজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ও-দুটি ফল সকলে ভোগ করবার অধিকারী নয়। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন এ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।



নবম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩২

সবুজ পত্র ।

সম্পাদক—শ্রী প্রমথ চৌধুরী ।

পেনাঙের পথে ।



আমরা যে জাহাজে যাচ্ছিলুম সেটা হ'চ্ছে এই ধরণেরঃ— সামনেটা দোতলা ; উপরের তলায় জাহাজের যন্ত্রপাতি লোহালকড় দড়িদড়া এই সব ভরা ছিল, আর নীচের তলায় কতকগুলি ক্যাবিন, সেখানে খালাসীদের থাকবার জায়গা। এই সামনের অংশে যাত্রীদের থাকবার স্থান ছিল না। তার পরে হ'চ্ছে একতলা খোলা ডেক ; সেখানে মাঝে একটু সরু পথ রেখে দু'ধারে ফাঁকা জায়গায় ভেড়ার পাল রাখা হ'য়েছে। তার পরে হ'চ্ছে জাহাজের মধ্যভাগটা ; সেখানে সব নীচে ইঞ্জিন-ঘর, তার উপরে খোলা ডেকের সঙ্গে একতলায় কতকগুলো ক্যাবিন, সেখানে জাহাজের অফিসাররা কেউ কেউ থাকেন, আর কতকগুলি ক্যাবিন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট হ'য়েছে ; তার উপরে প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন, আর প্রথম শ্রেণীর খাবার জায়গা, আর তার চারধারে খোলা ডেক ; আবার তার উপরে হ'চ্ছে কাপ্তেনের ঘর, জাহাজ চালাবার চাকা, এই সব। এই মাঝের অংশের পরে আবার খানিকটা মাথা-খোলা খালি জায়গা—ডেক। এর তলায় সব মাল পোরা হয় ; এইখানটার ভেড়া ছাগলের জন্যে শুখনো ঘাসের বোঝা, মুরগীর খাঁচা, একটা গুম্‌টীর মতো ঘরে চীনে বাবুর্চী-খানা, আর এক পাশে মস্ত একটা লোহার সিন্দুকের মতন, সেটা হ'চ্ছে ডেকযাত্রীদের জন্যে উন্নু। এই লোহার বাস্তের ভিতর পাথুরে

কয়লার আগুন দেওয়া হ'ত, বাস্কর ডালাটী তেতে উঠত, সেইটে চাটুর মতন রুটী সেক্‌বার জন্য ব্যবহার হ'ত, আর ডালাটীর তিন চার জায়গায় গোল গোল ক'রে কাটা, তার উপর হাঁড়ী চড়িয়ে ভাত 'ডাল তরকারী সিদ্ধ করা যেত। বিস্তর যাত্রী বিছানা কন্দল বিছিয়ে এই খোলা ডেক দখল ক'রেছিল, কিন্তু মাঝসমুদ্রে ঝড়-তুফান হাওয়ায় পরে সবাইকে সেখান থেকে স'রে অন্য আশ্রয় নিতে হয়। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকত, তখন রোদ্দুর আটকাবার জন্য এই দু'ধারের খোলা ডেকের উপর ত্রিপলের শামিয়ানা টাঙানো হ'ত। পিছনের এই খোলা ডেকের পরে হ'চ্ছে জাহাজের পশ্চাঙ্গাগ—এটা সামনের মতন দোতলা; নীচের তলাটা—যেটা খোলা ডেকের সামিল—সেটা হ'চ্ছে একটা ছাতওয়ালা হল বিশেষ—এই জায়গাটা ডেক-যাত্রীতে ভর্তি; উপরের তলা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা, এখানেও বিস্তর ডেক-যাত্রী যে যেখানে পেরেছে বিছানা বিছিয়ে একটু ক'রে জায়গা দখল ক'রে আছে। ঝড়ের সময় এই উপরতলার ডেক-যাত্রীদেরও নীচে এসে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। জাহাজে ডেক-যাত্রীদের মিঠে জল দেবার জন্য একটা পাম্প ছিল, সকাল বিকেল দু'ঘণ্টা ক'রে সেই পাম্পকল খুলে রাখা হ'ত। পাম্পটা ছিল জাহাজের সেই ওপাশে খালাসীদের ঘরের কাছে; এদিক থেকে ডেক-যাত্রীদের জলের দরকার হ'লে জাহাজের মাঝের ইঞ্জিনঘরের ভিতর দিয়ে, ভেড়া ছাগল পেরিয়ে, তবে তারা পাম্পের কাছে পৌঁছতে পারত। জল নেবার জন্য সরু-মুখ একরকম টিনের তুন্দী প্রায় সবাই ক'লকাতা থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল।

ডেক-যাত্রীদের কথা এইবার একটু বলা যাক। এদের মধ্যে

প্রথমেই চোখে প'ড়ল চীনেদের। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন চীনে ছিল, অধিকাংশই কাণ্টনের যাত্রী—হঙ্কঙে নামবে; তারা ক'লকাতায় বেশীর ভাগই মুচীর কাজ করে। ক'লকাতায় ছুতোরের কাজ যে সব চীনেরা করে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ শুনেছিলুম শাঙ্হাইয়ের লোক। চীনেরা আরাম, ভোগসুখ—যাকে বলে creature comforts—তা বেশ বোঝে। এরা ডেক-টিকিট কেনে, তাতে খাবারের দাম ধরা থাকে, হাত পুড়িয়ে রান্না করার ধার ধারে না, ষ্টীমার থেকেই এদের খাবার যোগায়। এদের জন্য চীনে রান্নাঘরের ব্যবস্থা আছে, তার কতকগুলো চীনে বাবুর্চীও আছে। আর দু' একজন চীনে কেরাণীও থাকে, এদের চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের জাহাজ তখনও গঙ্গাতেই র'য়েছে, রাত্রে বন্ধ ক্যাবিনে ঘুম হ'চ্ছে না; জাহাজে এই প্রথম রাত্রি, মনে ভাবছি উঠে ডেকে গিয়ে একটু পায়চারী ক'রে আসি,—এমন সময়ে চমৎকার বাঁশীর আওয়াজ কানে এল। এ বাষ্পঘানের ভেঁপু নয়, একেবারে আমাদের দেশের বাঁশের বাঁশীর আওয়াজ। বিছানা থেকে উঠে আওয়াজ ধ'রে ক্যাবিনের পাশের সরু পথ দিয়ে গিয়ে দেখি যে, এই বাঁশী বাজছে অন্য এক ক্যাবিনে—মস্ত বড় ক্যাবিন এটা, তাতে গোটা ছয় আট বাস বা বিছানা; পরে বুঝলুম সেটা হ'চ্ছে চীনে কেরাণী আর বাবুর্চীদের থাকবার জায়গা। রাত্রি প্রায় দশটা হবে তখন, কাজকর্ম চুকিয়ে চীনেরা ঘুমতে যাবার আগে একটু আমোদপ্রমোদ ক'রছে। Chinaman at work খুব দেখেছি, Chinaman at play দেখবার এই প্রথম সুযোগ ঘটল। ক্যাবিনটার দরোজা খোলা, আমি সরু পথটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের রকমটা দেখতে লাগলুম।

এরা আড়চোখে দু' একবার আমার দিকে তাকালে, কিন্তু কিছু ব'ললে না। ক্যাবিনের মাঝে একটা ছোটো টেবিলের চারধারে বাঁশের মোড়া কুরসীতে ব'সে জন চারেক মিলে কি একটা খেলছে—ছোটো ছোটো ডমিনো খেলার পাশার মতো কি নিয়ে; হয়তো সেটা আজকাল ইউরোপে আর আমেরিকায় যা খুব চ'লেছে, সেই “মা-জু” খেলা হবে। অনেকেই কালো রেশমের থোকা-ঝোলানো লম্বা চীনে নল দিয়ে তামাক খাচ্ছে। খেলার মধ্যে গল্প গুজবও চ'লেছে, মাঝে মাঝে বোধহয় দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটু কলরবও উঠছে। কোণে একটা উঁচু তেপায়ার মতন, তাতে একটা ছোটো তোলা উনুনের উপর চা-দানে চা ফুটছে, পাশে সবুজাভ চীনে মাটির দু'তিনটে ছোট ছোট পেয়ালা—একটা পেয়ালায় দু' তিন ঢোকের বেশী পানীয় ধ'রতে পারে না, বিলিভী liqueur glass ব'ললেই হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন না একজন মাঝে মাঝে উঠে এসে একটু ক'রে ফুটন্ত চা পেয়ালায় ঢেলে খেয়ে যাচ্ছে। বড্ড গরম, তায় ক্যাবিনের ভিতর,—প্রায় সকলেরই কোমর পর্যন্ত গা খোলা। ক্যাবিনের বিছানাগুলিতে এক একজন চীনে শুয়ে বা আধশোয়া হ'য়ে আছে—একজন নীচের বাঞ্চে পা ঝুলিয়ে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে—লম্বা তলতা বাঁশের মতো পাতলা বাঁশের বাঁশী, তাতে কালো আর লাল রেশমের গোছা বাঁধা; আর একজন চীনে, সারেঙীর মত একটা যন্ত্র,—অতি অল্পসংখ্যক তার তাতে আর বেজায় কর্কশ ধ্বনি তার,—সেইটা নিয়ে বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গত ক'রছে। জন দুই এই সব হট্টগোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বই প'ড়ছে—চীনে বই—বেশ নিবিষ্টচিত্তে প'ড়ছে দেখলুম। ক্যাবিনের একদিকে দেয়ালে লম্বা লালরঙের একটা

কাগজে কালো চীনে কালীতে তিন চারটে চীনে হরফ লেখা র'য়েছে দেখলুম—কোনও শুভ বচন হবে। ভীষণ গরম, ক্যাবিনের ভিতর আর বাইরে চীনে তামাকের উৎকট গন্ধ, কথাবার্তার কলবুব, দূরে ষ্টীমারের বাইরে গঙ্গার উপর সমাগত নৌকার মাঝিদের চাঁচামেচি, এই সব ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে বাঁশীর তানটুকু উঠছিল—সুরটা একঘেয়ে হ'লেও বেশ মিষ্টি আর করুণ লাগল। মোটের উপর এই চীনে বাবুর্চীদের আমোদে চিত্তবিনোদনে একটা উঁচুধরণের cul-
ture-এর হাওয়া আছে ব'লে মনে হ'ল।

তখন নোতুন চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হ'য়েছে, মাঝু রাজারা আর সিংহাসনে নেই। চীনে যাত্রীরা প্রায় সবাই হ'চ্ছে নিম্নশ্রেণীর লোক—জুতাওয়ালা, ছোটোখাটো ব্যবসাদার, ফেরিওয়ালা। দু' চার জনের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বাঙলা ইংরিজিতে আলাপ ক'রলুম। চীনা রিপাবলিকের কথা—“চুঙ্-হবা” অর্থাৎ মধ্য দেশ, পুষ্পদেশ—চীনের “মিঙ্-কোয়” অর্থাৎ গণ-রাষ্ট্রের কথা সকলেই খুব ফুর্তির সঙ্গে, খুব গর্বেবর সঙ্গে উল্লেখ ক'রলে। এরা প্রায় সকলেই দখিনে চীনে। মাঝু রাজবংশের উপর এদের জাতক্রোধ। গায়ের শক্তিতে, চেহারার লম্বাই চওড়াইয়ে উত্তরের চীনেদের চেয়ে খাটো হ'লেও, বুদ্ধিতে এরা খুব দড়, আর এরা যে বড্ড গোঁয়ার-প্রকৃতির, তাও প'ড়েছিলুম। এদের দুর্দর্ষতার দু' একটা প্রমাণ জাহাজেই পাওয়া গেল।

পিছনের দিকের উপরের দোতলা ডেকে বহু যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে। কতকগুলি তথা-কথিত নীচ জাতির পাঞ্জাবী—চুহড়া—আর কতকগুলি শিখ আর পাঞ্জাবী মুসলমান, যে যেখানে পেরেছে কম্বল বা গুণচটের

বিছানা পেতে শুয়ে আছে। এই দোতলা ডেকটির মাঝখানটা হ'চ্ছে জাহাজের যন্ত্রপাতি, লঙ্গরের মোটা শিকলী, কপিকল, ক্যাপ্‌স্ট্যান প্রভৃতিতে সমাকুল। তার মধ্যে মধ্যে যেখানে একটু খালি জায়গা আছে, সেখানেই এক একজন মোটঘাট বসিয়ে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে। কতকগুলি চীনা "হামক" বা দড়ীর ঝোলা টাঙিয়ে তার ভিতর শুয়ে র'য়েছে, আর কতকগুলি বাঁশের বেঞ্চি পেতে বিছানা বানিয়ে নিয়েছে। এরি মধ্যে এক পাঞ্জাবী মুসলমান ফৌজী লোক, ছ'ফুটের উপর ঢ্যাঙা হবে, নিজের স্ত্রীর আর নিজের জন্ম জায়গা ক'রে নিয়েছে। স্ত্রীটি হ'চ্ছেন পর্দানশীন। একখানা দড়ির চারপাই খাট উপরে তুলে নিয়ে মিশ্রাসাহেব স্ত্রীর জন্ম জায়গা ক'রেছে, আর একটা মশারি টাঙিয়ে দিয়ে বিবির আক্রমণ রক্ষা ক'রেছে। খোলা সমুদ্রের হাওয়ায় প'ড়ে মশারি প্রতি মুহূর্তে দড়ি ছিঁড়ে উড়ে পালাবার চেষ্টায় আছে, তাই তাকে তলায় দড়ি-দড়া দিয়ে ইঁট বেঁধে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। পরে জোর ঝ'ড়ো বাতাসে মশারি ঢাকা দিয়ে আক্রমণ রাখা আর সম্ভবপর হয় নি—সেটা হচ্ছে পরেকার কথা। যাক, খোলা সমুদ্রে জাহাজের দুলুনি আরম্ভ হ'য়েছে। পাঞ্জাবী বীরেরা চক্র খেয়েছেন, সকলেই করুণ, হাশ্বোদ্দীপক মুখ ক'রে শুয়ে প'ড়ে আছেন, মাঝে মাঝে উঠে ট'লতে ট'লতে বা ব'সে পা ঘ'ষে ঘ'ষে ডেকের রেলিঙের ধারে গিয়ে বসি ক'রে আসছেন। আমার এই প্রথম সমুদ্রযাত্রায় সৌভাগ্যক্রমে চক্র লাগার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম, তাই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখছিলাম। এখন এই উপরের ডেকে গিয়ে দেখি, ফৌজী পাঞ্জাবী এক কাম্বল পেতে শুয়ে আছে, তার সাজা ভামাক বেকার হ'য়ে

গড়গড়ায় পুড়ে যাচ্ছে—তার স্ত্রী মশারির পর্দার মধ্যে খাটিয়ায় বসে আছে,—আশেপাশে চীনে, পাঞ্জাবী। একটা চীনে লোক শুয়েছিল জাহাজের একটা উঁচু জায়গায়। তার ভালো ক’রে পা ছড়িয়ে শোবার সুবিধা হ’চ্ছিল না, কারণ সেই উঁচু জায়গাটিতে অন্য কার একটা টিনের কানেস্তারা ছিল। হঠাৎ চীনেটা সেই কানেস্তারায় একটা লাথি মেরে সেটিকে নীচে ফেলে দিলে, তারপর বেপরোয়া হ’য়ে দিব্যি পা ছড়িয়ে আরাম ক’রে শোবার চেষ্টা ক’রলে। কানেস্তারাটা ছিল ফোঁজী পাঞ্জাবীর; সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললে—“এই, ইয়ে মেরী টীজ হায়, তুম্নে কেঁয়া ইসে নীচে গিরায়া।” ব’লে উঠে জিনিসটা তুলে, যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার এসে শুলো। চীনেম্যান চুপ ক’রে দেখলে, পাও সরিয়ে নিলে, কিন্তু যেই পাঞ্জাবী শুয়েছে, অমনি আবার লাথি মেরে কানেস্তারাটা ফেলে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে অশ্রাব্য ভাষায় পাঞ্জাবীকে গালাগালি দিলে। তাতে পাঞ্জাবীও হিন্দুস্থানীতে তার উপযুক্ত জবাব দিয়ে, টলতে টলতে উঠে, জোর ক’রে জিনিসটা রাখলে। তারপর চীনেটিকে একবার বেশ ক’রে দেখে নিয়ে, গড়গড় ক’রে চীনে ভাষায় তার সঙ্গে তক্রার করতে লাগল। দেখলুম দুজনের খুব ঝগড়া বাধল চীনে ভাষায়। আশেপাশে, ঝোলা বিছানা থেকে, ডেক থেকে, বেঞ্চি থেকে চীনেরা মাথা তুলে দেখতে লাগল। খোলা হাওয়া, রোদদুর, চারদিকে অনন্ত দিক্চক্রবাল,—এর মধ্যে দুলতে দুলতে জাহাজ চলেছে—আর সেই জাহাজের মধ্যে এই দুটা প্রাচীন জাতের প্রতি-নিধি এইরকম ঝগড়া লাগালে। মিনিট দুই ঝগড়ার পর হঠাৎ চীনেম্যানটা একটা বাঁশের টুল তুলে পাঞ্জাবীকে মারবার জন্ম

ওঠালে। পাঞ্জাবী সেটীকে ধ'রে ফেলতেই চীনেম্যান একেবারে “বেঙ্-তড়্কা” লাফে লাফিয়ে উঠে, দু'হাত দিয়ে পাঞ্জাবীর টুঁটি চেপে ধরলে, পাঞ্জাবী পাঁচ সেকেন্ডের জন্য কাবু হ'য়ে রইল। এই সব ব্যাপার যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে ঘটল। আমি অবাক হ'য়ে এই লম্বা চওড়া ছ' ফুট ঢ্যাঙা পাঞ্জাবী জোয়ানের সঙ্গে পাঁচ ফুট খর্বাকৃতি চীনেম্যানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে লাগলুম। আশপাশ থেকে চীনেরা তাদের জাত-ভাইকে উৎসাহিত ক'রতে লাগল। পাঞ্জাবীর স্ত্রী তার মশারির পর্দার ভিতর থেকে খুব তীব্র গলায় চৈঁচিয়ে উঠল—ভয়ে নয়। অন্য পাঞ্জাবী সকলে চক্র লাগার দরুণ কাতর, তারা যাকে ইংরিজিতে বলে languid interest, সেই ক্ষীণভাবের গরজে-পড়া দরদ দেখিয়ে তাকাতে লাগল। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী দুই ধাক্কা দিয়ে চীনেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে,—চীনে তখন হাতের কাছে ছোটো একটা লাঠী কি যা কিছু একটা পেয়েছে সেইটে নিয়ে আক্রমণ করবার জন্য আবার তেড়ে আসছে। পাঞ্জাবীটা তার জাতভাইদের দিকে চেয়ে—“লাক্‌ড়ী লাও, লাক্‌ড়ী লাও”—অর্থাৎ “লাঠী দাও, লাঠী দাও” ক'রতে করতে এগিয়ে গিয়ে চীনের ঘাড়টা বাঁ হাতে ধ'রে তার পিঠে কাঁখে দুম্-দাম্ ক'রে বজ্রমুষ্টি লাগাতে আরম্ভ করলে। দুজনে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি, চৈঁচামেচি; চীনেরা দু-চার জনে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ এগোতে সাহস ক'রলে না। ইতিমধ্যে গোলমালে জাহাজের এক ইংরেজ অফিসার এসে প'ড়ল। সে আসতেই সব চুপ। চীনেম্যান এর মধ্যে বেশ মারটাই খেয়েছে, সে আর বেশী ঘাঁটাতে চাইলে না, সাহেবকে আসতে দেখে নিজে আস্তে আস্তে স'রে গেল সেই ডেক থেকে। ইংরেজ আসতেই আমাদের

পাঞ্জাবী খাড়া দাঁড়িয়ে ফৌজী কায়দায় তাকে সেলাম ক'রলে, আর ভাঙা ইংরিজিতে ব'ললে—“সার, দিস্ চায়্‌নামায়ন্, ওয়েরী বায়্‌ড্‌ মায়্‌ন্, মায়্‌ থিস্ সাটে হিয়ার, হি কিক্‌ মায়্‌ থিস্, হি এবিউজ্‌ মি, আয়্‌ আয়্‌ন্ হাওইল্দার হাঙ্কাঙ্ মিলিটারী পোলিস্”। তাকে ধামিয়ে দিয়ে সাহেব হুকুম দিলে, “তুম ইয়ে তুম্‌হারা ক্যানিষ্টার হটাও।” সেলাম বাজিয়ে সে তখনি তার জিনিষ সরিয়ে নিলে। ইংরেজ অফিসারের পিছন পিছন চীনে কেরণী এসেছিল, তাকে আন্তে আন্তে কি ব'ললে, তাতে সে “অল্‌ লাইট্, অল্‌ লাইট্” ব'লে চ'লে গেল। ব্যাপারটা এইখানেই সাক্ষ হ'ল।

ডাক্তারবাবুর কাছে শুন্‌লুম, এই চীনেরা মার মারি করতে খুবই পটু, আর রাগ হ'লে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাতের কাছে যা'পায় তাই নিয়ে মেরে বসে। প্রত্যেক জাহাজে এইরকম ছোটোখাটো মারামারি এরা অন্য জাতের লোকের সঙ্গে তো করেই—পাঞ্জাবীদের হাতে মাঝে মাঝে মার খায়ও বেশ—কিন্তু দমে না; আর আপোষে জুয়ো খেলতে খেলতেও মারামারি করে। মালয় অঞ্চলে দক্ষিণ চীন, হঙ্কঙ্ আময় প্রভৃতি বন্দর থেকে বিস্তর চীনে কুলি প্রতি বৎসর যাওয়া-আসা করে, তখন জাহাজের অফিসারদের খুব সতর্ক থাকতে হয়। দাঙ্গাফাসাদের জন্ম ৩০।৪০ জনকে কখনো কখনো হাতকড়া লাগিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। সময় সময় নাকি পিস্তলও দেখাতে হয়। এদের স'কমস'কম দেখে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয় না। জাহাজযাত্রী চীনে আর জাহাজযাত্রী ভারতীয় ডেক-প্যাসেঞ্জারদের আমার ক'লকাতা-পেনাঙ যাওয়া-আসার আট দিন আট দিন ষোলো দিন যা দেখেছি, তাতে পূর্ব-এসিয়ার কতকগুলি জটিল সমস্যার একটি দিক

আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবো।

আগেই ব'লেছি যে চীনেরা creature comforts বেশ বোঝে। এরা জাহাজে সফর করে, গরীব শ্রেণীর লোক, ডেক যাত্রী,—গোঁড়া হিঁদুর মত চাল চিঁড়ে ছাতু বেঁধে নিয়ে নয়, বা মুসলমানের মতো হাত পুড়িয়ে রেঁধে নয়। এরা ডেকের যাত্রী হ'লেও খাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে বেরোর, টিকিটের দামের সঙ্গে খাবার খরচও ধ'রে দেয়। জাহাজে তাই বাবুর্চীখানা আছে, তা'থেকে এদের সকালে বিকেলে দু'বার খাবার দেওয়া হয়। দেখতুম, চীনে যাত্রী সারাক্ষণ তার কন্ডলের ভিতর বা ঝোলা বিছানার ভিতর বা বেতের চেয়ারের মধ্যে শুয়ে ব'সেই কাটাচ্ছে—বেশী বেড়াতে চেড়াতে এদের দেখতুম না—পরস্পর কথবার্তা ব'লছে, গল্পগুজব চালাচ্ছে, বই প'ড়ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, কখনো কখনো সারেসরীর মতো যন্ত্র একটা ক্যা-কো' ক'রছে। কিন্তু সকাল দশটায় আর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যেই বাবুর্চীখানা থেকে বালুতি ক'রে ভাত আর চীনে মাটির বাসন ক'রে নানা চীনে তরকারীবাঞ্জন নিয়ে বাবুর্চীরা উপরের ডেকের “চীনে-পাড়ায়” উপস্থিত হ'ত, অমনি একটা সাড়া প'ড়ে যেত, চারদিকে যত চীনে-ম্যান সব জেগে উঠত—গা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ত সবাই—একটা টেবিলের চারদিকে বাঁশের টুল চেয়ার সব টেনে এনে ব'সে যেত। চীমেদের খাওয়ার রীতি আমি দেখতুম—কেমন ক'রে ভাতের বাটীটা বাঁ হাতে ধ'রে মুখের কাছে এনে, ডান হাতে দুটো বড়ো কাঠি ধরে ভাত সরিয়ে সরিয়ে মুখের ভিতর পুরে দেয়, তারপর লঘু হাতে কাঠি দুটির সাহায্যে সামনের বড়ো বড়ো রেকাবী আর ছোট

চীনেমাটির গামলার মতন পাত্র থেকে তরকারী মাছ মাংস সব তুলে তুলে নিয়ে মুখে পোঁরে; তরকারীর মধ্যে দেখতুম অনেক সময়ে আলু পেঁয়াজকলি প্রভৃতির মধ্যে মস্ত এক মাছ আস্ত বিরাজ ক'রছে। একটা সাদা পাতলা জিনিষ এরা খুব খেত। সমস্ত খাওয়ার মানা গন্ধ ছড়িয়ে যে মিশ্র গন্ধটা বার হ'ত, তার মধ্যে পচা বা স্ফুটকি মাছের চাম্বে সৌরভের রেশটাই সব চেয়ে মোটা সুরে দূর থেকে আমার নাকে বাজত।

চীনে যাত্রীরা অধিকাংশই দক্ষিণ চীনের লোক। দুজন চীনে কিন্তু ছিল, তারা হ'চ্ছে মধ্যচীনের, শাঙ্‌হাই অঞ্চলের। এরা ছিল বাজীকর,—এক বুড়ো, আর তার ছোকরা চেলা। বাজীকরের কাজে ভারতবর্ষে এরা কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি ব'লে মনে হ'ল। মাঝে মাঝে বোধহয় এইরূপ চীনে বাজীকর ছিটকে ভারতবর্ষেও এসে পোঁ'ছয়, আর তারা ভারতের মধ্যে দূর দূর জায়গায় ঘুরে ফিরে বাজী দেখিয়ে—বাঁশবাজী ধরণের কসুরং, যা দু সব জড়িয়ে—কিছু রোজগার ক'রে থাকে। বছর কয় পূর্বে আমি এলাহাবাদে দেশী মহাল্লায় একবার এইরকম চীনে বাজীকরদের, কাঁসরের আওয়াজে দর্শকদের কান ঝালাফালা ক'রে বাজী দেখাতে দেখেছিলুম। এই দুই চীনে যাচ্ছিল অতি গরীবের মতো; অল্পস্বল্প তল্লিতল্লা নিয়ে ডেকে গুণ চটের বিছানা পেতে প'ড়ে থাকত। ছোকরা তার গুরুর খুবই সেবা ক'রত দেখতুম। কোথা থেকে একটা ভারতবর্ষীয় পিতলের লোটা এরা সংগ্রহ ক'রেছিল—চীনেম্যানের ব্যবহারে আমাদের দেশের ঘটা একটু বিশেষ ক'রেই চোখে লেগেছিল। এইটেই এদের তৈজস ছিল, আর তা একাধারে পানপাত্র আর পিকদানি উভয় কাজেই লেগে-

ছিল। খুব গরীব ব'লে বোধহয় অন্য চীনেদের সঙ্গে এরা বড়ো মিশত না, আলাদাই থাকত, আর এদের জন্য ভাততরকারী আলাদা ক'রেই দিয়ে যেত। খুব সম্ভব ভাষাসঙ্কট না মেশার আর একটা কারণ। এরা মধ্যচীনের লোক, দক্ষিণ চীনের ভাষা এরা বুঝত না, আর এদের ভাষাও দক্ষিণ চীনের লোকেরা বুঝত না। আমি এই দু' অঞ্চলের ভাষা এক বর্ণ না বুঝেও কানে শুনেছি—ধ্বনি আর উচ্চারণ হিসাবে তখন দুটো একেবারে আলাদা আলাদা লেগেছিল। উত্তরের ভাষাটি বেশ শ্রুতিমধুর—তালব্য 'চ'কার 'শ'কার বহুল; আর দক্ষিণের ভাষা অতি কর্কশ—'খ' 'হ' এই সব ধ্বনি বডড বেশী কানে লাগত। এর মত কর্কশ ভাষা খুব কম শুনেছি। চীন দেশের লোকসংখ্যা নাকি চল্লিশ কোটি। এদের মধ্যে প্রায় গোটা আঠারো ভাষা আছে। অক্ষর বা চিত্রলিপি সমস্ত চীনময় এক, কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ পার্থক্য এসে গিয়েছে। তাতে ক'রে এই দাঁড়িয়েছে যে, চীনা ভাষায় কিছু লিখে দিলে সমগ্র চীনদেশের পড়িয়ে চীনেরা সকলেই সেটা বুঝতে পারবে, কিন্তু সেই লেখাটা এক প্রদেশের মতন উচ্চারণ ক'রে প'ড়লে অন্য প্রদেশের লোকেরা বুঝতে পারবে না। এটা ত গেল চীনা সাহিত্যের ভাষা, সাধু ভাষার কথা। প্রাদেশিক কথিত ভাষার বাক্যরীতিতে আবার নানা পার্থক্য দাঁড়িয়েছে। চীনদেশে পেকিং অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা আর সেখানকার উচ্চারণ শিষ্ট ব'লে গণিত; শিক্ষিত লোকেরা, উচ্চ রাজকর্মচারীরা পেকিংয়ের ধরণে চীনা ভাষা ব'লতে শেখেন। চীনে গণতন্ত্রের শাসকেরা এই “কান হু” বা উত্তর চীনের ভাষাকে এখন সমস্ত রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা ক'রতে চান। কিন্তু এতে নানা অসুবিধা আসছে।

আমাদের দেশে এই অবস্থা কল্পনা করা একটু মুক্কিল। অবস্থাটা কতকটা এইরূপঃ—লেখবার সময় লিখলুম যথাসম্ভব খাঁটি সংস্কৃত, কিন্তু বাঙালী পড়বার সময় তাকে প'ড়বেন বাঙলা প্রতিশব্দ দিয়ে, মারহাট্টী পড়বেন মারহাট্টী প্রতিশব্দ দিয়ে, হিন্দুস্থানী প'ড়বেন হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়ে। শেষটা চেম্টা হ'ল খালি হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়ে পড়া সংস্কৃত হবে দেশভাষা; আর বাঙলায়, মারহাট্টা দেশে স্থানীয় ভাষা অনুসারে না প'ড়ে এই হিন্দী অনুসারে তাকে প'ড়তে হবে। এত বাঙাটে সাধারণ লোকের চলা অসম্ভব—এক প্রাচীন ভাষাকে খাড়া ক'রে তার দ্বারা কতকগুলি পৃথক পৃথক ভাষাকে গেঁথে রাখা এখন আর সম্ভব হ'চ্ছে না—সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে এই ভাষাগত পার্থক্য র'য়েই যাচ্ছে। দূর দূর প্রদেশের অধিবাসী চীনে বাধ্য হ'য়ে এই পার্থক্যকে মেনে নিচ্ছে, আর তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তার দরকার হ'লে, দু'পক্ষেরই “কান হ'ব” জানা না থাকলে অন্য যে-কোনো বিদেশী ভাষা জানা থাকে তাই ব্যবহার করে—যেমন ইংরাজী, মালায়, হিন্দুস্থানী। দক্ষিণ চীনের এক রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এই ভাষা-সঙ্কটে প'ড়ে উত্তর চীনের এক চীনা কলেজে ইংরাজিতে পড়াতে বাধ্য হ'য়েছিলেন শুনেছিলুম। এ হ'চ্ছে বাঙালী আর মারহাট্টীয় ইংরিজীতে আলাপের মতন। এই যাত্রায় আমাকে একবার দুই চীনের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ ক'রতে হ'য়েছিল। জাহাজ যখন পেনাঙে পৌঁছল, তখন ডেকযাত্রীদের বোট ক'রে কোয়ারাণ্টীনে নিয়ে গেল। ক'লকাতায় প্লেগ হয়, পাছে ক'লকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ডেকযাত্রী প্লেগের বীজাণু নিয়ে পেনাঙে নেমে অসুখটা ছড়িয়ে দেয়, সেই ভয়ে যাত্রীদের তিন দিন ধ'রে একটা আলাদা জায়গায় নিয়ে আটকে রেখে দেয়। যদি

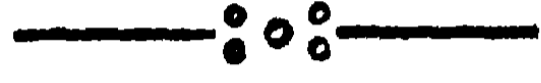
এই তিন দিনের মধ্যে কারু অন্থখবিস্থ জ্বরজাড়ী না হয়, তাহ'লে সকলকে ছেড়ে দেয়; অন্থথা প্লেগের আশঙ্কায় আরও লম্বা সময় আটক ক'রে রাখে। এখন পেনাঙে যখন জাহাজ দাঁড়াল, বন্দরের ডাক্তার এসে সর্ব ডেকযাত্রীকে সার দিয়ে দাঁড় করালে, তারপর এক এক ক'রে নাড়ী টিপে, জিভ দেখে, নিজের সামনে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল। তারপর তারা নিজের নিজের গাঁঠরী মালপত্র নিয়ে তৈরী হ'তে লাগল, কোয়ারান্টীনের নৌকায় চ'ড়বে ব'লে। সবাই নিজের মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত। শাঙ্‌হাইয়ের দুজন চীনে তখন কি ক'রবে সে বিষয়ে ঠিক ক'রতে না পেরে, হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্থ চীনেরা নিজের জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত, আর সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকলেও ভাষার অভাবে এরা কিছু ক'রতে পারলে না। এদের ভাষা কেউ জানে না, কেউ এদের দেখলেও না। কদিন জাহাজে ডেকপ্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমি অনেকের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছিলুম—প্রায় সকলের সঙ্গে মুখচেনা আলাপ হ'য়েছিল,—বুড়ো চীনে তার টোল-খাওয়া গাল, রেখাক্ষিত কপালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চোখ, আর বেশ লম্বা (যদিও সংখ্যায় অল্প ক'গাছি) দাড়িগোঁফওয়ালা সহাস্ত্র মুখে ঘাড় নেড়ে আমায় নীরব সস্তাষণ ক'রত। এমন কি তার ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তার সঙ্গে আমি কথাও দু' একটা ক'য়েছি, তাতে তার বৃত্তান্ত সামান্য কিছু জানতেও পেরেছি; আর আমার ভাষাতত্ত্বের কেতাবে পড়া দু' একটা চীনে বাক্যও তার উপর প্রয়োগ ক'রেছি—যেমন “নী-ম্যান্ যুঙ্ শাঙ্-হাই লাই—তোমরা শাঙ্‌হাই থেকে আসছ'?” আর “থিয়েন হাই হাও—আকাশ আর সমুদ্র পরিষ্কার”—এই গোলমালে সে আমার দিকে তাকালে। ব্যাপারটা কি হ'চ্ছে, জাহাজ বন্দরে লাগলে

যে আবার কোয়ার্টার্টীনের ঠাঙ্গামা হয়, সে সব আমার জানা ছিল না। এমন সময় জাহাজের এক চীনে কেরাণী সেখানে এল। সে আবার দক্ষিণ চীনের লোক, উভয়ের ভাষা জানে না। 'আমি' ইংরাজিতে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—এরা কি ক'রবে? যা যা ক'রতে হবে সে আমায় ব'লে দিলে, আমি তখন অতি কষ্টে হিন্দী ভাষার দ্বারা এদের বুঝিয়ে দিলুম।

জাহাজে অন্য লোক যাদের দেখেছিলুম, এই চীনেদের বাদে—তারানা জাতের ছিল। খালসারা বাঙালী মুসলমান প্রায় সবাই—দু চারটা অবাঙালী, খুব সম্ভব বিহারী ছিল। পাঞ্জাবী ছিল অনেক—শিখ আর মুসলমান; কতক ফৌজী লোক, কতক পুলিশে কাজ করে সিঙাপুরে, হঙ্কঙে, শাঙহাইয়ে,—বাকী সব দরওয়ানের কাজ করে ইন্দোচীনে। সিঙাপুরে তখন ব্রাহ্মণ সিপাহীর পল্টন ছিল, সেই পল্টনের জনকতক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সিপাইও ছিল। ভোজপুরী আর হিন্দুস্থানী আর কতকগুলি ছিল, এরা মালয় শ্যাম, ইন্দোচীন অঞ্চলে দরওয়ানের কাজ করে। সিন্ধী ব্যবসায়ী চার পাঁচ জন ছিল, এরা যবদ্বীপ আর সুমাত্রার যাত্রী—ঐ সব দেশে ছোটো বড় অনেক ব্যবসায় এরা হাতে নিয়েছে—চাল দাল আটার ব্যবসা অনেকে করে। জনকতক পাঠান, জন দুই আরব, জন দুই মালাইও ছিল। এদের সকলের কথা বারাম্বরে ব'লবো।

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কথা ও কাজ ।



মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার ধারাবাহিকতা ব্যাপারটা এতই মৌলিক এবং সনাতন যে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের ব্যাকরণসমূহেও ভাষার সংজ্ঞার কোন অভিনব সংস্করণের প্রয়োজন হয় নি। মানুষের মুখের কথা এবং হাতের কাজের ভিতরে কিন্তু এমনধারা কোনো সহজ পারস্পর্য্য সহসা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন যা কাজ, তার সম্পাদনে কথার আবশ্যিকতা হয়ত খুব বেশী নেই। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের জটিলতা মানুষের যতই বেড়েছে, কাজের আগে কথার ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে ততই অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। ডাল ভাত উদরস্থ করা যে এমন একটা অত্যন্ত সোজা কাজ, সেটি করবার আগেও শাস্ত্রমতে 'নিবেদন' অবশ্যকর্তব্য। আর বিবাহাদির মত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হবার পূর্বে যে উভয়পক্ষে লক্ষ কথার বিনিময়ের ব্যবস্থা—সে ত' আমাদের সকলেরই জানা কথা।

যেখানে কাজের আগে কথাবার্তা কিছুই হয় না, সেখানে কাজটা হয়ে পড়ে নিতান্তই দৈবাৎ। মানুষে সৃষ্টির আদিকাল থেকে নিজ নিজ অবিবেচনা আর অপরিণামদর্শিতা দেবতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তু হয়ে আসূছে। ফলে দৈবের সদর মফঃস্বল দু'পিঠই সমান অন্ধকার। দেববিজে তত্ত্ব যতই থাক, সংসারী মানুষ দৈবাতের পরে

ভবিষ্যতের বরাত দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে না। এটা একটা অতীত আটপৌরে সত্য কথা। যুগে যুগে অনেক শাস্ত্রের বিধি এবং ধর্মের অনুশাসনের ধোপ এর উপর দিয়ে গিয়েছে; কিন্তু এর পাকারং দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়েই উঠছে। মানুষের মনের সহজ অহমিকা তাকে দেবতার সমকক্ষ না হওয়া অবধি কিছুতেই দৈবের পরে একান্ত নির্ভরপরায়ণ হবার নতি স্বীকার করতে দেয় না। এটা হচ্ছে বিধির বিধি—মানুষের স্বভাব। ধর্মশাস্ত্রপাঠ বা বেদাধ্যয়নে এর পরিবর্তন অসম্ভব। এই কারণেই মানুষের সর্বপ্রকার ঐহিক অনুষ্ঠানের উপক্রমণিকা মন্ত্র না হয়ে, হয়েছে মন্ত্রণা।

কিন্তু মন্ত্রণা ব্যাপারটি যে বিশেষ করে একটা অসমাপিকাক্রিয়া, তা ওর আকারেই প্রকাশ। আমাদের দেশে বর্তমান যুগের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রে এর এই অসমাপিকা আকার এমন অসাধারণ দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে ভরসা হয় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সকল সমস্যার তাপ এই বিরাট মন্ত্রণার চন্দ্রাতপতলে চিরনির্ব্বাণ লাভ করবে। মুমূর্ষু দেহটিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে ঘটোৎকচ যদি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স-শরীরে স্বর্গে চলে' যেত, তাহলে ব্যাপারটা বাস্তবিক যা ঘটেছিল তার চেয়ে কিছুমাত্র কম আজগুবি নিশ্চয়ই হত না; কিন্তু তাতে কুরুপাণ্ডব কোনো পক্ষেরই কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তার বিরাট দেহের আকস্মিক পাতনেই শত্রু অক্ষৌহিনীর ধ্বংস সম্ভব হয়েছিল। মন্ত্রণাও যদি শুধু কথার জাল ক্রমাগত বুনে গিয়ে পরিশেষে আপনাতেই আপনি পরিসমাপ্তি লাভ করে, তাহলে যতই সুদীর্ঘ, সর্ববাদিসম্মত এবং বিস্ময়কর হোক না কেন, তা নিতান্তই কথার কথায় পরিণত হতে বাধ্য। উদ্দেশ্যকে সকল

দিক থেকে চাপ দিয়ে শৃঙ্খলিত করে' সাধ্যের গণ্ডীর ভিতরে আনাতেই মন্ত্রণার সার্থকতা। এ কথাটা যেন আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। সমবেতভাবে কোনো কাজের আশু প্রয়োজন হলেই, আমরা চারিদিক থেকে অজস্র মন্ত্রণার জাল বিস্তার করে' অচিরেই সেটাকে লোক-চক্ষুর অগোচর করে' ফেলি। তারপরে জাল গুটানোর সময় হ'লে সবাই অকুতোভয়ে নিজ নিজ কোলের দিকে টানি; এবং জাল নিংড়ে যা পাই, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ কথাসরিৎসাগর।

(২)

শ্রায়শাস্ত্রকারগণের মতে ধোঁয়া নাকি আগুনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। কিন্তু রান্নাঘরের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা সবাই জানেন যে, অনেক সময়ে ধোঁয়া বিশেষ করে আগুনের অভাবই জ্ঞানিয়ে দেয়। যে মন্ত্রণার পিছনে ঐকান্তিক কর্মপ্রেরণার ফুলিঙ্গ নেই, তা শুধু আমাদের কর্ম-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে মাত্র। এমনধারা নিরর্থক কথার মাত্রা যতই কমবে, আমাদের সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার উদ্বোধন ততই সহজ-সাধ্য হবে। কাজের প্রতি যতক্ষণ না প্রাণের টান আসবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কথা কাজের কথা হবে না; আর কাজের দায়িত্ব দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত না হলে, কাজটাকে উপলক্ষ্য করে' কল্পনার আকাশে রঙবেরঙের ঘুড়ি ওড়ানোই হবে আমাদের লক্ষ্য। অনেক অসাধ্য তখন আমরা সাধন করব। কথার তোড়ে নিচুগাছকে ছদ্মবেশী আমগাছ, আর আমগাছকেই প্রকৃতপক্ষে নিচুগাছ প্রমাণ করে দিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না। দরকার হলে দিনকে রাত, রাতকে দিন আমরা মুখের জোরে তখন

করব। এত করেও কিন্তু জমাখরচ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

আত্মারাম সরকারের হাড় ছুঁইয়ে বাজীকর ধুলোমুঠি নিয়ে টাকা বানিয়ে দেয়, একটা থেকে টেনে অনায়াসে দশটা বের করে—কিন্তু পরণের শতগ্রন্থি লুঙ্গি আর গায়ের শতছিদ্র জামা আর তার ঘোচে না। হাতের বদলে ক্রমাগত হাত-সাফাই দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমরা ঘরের অশাস্তি আর বাইরের অশ্রদ্ধাই দিন দিন বাড়িয়ে তুলছি। এতদিনে অস্তুতঃ এটা আমাদের বোধগম্য হওয়া উচিত যে—যে বিছায় রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া সম্ভব, কর্ম-জগতে তার স্থান নেই। এখানে তেল মাখবার আগেই কড়ি ফেলা চাই—আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সে কড়ির সংস্থান করতে হয়। লক্ষ্মীলাভের আশায় এ ক্ষেত্রে কোন পঞ্চম উপায়ের প্রয়োগ শুধু যে শাস্ত্রবহিত্বই হবে তা নয়, জাতীয় প্রকৃতির উপরে তার প্রতিক্রিয়াও অবশ্যস্বাভাবিক।

মামুদ ঘোরীর সিঁফু পার হবার বহু পূর্বেকার সেই সুদূর অতীত যুগের সমাজ, যার নিষ্ঠা এবং আদর্শের গৌরব এবং গর্ব আমরা আমাদের পুরুষ-পরম্পরাগত সহজ উত্তরাধিকারহিসাবে অঙ্গীকৃত করে' সময়ে অসময়ে পরম পুলক প্রকাশ করে' থাকি—সে সমাজে পুরুষকারই ছিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এবং এই কারণেই বোধহয় তখনকার মানুষের হাতের অস্ত্রের মত তাঁদের মুখের কথারও প্রত্যাহার ছিল না। কথার জন্ম তখন রাজ্যত্যাগ, পুত্রত্যাগ, সংসার ত্যাগ সম্ভব হত। আর এখন আমাদের আদর্শ হয়েছে—শতং বদ একং মা লিখ। আইন আদালতের ভয় না থাকলে আমরা মনে মনে যে আদর্শটিকে মেনে চলি, তাকে শাস্ত্রীয় আকার দিলে—শত শতং

বদ শতং লিখ, একং মা কুরু—এইরকমই হয়ত দাঁড়ায়। এই ‘মা কুরু’র বীজমন্ডেই আমাদের সমস্ত কথাকে সত্যমিথ্যানির্বিচারে নিরর্থক করে দিয়েছে। অর্জুনের রথের সামনে বসে’ অশ্বরশ্মি মাত্র হাতে, কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঝড়ঝাপটা বুক পেতে না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার যথারীতি আবৃত্তিতে অর্জুনকে মুগ্ধ করে’ রেখে, দারুককে ডেকে নিজের রথ আনিয়ে শিঙা ফুঁকে দ্বারকায় চলে যেতেন, তাহলে তাঁর সেই সারগর্ভ বক্তৃতাও অর্থহীন প্রলাপেই পর্যাবসিত হত। দ্বৈপায়ণ ঋষি কষ্ট করে সে গীতাভিনয় সঙ্কলিত এবং লিপিবদ্ধ করলেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে তাকে নিশ্চয়ই অভিহিত করতেন না।

আমরাও কৰ্ম্ম-জগতে বহুদিন ধরে গীতাভিনয়েরই চর্চা করে’ আসছি। যুদ্ধে বাক্পটুতা এবং সভায় বিক্রম প্রকাশ, এসবও ক্রমশঃ আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হয়ে আসছে। কথার মাত্রা হিসাবে মাঝে মাঝে আমাদের যে-সব অঙ্গসঞ্চালন, তাতে শুধু আমাদের কৰ্ম্মশক্তির নগ্ন দারিদ্র্যই ফুটে উঠছে। রবাহৃত হয়ে কাজ যতবারই আমাদের দুয়োরে এসেছে—অতৃপ্ত ফিরে গিয়েছে। অভিনয়ের আবেগে বহু আড়ম্বরে সর্বস্ব পণ করে’ দেবার বেলায় দিয়েছি আমরা শুধু তাকে আমাদের মাথার’পরের কৰ্ম্মবৈমুখ্যের বোঝাটিকে ঘুরিয়ে বসানোর ভার। সদাসতর্ক মন আমাদের কালের ইঙ্গিতে অনিশ্চিত কল্যাণের দিকে পানা বাড়িয়ে, সমধিক আগ্রহে সুপ্রতিষ্ঠিত জড়তাকেই ঝাঁকুড়ে ধরে আছে প্রাণপণে। এই জাগ্রত আবিষ্কৃত্যের ফলে জাতীয় বা সামাজিক যত কিছু আমাদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, সবই হয়েছে মৃত-জাত বা জীবন্মৃত।

(৩)

কর্মপরিচয়ে আমাদের এই যে অচল অধম দশা, এটাকে ঘর এবং পরের কাছ থেকে সর্বতোভাবে প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্মেই আমরা যখন-তখন মুখে মুখে মোহমুদগর পরিচালনা করে থাকি। কিন্তু এতে করে আমাদের মুখ ব্যথা হওয়া ছাড়া আর কোনই ফল হয় না। জাতিকে তার নিজস্ব প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে কর্মপ্রেরণা, সমাজকে আমাদের আদর্শের দিকে উন্মুখ করে তুলতে যে আন্তরিকতা নইলে নয়—তার সন্ধান যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজেদের ভিতরে না পাব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সব কথা এবং কাজই মিথ্যা বৃথা ছলনা মাত্র হবে। রূপহীন যে, সে মুখে চুণ ঘস্লেও লোকে হাসবে, কালি মাখলেও কেউ মুগ্ধ হবে না। ও উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসই আমাদের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। আর সেই ত্যাগই হবে আমাদের মুক্তিপথের প্রথম সোপান।

শুদ্ধমাত্র পুঁথিগত বিচার অভিমানবশেই আমরা মনে করি আমরা আমাদের সমাজকে এবং জাতিকে চিনি ও জানি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—কর্ম ছাড়া জ্ঞান-লাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, যেখানে সামাজিক বাঁধন অত্যন্ত শিথিল বলে' আমাদের অনেকের ধারণা—সেখানে সামাজিক হিত-সাধনের জন্তু অসংখ্য কর্মসংঘ নানা দিকে নানা কাজে সদাই ব্যস্ত। এন্নি করে' কাজের ভিতর দিয়েই সে-সব দেশে সমাজের সর্ববস্তুরের ভিতরে জানাশোনা, সহানুভূতি এবং প্রাণের পরিচয় ঘটে। আর আমাদের দেশে ? . . .

অতীত যুগে যখন অনন্যসম্মতার প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ুপরিমাণও দিন দিন ক্ষীণ এবং ক্ষীণতর হতে শুরু হল, খুব সম্ভব

তখনই আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রাকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে বাধ্য হয়ে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত অর্ধেক হচ্ছে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ঐ দুই আশ্রমের কাজই ছিল স্ততঃ পরতঃ সমাজের হিতসাধন—নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের সামাজিক জীবনে তখন ভাঁটা পড়ে এসেছে। যাকে কালোপযোগী আকার দিয়ে, গার্হস্থ্য সংস্করণে পরিণত করে', সমাজের অঙ্গীভূত করে' ধরে রাখা উচিত ছিল, আমরা তাকে নির্বিবশদে বিদায় দিয়েছি। সেই থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বিধিব্যবস্থা আমাদের সমাজ শাস্ত্রে নেই-ই, বরং পরের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়ানোর প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে ঢুকেছে।

আমাদের মনের অভিধানে 'সমাজ' 'জাতি' এ সব শব্দের অর্থের ঠিক সেইধরনের আকৃতি এবং বিকৃতি ঘটেছে, যে ধরনের বিকৃতির ফলে আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় পরিবার মানে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী। সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাবের ফলেই আমাদের ভিতরে এ সব সঙ্কীর্ণতা এসেছে। কথার ফুৎকারে এ অপসারিত হবার নয়। 'সমাজ' এবং 'জাতি'র বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ এবং জাতি রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের শুধু কর্মের ভিতর দিয়েই হওয়া সম্ভব। আর সে পরিচয় সংসামিত হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে অন্তর্হিত হবে। কারণ সমাজের পিঠে গুরুগরি ফলানোর প্রবৃত্তি, অথবা সমাজের পক্ষে শুকালতি করবার উৎসাহ, এ দুইই তখন নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। তখন সমাজ হবে সজীব—আমাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেও স্বরূপে ফুটে উঠবে

স্বতঃই। তখন আমাদের সমাজ হবে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ভালোমন্দের সম্মিলিত নিদর্শন।

এখন আমরা সমাজের ভিতরে থেকেও সমাজছাড়া; জাতি হয়েও জাতিহীন। সমাজের সঙ্গে সহজ সরল সহানুভূতি এবং নিত্য অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করবার মত কর্মপ্রবণতা সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ্যে বিরল। এর ফলে যখনই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রার বিরোধ ঘটে, তখনই হয় আমরা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নানাপ্রকার প্রলাপের প্রলেপ দিয়ে বিরোধের ব্যথা চেপে রাখি, নয় ত বিদ্রোহ করি—সমাজকে হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে আমরাও গিয়ে হোটোলে ঢুকি।

নিজের জিনিষের প্রতি মানুষের একটা সহজ অধিকারের আনন্দ বা দায়িত্ববোধ—একটা মমতা থাকেই। কিন্তু এ মনোভাবের সম্যক বিকাশ নিশ্চয়ই চর্চাসাপেক্ষ। আমাদের সমাজের প্রতি যে আমাদের মমতাবোধ, সেটাও খুব সম্ভব চর্চার অভাবে আমাদের মনোবৃত্তির ভিতরে সম্যক পরিণতি লাভের সুযোগ পায় না। এই কারণেই সমাজের ভালোমন্দের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকটা উদাসীন। সামাজিক কোনো অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত আমাদের গা-ঘেঁসে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অত্যন্তই নির্লিপ্তধরণের হয়ে থাকে। তাতে আমাদের সংবুদ্ধির পরিচয় যতই থাক, সমবেদনার ছাপ প্রায়ই থাকে না।

কিছুদিন আগে স্নেহলতার আত্মাহুতিতে আমরা অত্যন্ত বিচলিত

হয়ে পড়েছিলাম। গড়ে পড়ে অনেক লেখালিখি হয়েছিল, সভাসমিতিও হয়েছিল বিস্তর। এবং তাতে দেখা গিয়েছিল গণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই আমরা শতমুখ এবং সবাই আমরা একমত। কিন্তু একমত হয়ে আমরা করেছি কি? নূতনত্ব চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে ও-সব ব্যাপারকে একটী নতুনতর ছুরারোগ্য স্ত্রীরোগের দলভুক্ত করে' দিয়ে, আমরা নিশ্চিত হয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছি। এন্নি ধারা কৰ্ম-বিমুখতার দরুণ আমরা ক্রমশঃ নিজেদের কাছেই নিজেরা ঝুঁটা বনে' গিয়েছি। আমাদের তথাকথিত ভাবপ্রবণতা, বাক্-প্রবণতার ভিতর দিয়ে গিয়ে ক্রমে হুজুগ্‌প্রিয়তায় পরিণত হয়েছে।

(৪)

আমাদের কথার সঙ্গে বাজের অসহযোগ এবং বৈসাদৃশ্য যে কত বেশী, তা আমাদের কথা-সাহিত্যের সঙ্গে কৰ্ম-সংহিতার তুলনা করলেই ফুটে উঠবে। মুখে মুখে আমরা ললিতা সূচরিতা দস্তা পরিণীতার চর্কিতচর্কণ করি, আর কাজের বেলায় নিজের ঘরের খুকী দশ বছরে পা দিতে না দিতেই আমাদের আহার কমে যায়, নিদ্রা ঘুচে যায়— আমরা তাকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টায় প্রাণপণ করি। যে পরিমাণ চেষ্টা আমরা বাধ্য হয়ে 'কণ্ঠাদায়' হ'তে মুক্তি পাবার প্রয়াসে ব্যক্তি-গত ভাবে করে থাকি, তার সিকির সিকিও যদি আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমবেত ভাবে 'বরপণে'র উৎপীড়ন থেকে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টায় ব্যয় করতাম, তাহলে সমাজের অনেক সমস্যার উপরেই হয়ত মীমাংসার আলো এসে পড়ত। কিন্তু তা'ত হবার নয়। ললিতা সূচরিতা ওঁরা কথা-সাহিত্যের পটেই আঁকা থাকবেন—কাজের :বেলায় 'গৌরীদান'ই হবে আমাদের লক্ষ্য।

সব বিষয়েই ঐ এক কথা। আমাদের জীবনের, সমাজের যে সব সম্ভাবনাকে সাহিত্যপ্রতিভা আকার দিয়েছে, আমরা সেগুলোকে অনায়াসে অবলীলাক্রমে কল্পলোকে অন্তরিত করে' সেখানেই তাদের যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেছি। কথাসাহিত্য আমাদের কাছে উপকথায় রূপান্তরিত হয়ে শুদ্ধ অবসরবিনোদনের উপাদানেই পরিণত হয়েছে। তার ইঙ্গিত এবং প্রেরণা আমাদের মৌতাতের খোরাক যোগায় মাত্র—কর্মের উদ্দীপনা ভুলেও জাগায় না। “ম্যাটসৌনিলীলা” চিরদিনই আমাদের কাছে “সরেস” থেকে যায়।

সমালোচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শোনা যায়, আমাদের কথা-সাহিত্য নাকি ক্রমশঃই অ-জাতীয় হয়ে উঠছে। এ অভিযোগের মূলে অনেকখানি সত্য আছে। যে সমাজে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র, গোষ্ঠি, আরো কত কি, এবং সর্বশেষে কোষ্ঠির মিলামিল যোগাযোগ না হ'লে স্ত্রী-পুরুষের মিলন অসম্ভব বা অবিধি, সেখানে জাতীয় ধারায় কথা-সাহিত্যের প্রসার যে অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার, সে কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু যথাবিধি ঘটকের মুখে নায়িকার রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি এবং ঘরবাড়ী সব জেনেশুনে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা উপন্যাসের নায়ক হিসাবে কি যে করতে পারি, তা'ত কবি-গুণাকর সবিস্তারেই লিখেছেন। ও-দিকে আমাদের সামাজিক জীবন এমন বৈচিত্র্যহীন যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আমাদের সাহিত্য অন্য কোনো দোষাশ্রিত না হলেও পুনঃপুনঃ পুনরুক্তি দোষে দুর্ঘট হবেই।

আসল কথা, আমাদের জাতীয়-জীবন খুব সম্ভব এখনও সৃষ্টির অপেক্ষা করে' রয়েছে। যা আছে সেটা হচ্ছে জাতীয় জড়তা।

অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত জাতীয়তার দোহাই ব্যাপারটা আমাদের প্রকৃতিগত জড়তার ওজর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্যের রস-সংগ্রহে আমরা আরব, পারস্য থেকে শুরু করে' সুদূর নর্ওয়ে, সুইডেন পর্যন্ত সর্বত্র যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজ দেহে সাহিত্যের রসায়ণের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা সদাই সঙ্কস্ত। অনুপানে আমাদের বিশেষ আপত্তি নেই, বরং যথেষ্ট আগ্রহই আছে; কিন্তু ওষুধ আমাদের ধাতে কিছুতেই সইবে না। এ আমরা আগে থেকেই জেনে বসে' রয়েছি। এ সর্বজ্ঞতার মূলে কিন্তু বিন্দুমাত্রও কৃতকর্মের অস্তিত্ব নাই—আছে শুধু আমাদের বহু যুগের জেরটানা জড়তা।

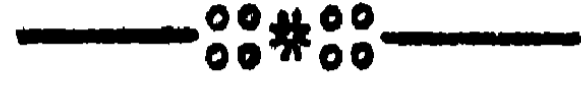
এমনধারা সর্বজ্ঞতার সতর্কতা কর্মজগতে আমাদের সর্বতোমুখী জড়তারই অন্যতর উপসর্গ। প্রকৃতির রাজ্য যে এমন অচঞ্চল নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা—সেখানেও ত অতিরৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অমন কত শতই হচ্ছে। সে-সব যদি প্রাকৃতিক মহানিয়মের ব্যতিক্রম না হয়ে অসম্ভব এবং অনুবর্ত্তাই হয়, তবে কর্মের পথে আমাদের যে সব ভুল-ভ্রান্তি, স্থলন-পতন, ক্রটি-বিচ্যুতি, সে সবও আমাদের সাথে সাথী বলেই মেনে নিতে হবে। ভগীরথের যে এত স্তবস্ততি, এত সাধ্য-সাধনা, এত পুণ্যের জোর,—তবুও ত স্বর্গমন্দাকিনী সগর-বংশের ভ্রম্মাবশেষের উপর সরাসরি এসে নামেন নি; অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, অসংখ্য বাঁক ঘুরিয়ে, বহু ফাঁড়া কাটিয়েই তাঁকে আনতে হয়েছিল।

আমাদেরও কর্মের ভিতর দিয়ে বোঝাপড়া করতে করতেই জাতীয় ভবিতব্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কর্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত বাকপ্রবণতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে

সন্দেহ নেই; কিন্তু তখনই আমরা আমাদের ভিতরে প্রকৃত আন্তরিকতার সন্ধান পাব। আজ যে-কথা আমাদের ভালো লাগে, তখন তা আমাদের ভালো করবে। আন্তরিকতার আলোতে কথার হাওয়া থেকে তখনই আমরা গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারব। শুদ্ধ তখনই আমাদের মন, আমাদের আশা, আমাদের কাজ, আমাদের ভাষা, ভগবানের বরে সত্য হয়ে উঠবে।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

বাঙ্গালীর কবিত্ব ।



কবিতার স্বরূপ নির্দেশ করিতে যাইয়া ইউরোপের জনৈক মনীষী বলিতেছেন যে, কবিতা চিন্তাবেগের রাগে রঞ্জিত চিন্তা । অবশ্য কবিতার এই ব্যাখ্যাটি যে খুব সূক্ষ্ম বা গভীর, তাহা আমি মনে করি না । তবে আপাততঃ এটি গ্রহণ করিতেছি এবং এই কথা দিয়াই আমার আলোচনা শুরু করিতেছি এই জন্য যে, তাহাতে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে । কারণ আমি বলিতে চাই, বাংলার কাব্যে চিন্তাসম্পদের বড় মহিমা নাই, সেখানে যাহা আছে তাহা চিন্তাবেগের প্রাচুর্য—বাংলার নিজের এক কবির কথায়, “প্রাণেরই প্রচুর স্পন্দন রে” । ফলতঃ, যদি বলা যায় বাংলা কবিতা মূর্ত্ত ভাবমত্ততা বা ভাবোন্মত্ততা, তবে বিশেষ অন্যায় হইবে না—কথাটা কেবল দোষের হিসাবে আমি বলিতেছি না, গুণের হিসাবেও বলিতেছি । বাংলার কাব্যসৃষ্টির আসল গোড়াপত্তন হইয়াছে ভক্তদের—প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ভক্তদের হাতে । পদাবলীর সুরই বাংলার কবিতার প্রধান সুর । বাঙ্গালীর আদি কবি চণ্ডীদাস যে তান দিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূচ্ছনা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর কাব্যজগতে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বাংলার কীর্ত্তন, বাংলার বাউল যে বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সম্পদ, তাহাও বাঙ্গালীর রসানুভবের ও রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটিকেই ধরিয়া দেখাইতেছে । সে বৈশিষ্ট্য কি ? না

প্রাণের উদ্বেগ উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের তীব্র ভাবালুতা, সুকুমার মর্মের কেমন অন্ধ একাগ্র তন্ময়তা।

এমন জিনিষটি পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। আমার চোখে ত পড়ে না, নির্জলা ভাবাবেগ দিয়া কোথায় এমন একটা কাব্যজগতই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে মেনান্দের (Menander) ও লাতিন সাহিত্যে কাতুল্ল (Catullus) ছিলেন; ফরাসীর রঁসার (Ronsard), জার্মানীর হায়েন (Heine) ও ইংরাজের বর্নস্ (Burns) বা কিয়ৎপরিমাণে শেলীর (Shelley) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই খুব তীব্র একটা ভাবোল্লাস বা lyric enthusiasm ছিল, সন্দেহ নাই। ইঁহারা ছাড়া আরও অনেকানেক কবির মধ্যে যে এই জিনিষটি অল্পবিস্তর পাওয়া যায় না, এমনও নয়; কিন্তু মোটের উপরে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখি এই ভাবোল্লাসকে শৃঙ্খলিত সুসংহত সুধীম করিয়া রাখিয়াছে আর একটা বৃত্তি, একটা চিন্তাশীলতার সবল রেখা—সে চিন্তা অবশ্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত তর্কবুদ্ধিজাত নাও হইতে পারে, তাহা হয়ত হৃদয়াবেগের স্পর্শে জাগরিত আন্দোলিত আর এক ধরনের জ্ঞানভূমি; তবুও তাহাতে পাই একটা সজাগ সমর্থ বুদ্ধিরই আভাস, মনে হয় হৃদয়াবেগ সেখানে মস্তিষ্কেরই একটা উর্দ্ধতর প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ রূপান্তরিত হইয়া সূঠাম অর্থপূর্ণ স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রেরণা যেন হৃদয়ের প্রাণের স্তরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, এই স্তরে আবদ্ধ থাকিয়া শুধু এই স্তরেরই গভীরতর অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; মস্তিষ্কের অন্বেষণ ও অন্য় তাহাতে কিছু

নাই, তাহাতে আছে একান্ত চিত্তাবেগেরই অস্বীক্ষা ও অস্বয় । তাই বাঙ্গালীর কবিত্ব যেন শ্রোতের মত কোমল, তরল, নিত্যগতিময় ; কোন মুহূর্তে কোনরকম কাঠিন্য বা স্ফূর্ত্য সে লাভ করে নাই ।

শেখস্পীরের এই গীতিকবিতাটি আমাদের সকলেরই হয়ত জানা আছে—

Take, Oh ! take those lips away,
 That so sweetly were forsworn,
 And those eyes, the break of day,
 Lights that do mislead the morn :
 But my kisses bring again,
 Bring again—
 Seals of love, but seal'd in vain,
 Seal'd in vain !

ইংরাজী সাহিত্যে এটি sheer lyricism-এর পরাকাষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু এখানেও ভাবমত্ততার সাথে সাথে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া নাই কি, মস্তিষ্কের মধ্যে পৃথক একটা চিন্তারও আন্দোলন, এলিজাবেথীয় যুগের নিজস্ব একটা কারুকল্পনার লাস্ত ? অথবা শেলীর এই মর্মোচ্ছ্বাস—

I fear thy kisses, gentle maiden,
 Thou needest not fear mine !
 My spirit is too deeply laden
 Ever to burthen thine.

এখানে অনুভব হয় যেন সকল চিন্তাবৃত্তি মস্তিষ্কের গতি এক প্রকার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও, শুনুন এবার একটু আমাদের বৈষ্ণব কবিদের বাণী—

বঁধুয়া ! কি আর বলিব আমি ।

জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥

অথবা,

সখিরে ! কি পুছসি অনুভব মোয় ।

সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে

তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥

এখানে আমরা একেবারে হৃদয়ের রসের কূপে ডুবিয়া গিয়াছি, এখানে যে আবেগে আচ্ছন্ন আমরা, তাহাতে জ্ঞানবুদ্ধির কোন রশ্মির এতটুকু প্রবেশপথ নাই, মর্মেের কোন নিগূঢ় একতায় এখানে ঝঙ্কার দিতেছে মর্মেেরই আদিম সুরটি, এখানে শুনি শুধু হৃদপিণ্ডেরই তালে তালে মন্দ্রিত এক অনাহত নাদব্রহ্ম।

ইহাই বাঙ্গালীর কবিত্বের বনিয়াদ, আর ইহাই যেন চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছে বাঙ্গালীর কবিত্বের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম। আধুনিক বাংলার কবি-চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথও মূলতঃ এই বৈষ্ণবভক্তদিগেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব—এবং হয়ত অনেকখানি তাঁহারই কল্যাণে আধুনিক বাংলারও বিশেষত্ব এইখানে যে, পূর্বতন কবিদের স্বভাবসিদ্ধ একমুখী চিন্তাবেগ এখন বহুবিধ চিন্তার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বিচিত্র ও প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সত্ত্বেও, আধুনিক কালধর্মেের প্রভাব সত্ত্বেও, বাংলার চিন্তা ও চিত্ত

মিলিয়া মিশিয়া এখনও সে নিবিড় রসায়ন তৈয়ার করিতে পারে নাই, যাহা কাব্যের কবিত্ব; এখনও যেন মনে হয় ঐ দুইটি বস্তু তেল ও জলের মত বাঙ্গালীর কাব্যে পাশাপাশি থাকিয়াও আলাদাই রহিয়া গিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সে অঙ্গঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই। বঙ্গীয় কবির চিত্ত চিন্তার ক্ষেত্রে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে হয়ত চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; প্রাণকে জ্ঞানের মধ্যে উঠাইয়া কি প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া ধরিতে হয়, সে রহস্যের সন্ধান বাংলার কবিপ্রতিভা এখনও পায় নাই। আর দ্বিতীয় পথ যে, চিন্তাকে চিন্তের স্তরে নামাইয়া আনা, চিন্তের খোরাকরূপে ধরিয়া দেওয়া— তাহা কথঞ্চিৎ বাঙ্গালীর স্ভাব ও স্বধর্মের অনুকূল হইলেও, সেখানেও সম্যক সিদ্ধিলাভ সে করে নাই। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় বাঙ্গালী কবি যাহা করিতেছে তাহা প্রধানত চিন্তাকে আবেগের রঙে একটু রঙীণ করিয়া ধরা, মস্তিষ্কে একটা প্রাণের বাহ্য আবরণ পরাইয়া দেওয়া, অথবা আবেগস্রোতের মধ্যে বিসদৃশ চিন্তারাজি ছড়াইয়া দেওয়া।

বাঙ্গালীর কাব্যে তাই দেখি দুই দিক হইতে দুইরকমের অকবিত্বের ছায়া বা রসভঙ্গের দোষ স্পর্শ করিয়াছে। এক, যখন একান্ত ভাবাবেগে সে চলিয়াছে বটে কিন্তু ভাবস্থির হইতে পারে নাই, তখন গভীরে যাইতে না পারিয়া উপরের ভাসা ভাসা চাঞ্চল্যে সে উদ্বেগ উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কাব্য হইয়া পড়িয়াছে কেবল বাগাড়ম্বর (Rhetorical); আর যখন সে তাহার সৃষ্টিতে চিন্তাবস্তু কিছু দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতিশাস্ত্র (Didactic)। বাঙ্গালীর কবিত্ব বেশীর ভাগ—বিশেষতঃ আধুনিক যুগে—দেখি এই দুই প্রান্তের দুই অতিমাত্রার মধ্যে দোল খাইয়া

চলিয়াছে। তবে এই উভয় ভঙ্গীরই মূলে রহিয়াছে বোধহয় এক জিনিষ—চিন্তাকে কাব্যরসে ভিজাইবার, পরিপাক করিবার অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্যকেই পূরণ করিয়া লইবার ব্যস্ততায় পড়িয়া বাঙ্গালী কবি হয় একদিকে চিন্তাকে ঠেলিয়া রাখিয়া কপট অন্তঃসারশূণ্য আবেগে কেবল শব্দজাল তৈয়ার করিয়াছে, নতুবা অন্যদিকে মস্তিষ্কে অত্যধিক খাটাইয়া চিন্তাকে ফলাইতে গিয়া শুধু তত্ত্ব-কথা শুনাইয়াছে।

বাঙ্গালীর কবিত্ব সার্থক হইয়াছে তখনই, যখন চিন্তার বা মস্তিষ্কের কথা তাহার আদৌ মনে পড়ে নাই, সেদিকে কোন লুক্ক-দৃষ্টি দেয় নাই বা কষ্টপ্রয়াস করে নাই; পরন্তু সহজ অনুভবের একান্ত আবেগে চলিয়া যখন সে সৃষ্টি করিয়াছে ভাবময়, ভাববিগলিত চিন্তা (vital thoughts)—বৈদিক ঋষির ভাষায় যাহার নাম মরুৎ-বাহিনী—যতক্ষণ তাহার চিন্তা চিন্তাবেগেরই শ্রবণ এবং উৎসেচন। এই ভাবুকতা যতক্ষণ আপন গণ্ডী পার হইয়া যায় নাই, চলিয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ খাতে, একটা বিশেষ অনুভবের ধারায়—তদবধি সেই সঙ্কীর্ণতার তীর তন্ময়তার জোরেই তাহা পাইয়াছে একটা নিবিড় গভীরতা, একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে এই যে উচ্ছ্বাস—

বদন থাকিতে না পারি বলিতে

তেত্রিঃ সে অবলা নাম—

এই অন্ধ ভাবমুক্ততা চিন্তাবৃত্তির কাছেকিনারায় দ্বিয়াও যায় নাই, তর্কবুদ্ধির সকল ব্যাকরণ একটা দুর্ব্বার আবেগে হেলায় ভাসাইয়া দিয়াছে; অথচ কি এক একাগ্র তীব্রতার তীক্ষ্ণতার ফলে দেখি সে

অনুভব কেমন প্রায় চক্ষুস্থান জ্ঞানভাস্বরই হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানের আছে একটা উপলক্ষি। জ্ঞানের আছে সাক্ষাৎ দৃষ্টি, আর ভাবের আছে সাক্ষাৎ স্পর্শ—উভয়ই অপরোক্ষ উপলক্ষি। বঙ্গীয় কবির মধ্যে ঋষির উজ্জ্বল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি তেমন নাই, আছে ভাবুকের ও মরমীর অপরোক্ষ স্পর্শালুতা।

কবিত্বের এই যে দুইটি উৎস, ইহাদিগকে ধরিয়া দুই প্রকারের কবিতা সৃষ্ট হইয়াছে। কবিতায় আমরা যাহাকে বলিলাম এক জ্ঞানের ধারা আর এক ভাবের ধারা, ইংরাজ-কবি কোলরিজ্ (Coleridge) তাহারই নাম দিয়াছিলেন masculine ও feminine poetry—পুরুষালী ও মেয়েলী কবিতা। আধুনিক যুগে প্রায় সর্বত্রই দ্বিতীয় রীতিটিরই প্রাচুর্য দেখি বেশী। যাহাকে আজকাল আমরা বলি মিস্টিক কবিতা তাহা ইহারই রকম ফের। যাহা হউক, নিছক প্রথম ধারার যে কবিতা—অর্থাৎ যে কবিতার রস ভাবলাশ্বে নয় কিন্তু চিন্তাসামর্থ্যে, মাধুর্যে ততখানি নয়, যতখানি শক্তির ব্যঞ্জনা,—তাহার সহিত তুলনা করিলে বঙ্গীয় কবিতার বিশেষত্বটি আরও স্পষ্ট হইবে। পাশ্চাত্যের গোটে বা সোফোক্লিস্ কিম্বা প্রাচ্যের মহাভারতকার বেদব্যাসের সৃষ্টিতে (বা তামিলখণ্ডের তিরুবল্লুবরের মধ্যে) পাই যে অর্থগৌরব, যে তপঃপ্রভা, যে একটা কাঠিন্য, তাহা বাংলার নরম মাটিতে ভিজা হাওয়ায় বিকশিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনে যে একটা সংহত প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, অথবা বিবেকানন্দের দুই চারিটি কবিতায় যে সবল মস্তিষ্কের কিছু আভাস পাইয়াছিলাম, তাহা বাঙ্গালীর কাব্যপ্রতিভায় আপনার বস্তু হইয়া উঠিল কি? বাঙ্গালীর যতটুকু ছাঁকা কবিত্ব, তাহা ফুটিয়াছে

কেবল বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব-ভাবের কবিতায়। * বাঙ্গালী কবি তাহার এই সঙ্কীর্ণ রসাল-চিত্তকে যখনই উদার ও বহুমুখী করিয়া ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছে, অথবা তাহাতে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছে চিন্তা-জগতের বৈচিত্র্য, তখনই তাহার কাব্য দেখি বেশীর ভাগ হইয়া পড়িয়াছে পটু--তরল বা উচ্ছল বিবৃতি, নাই যাহাতে ইন্দ্রজাল, নাই যাহাতে কবি কীটসের সেই "magic casements"-এর কোন আভাস।

বাঙ্গালীর কাব্যে এই যে বৈষ্ণব-সুরের কথা আমরা বলিলাম, একটু বৃহত্তর অর্থে তাহাই গীতিকাব্যের সুর। ফলতঃ, বাঙ্গালীর চারুসাহিত্য বিশেষভাবে গীতিকাব্যেরই সাহিত্য, এরূপ বলা অত্যাুক্তি নয়। বৃহৎ বিচিত্র আয়ত্তন লইয়া একটা সৃষ্টি, স্থাপত্যের বিশাল জটিল সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে যে দুর্লভ, তাহারও কারণ ঠিক এইখানে। আমাদের দেশে নাটকের যে একান্ত অভাব, তাহা আজকাল সকলেই একরকম স্বীকার করিতে প্রস্তুত। উপন্যাসেরও অভাব বড় কম নয়। আমি অবশ্য বলিতেছি নাটকের মত নাটক, উপন্যাসের মত উপন্যাসের কথা, শেক্সপীয়ার ও বাল্‌জাকের সৃষ্টির মত সৃষ্টি। বাঙ্গালীর নাটক যাহা আছে, উপন্যাস যাহা আছে, তাহা তখনই এবং ততটুকুই সত্য ও সুন্দর হইয়াছে, যখন ও যতটুকু তাহা গীতিকাব্যের প্রেরণায় চলিয়াছে। বাঙ্গালীর বৃহত্তর কাব্য সম্বন্ধেও

* বৈষ্ণব-ধারা ব্যতীত বাঙ্গালীর কাব্যে আছে অবশ্য শাক্ত-ধারা—কিন্তু এই পার্থক্য প্রধানতঃ বিষয়গত, উভয়ের ভঙ্গী বা মূলসুর একই। শাক্তের ভক্তি ও বৈষ্ণবের প্রেম, দুইয়েরই উৎস অভিন্ন—তাহা বৈষ্ণবী ভাব বলিলে অন্যায় হয় না।

এই কথা খাটে। ইদানীন্তন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমী যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, ইহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা কতদূর প্রযোজ্য, তাহাও দেখিবার বিষয়।

বাঙ্গালী বিশেষভাবে ভক্তিমার্গের সাধক, জ্ঞানপন্থী সে সহজে হইতে চাহে না বা পারে না। ভক্তি-সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভাকে সঙ্কীর্ণ ও তীব্র করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশাল ও বিচিত্র করিতে পারে নাই। বিশালতা ও বৈচিত্র্য জ্ঞানের দান। ভাবাবেগ বা অনুভবের ধর্ম এই যে, একসঙ্গে সে বহুদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না—পতঞ্জলির কথায়, এক সময়ে চোভয়ানবধারণম, এক সময়ে তাহার দুইটি জিনিষের উপর অভিনিবেশ হয় না। এ কাজটি জ্ঞানের কাজ, বুদ্ধির কাজ। মস্তিষ্কই সেই কেন্দ্র, যাহা একসূত্রে বহুল বিচিত্র অনুভবকে সংগ্রথিত করিয়া রাখে। বুদ্ধিশক্তি, চিন্তা-শীলতা সহজেই আনিয়া দেয় একটা শাস্ত উদাসীনতা, উদার অপক্ষ-পাতিতা, একটা দ্রষ্টার ভাব,—যাহার কল্যাণে পুরুষ একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী বস্তুরাজির উপর একসঙ্গে সমান মনঃসংযোগ করিতে পারে। ঠিক এই বৃত্তিটির উপর বাঙ্গালী কবির তেমন অধিকার নাই বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে বৃহত্তর কাব্য, নাটক, উপন্যাস গড়িয়া উঠিতেছে না। এই সকল সৃষ্টির জন্ম প্রয়োজন বহুতর ও বিবিধ দেশ কাল ও পাত্রের সহিত সমান পরিচয় ও সহানুভূতি, নানাবিধ ভাবধারাকে, তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া,—শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নয়, সুস্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিয়া,—একটা বৃহৎ দৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা। আর সে ক্ষমতা আছে সচল মস্তিষ্কের,—বাঙ্গালীর স্বাভাবিক একরোখা ভাব-বিহ্বলতা সে ক্ষমতার অঙ্গরায়।

সচল মস্তিষ্কের রাসায়নিক প্রতিভা কি বাঙ্গালী কবি অর্জন করিতে পারিবে না? এই প্রতিভা কি তাহার প্রকৃতির মধ্যে, অস্তুতঃ সুপ্ত চেতনায় কোথাও নাই? বাঙ্গালী ভক্তিমার্গী, জ্ঞানমার্গী নয়, তাহা আমি বলিয়াছি। বাঙ্গলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যেরই আবির্ভাব হইয়াছে, শঙ্করের আবির্ভাব হয় নাই। সত্য কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? ধর্ম-সাধনায় এই যুগল প্রতিভা যে অভিনব সুর বাঙ্গালীর চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, কাব্য-সাধনাতেও তাহারই অনুরূপ সুর একটা প্রকট হইয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

* প্রবন্ধটি পড়িয়া একটা ধারণা হইতে পারে যে, আমি বুঝি বলিতেছি বাঙ্গালীর চিন্তা বা বুদ্ধি-স্থানে একেবারে শূন্য। তাই এই কথাটি এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার বক্তব্য বিশেষভাবে কেবল কাব্য-সৃষ্টি লইয়া। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক বা চিন্তাবৃত্তি যে কোথায় খেলিয়াছে, তাহা কি ধরণের ও কি দরের, সে কথা বারান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে আমি বলিতে চেষ্টা করিব।

গাছ ।

—*—

গাছের বুদ্ধি ।— গাছের যে প্রাণ আছে তা আগেই বলেছি—কিন্তু বুদ্ধি আছে কিনা ? বুদ্ধি টের পাওয়া যায় কাজে । গাছে যে সব কাজ করে, তা বুদ্ধির কাজ কি না ?

চুম্বক লোহাকে টানে, কিন্তু তাতে চুম্বকের কোনই লাভ নেই—কাজেই লোহাকে টানা চুম্বকের বুদ্ধির কাজ নয় ; চুম্বকের বুদ্ধি নেই । কিন্তু পিঁপড়ে যে ভাত টেনে নিয়ে যায়, তাতে পিঁপড়ের লাভ আছে । ভাত টেনে নিয়ে যাওয়া পিঁপড়ের বুদ্ধির কাজ ; পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে ।

গাছ যে সব কাজ করে, তা কিসের মত ? চুম্বকের লোহা টানবার মত, না পিঁপড়ের ভাত টেনে নিয়ে যাবার মত ?

এর উত্তর তোমরাই দিতে পারবে, যদি গাছের মোটা মোটা ছ'চারটে কাজ নজর করে দেখ । কেবল এইটুকু জানা দরকার যে, কিসে গাছের ভালো হয়—কি কি মতলব তার থাকতে পারে ।

গাছের যদি কোন মতলব থাকে ত তার আসল মতলব দুটো—বেঁচে থাকা আর বংশ বাড়ানো । এ দুটো মতলব আমাদেরও আছে । কিন্তু এ মতলব দুটো হাসিল করবার জন্মে তার যে হাজার হাজার ছোটোখাটো মতলব থাকতে পারে—যেমন মাটির রস টানা, পাতাখেকো জন্তুদের তাড়ানো—তার সঙ্গে আমাদের কোন মতলব মেলেনা ।

গাছের বুদ্ধি যে আমাদের মতই টন্টনে, সে যে আমাদের মতই ভেবেচিন্তে মতলব খাটিয়ে কাজ করে—এই হচ্ছে একদল পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন গাছ কেবলই নিজেকে তার চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কি হচ্ছে তা বুঝে নিয়ে সে ত' কাজ করেই—কি হতে পারে তা এঁচে নিয়েও কাজ করে। সেই দলের পণ্ডিতের কথাই সত্য বলে' মেনে নিয়ে আমরা পর পর দেখিষে যাব গাছের সমস্ত শরীরের কাজ—আর কি কি মতলবে সেই সেই কাজ হচ্ছে।

গাছের বীচি।— যে কোন গাছের যে-কোন বীচি নিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, তার উপরে শক্ত খোলা, আর ভিতরে নরম শাঁস। এই নরম শাঁসটাই হচ্ছে বীচির আসল জিনিষ—এই থেকেই নতুন গাছ হয়। যে-সব বীচির ভিতরটা পোকায় ফোঁপরা করে' ফেলে, সেই ভূয়ো বীচি থেকে, কিম্বা যে-সব বীচির ভিতরকার শাঁস গজায়নি, সেই চিটে বীচি থেকে গাছ হয় না। কিন্তু এও হয়ত তোমরা দেখে থাকবে যে, উপরকার খোলাটা না থাকলে, কেবল শাঁসটুকু থেকেও গাছ হয় না। একটা গিলের খোলাকে হাতুড়ী দিয়ে ভেঙে ফেলে, একটা নারকোলের মালাকে দা দিয়ে চটিয়ে তুলে ফেলে, কিম্বা একটা লিচুর বীচির খোলাকে ছুরী দিয়ে চেঁচে তুলে ফেলে মাটির মধ্যে হতে দাও; দেখবে তা থেকে কখনোই গাছ হবে না। কেন ?

গাছ ইচ্ছা করে' তার বীচির শাঁসকে শক্ত খোলা দিয়ে মুড়ে দেয় এই জন্যে যে, তাহলে তা সহজে নষ্ট হবেনা। বীচির শাঁস আলাগা থাকলে তা'থেকে নতুন গাছ হবার আগেই তাকে পোকায় খেয়ে

ফেলবে—কি যদি পোকাতে নাও খায়, তাহলেও বেশী ঠাণ্ডা কি বেশী তাত লেগে মরে' যাবে। তাত জল না পেলে যে বীচি ফলায় না তা সত্যি, কিন্তু বেশী তাত জল পেলে হয় বীচি যায় শুকিয়ে, নাহয় ত যায় পচে। এনামেলের মত শক্ত খোলায় আঁটসাঁট করে' মোড়ক-করা বীচির সে ভয় নেই। জানা গেছে, যে ঠাণ্ডায় পারা জমে শক্ত হয়ে যায়, বাষ্প গলে' জল হয়ে যায়, সে ঠাণ্ডাও বীচির খোলা ঠেকাতে পারে।

একটা বীচিকে যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল ক'রে নজর করে দেখ, তাহলে দেখবে তার খোলার গায়ে একটা ছোট জায়গা আছে, যা সব চেয়ে নরম—যেন একটা ছোট ছাঁদাকে কেউ পাতলা পরদা দিয়ে বুজিয়ে রেখেছে। এর মানে কি?—এর মানে এই যে, বীচি যখন ফলায়, তখন ঐ নরম জায়গাতেই ফাট ধরে আগে -- আর সেই ফাটল দিয়েই কচি শিকড়টা মুখ বের করে। অবশ্য মাটির রসে ভিজ়ে শাঁসটাও ফোলে, খোলাটাও নরম হয়ে যায়, আর ভিতর থেকে বাড়বার চাড় ত আছেই; কাজেই রোগা লোক হঠাৎ মোটা হয়ে গেলে তার জামাটা যেমন চড়াৎ করে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, খোলাটারও ঠিক তেমনি দশা হয়। পাছে মিছিমিছি বেশীদিন খোলার মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, আর বেরবার জন্যে আঁকুবাঁকু করে, তাই গাছ তার বীচির গায়ে ঐ নরম জায়গাটা ক'রে রেখেছে। একটা নারকোলকে ছুলে তার মাথাটা টিপে দেখো, দেখবে সেখানে একটা জায়গা আছে, যা আঁতুড়ে ছেলের মাথার চাঁদির মত তলতলে; ঐখান দিয়েই নারকোলের চারার শিকড় গুঁড়ি বেরায়। নারকোলের খোলার গায়ে আর যে দুটো চোখের মত গর্ত দেখতে

পাও, সে দুটোও অম্নি নরম জায়গা ; তা ফুঁড়েও শিকড়গুঁড়ি বেরতে পারত—কেননা একটা নারকোল থেকে তিনটে নারকোল গাছ হবারই কথা। কিন্তু তা বেরায় না—একটা নারকোল থেকে একটা নারকোল গাছই হয়। একটা ছোলাকে আতসী কাঁচের তলায় ধ'রে দেখলেও দেখতে পাবে, তার তলপেটে নাইয়ের মত একটা গর্ত আছে।

গাছের শিকড়।—বীচি থেকে বেরিয়েই শিকড় খাড়া নীচের দিকে মুখ করে মাটির মধ্যে ঢোকে। বীচিকে কাৎ করেই পোঁত, চিং করেই পোঁত, আর উপুড় করেই পোঁত—শিকড় নীচের দিকে যাবেই।

শিকড় নীচের দিকে যায় জলের খোঁজে। সে জানে মাটির নীচেই জল আছে—আর সে মাটি তার সেই দিকেই, যেদিকে পৃথিবী সব জিনিসকে টানছে।

কিন্তু খানিকটা নীচের দিকে নেবেই যদি সে বুঝতে পারে সেদিকে জল নেই, তাহলে সে আর পৃথিবীর টান মানবে না ; যেদিকে জল আছে, সেইদিকেই যাবে। একটা চালুনীর উপর গোটা দুই তিন মটর রেখে তাদের কলাতে দাও। মটরগুলোর শিকড় চালুনীর ছাঁদা দিয়ে নীচের দিকে নামবে। চালুনীর নীচে যদি এক গামলা জল রেখে দাও, তাহলে যতই জোলো হাওয়া তাদের গায়ে লাগবে, ততই তারা নীচের দিকে নামবে। কিন্তু যদি জলের গামলাটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় গরম বালি বিছিয়ে দাও, আর চালুনীর উপরটায় গোটাকয়েক ভিলে সেওলা ঢেলে দাও, তাহলে সেই শিকড়গুলো বুঝতে পারবে যে তাদের নীচে শুকনো হাওয়া আর উপরে জোলো হাওয়া ; অম্নি

তার মুখ ঘুরিয়ে উপর দিকে উঠতে থাকবে—কেননা তারা জানে
যেদিকে জ্বালো হাওয়া, সেদিকে জল আছেই।

আগেই বলেছি শিকড়ের রোখ নীচের দিকে—অর্থাৎ নীচের দিকে
সে যাবেই, যদি না সেদিকে জলের কমতি হয়। কিন্তু এমন যদি হয়
যে, তার সামনে বাধলো শুকনো বেলে মাটি, তাহলে সে কি করবে ?
তাহলেও সে ঐ বেলেমাটি ফুঁড়ে নীচের দিকে নামবে, যদি ঐ বেলে-
মাটির তলায় জ্বালোমাটি থাকে। যদি বেলেমাটির বদলে একটা
পাথর সামনে বাধে, তাহলেও সে ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে না—মুখ
ঘুরিয়ে পাথরটার গা বেয়ে তাকে ঘুরে যাবে—আর ঘুরে গিয়েই যেমন
নীচে নামছিল, তেমনি নীচে নামবে। তবে যদি ঐ পাথর কি বেলে-
মাটির তলায় জল না থাকে, তাহলে সে ধম্কে দাঁড়িয়ে ঠিক করে
নেবে কোন্‌দিকে জল আছে—তারপর সেইদিকেই যাবে।

একটা কাঠিকে আমরা যে ভাবে চেপে মাটিতে পুঁতি, শিকড় ঠিক
সে ভাবে মাটির মধ্যে ঢোকে না; সে ঢোকে অনেকটা স্কুপের মত
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, যাতে জোর লাগে কম।* পাছে তা'তেও তার নরম
কচি ডগাটা মাটির ঘসড়া লেগে জখম হয়ে যায়, তাই ডগাটা একটা টুপি
দিয়ে ঢাকা—যেমন টুপি লোকে সেলাই করবার সময় আঙুলের
মাথায় পরে। বট, কেয়া আর পানার শিকড়ে এই শিকড়ের টুপি
খুব ভালরকম দেখা যায়।

* শিকড় যে স্কুপের মত ঘুরে ঘুরে মাটিতে ঢোকে, তার আর একটা মানেও
আছে। সোজাছবি সূচের মত চুকলে সে তত খাধার জিনিস দেখতে পেতো
না, বত ঐ ভাবে চুকে পার।

গুঁড়ির যেমন ডালপালা হয়, শিকড়েরও তেমনি ডালপালা হয়, তা সে মোচা-শিকড়ই হোক, আর ঝুপো-শিকড়ই হোক। কুচো শিকড় গুলো আসল শিকড়ের গা থেকে আড়াআড়ি ভাবে বেরোয়—আবার কুচো শিকড়ের গা থেকে তার চেয়ে কুচো শিকড় আড়াআড়ি ভাবে বেরোয়। কুচো শিকড়ের রোখ আসল শিকড়ের মত নীচের দিকে নয়—কেননা তারাও যদি নীচের দিকেই নামবে, তাহলে চারপাশের জল খুঁজবে কে? তাদের রোখ গোড়াগুড়ি থেকেই জলের দিকে, তা কে জানে উপরে, কে জানে নীচে, কে জানে আশপাশে।

কিন্তু মাটির রস আসল শিকড়ও টানে না, কুচো শিকড়ও নয়। সে টানে এক লোম-শিকড়। এ শিকড় চুলের মত সরু—আর আসল শিকড়ের গা থেকেও বেরোয়, কুচো শিকড়ের গা থেকেও বেরোয়। রস টানতে হয় বলেই গাছের সব শিকড়ের চেয়ে লোম শিকড় বেশী। লোম-শিকড় মাটির ফি ফাঁকটি দিয়ে মাথা গলায়, যাতে না এক ফোঁটা রসও ফস্কে যায়। একটা বড় গাছের গোড়া কুপিয়ে এমন এক ডেলা মাটি তুলতে পারবে না, যার ভিতর দিয়ে একটা লোম-শিকড়ও না মাথা চালিয়েছে। লোম-শিকড়গুলোই দলে দলে বেরিয়ে এমন জোরে মাটি কামড়ে থাকে যে, একটা গাছকে উপড়ে তুলে ফেললে দেখবে তার শিকড় থেকে ডেলা ডেলা মাটি বুলছে। বরং লোম-শিকড় ছিঁড়বে, তবু সব মাটি ছাড়বে না—ঝাড়লেও না, ধুলেও না।

লোম-শিকড়ই যে মাটির রস টানে, অন্য শিকড় টানে না, তা এই থেকেই বুঝতে পারবে। একটা চারাগাছকে চড়চড়িয়ে টেনে তুলে আবার ভাল করে মাটির মধ্যে পুঁতে দাও, পরদিনই দেখবে তার পাতাগুলো মুস্ড়ে গেছে। তার মোটা শিকড় একটোও ছেঁড়ে নি—

ছিঁড়েছিল কেবল লোম-শিকড়, তাই সে আর মাটির রস টানতে পারছে না। লোম-শিকড়ই যে মাটির রস টানে, তা আর এক দিক দিয়েও বোঝানো যায়। পানা পাটারি, পানিকলের মত যে সব গাছ জলে হয়, তাদের ত আর জল জল করে হাতড়ে বেড়াতে হয় না, কাজেই তাদের লোম-শিকড় নেই বলেই হয়। ক্ষুদে পানার ত মোটেই লোমশিকড় নেই। তার যা একটা কি দুটো আসল শিকড় থাকে, তাই লোম-শিকড়ের কাজ করে।

গাছ যতই বড় হতে থাকে, তার শিকড়ও ততই বাড়তে থাকে,— কি লম্বায়, কি মোটায়, কি ডালপালায়। কেননা গাছ বড় হতে থাকলেই তার বেশী খাবারের দরকার। তা ছাড়া ঝড়ঝাপটার সময় চারাগাছের শিকড়ে তত টান পড়ে না, যত বড় গাছের। গাছের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিকড়ও না বাড়ত, তাহলে একটু ঝড় উঠলেই, কি কোন রকমে গুঁড়িটা একটু হলে পড়লেই, গোটা গাছটা উপড়ে যেত। শিকড় গাছটাকে নোঙরের মত পোক্ত করে মাটির সঙ্গে গেঁথে রাখে। ডালপালা নেই বলে' ঝড়ের সময় তাল নারকালের গায়ে ধাকা লাগে কম; তবু যে আম কাঁঠালের চেয়ে তারাই বেশী ওপড়ায়, তার মানে আম কাঁঠাল যত মোটা মোটা শিকড় দিয়ে যতখানি মাটি আঁকড়ে থাকে, তাল নারকোল তা পারে না। ঝড়ের আগেই যে কলাগাছ পড়ে, সেও এই জন্যে।

গুঁড়ির তলাতেই শিকড় থাকবে, এই হচ্ছে গাছের নিয়ম; কিন্তু কখনো কখনো গুঁড়ির গা থেকেও শিকড় বেরায়। বটগাছের ডালপালা থেকে যে ঝুরি (বোয়া) নামে, তা তোমরা দেখেইছ। ওগুলো নামে কেন?—ওগুলো নামে এই জন্যে যে, বটগাছের ডাল যেমন ভারি

তেমনি লম্বা ; ওগুলো যদি খামের মত ডালের ভার না বয়, কি খুঁটির মত ডালগুলোকে চাড়া দিয়ে না রাখে, তাহলে সেগুলো মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। তা ছাড়া ওগুলো মাটির রস টেনেও গাছকে খাওয়ায়—যেন গাছের বুড়োবয়সের ছেলে ! ওগুলোকে গাছের বেজায়গার শিকড় বলে। আর যে শিকড় গোড়াগুড়ি থেকে গাছকে খাইয়ে বড় করে তোলে, সেই হচ্ছে গাছের আসল জায়গার শিকড়। কেয়া, নারকোল, সুঁদরীর গোড়ারদিককার গুঁড়ি থেকে যে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তা বেরোয় এই জন্মে যে, এ সব গাছের আসল জায়গার শিকড় তেমন লম্বাও নয় শক্তও নয় যে, কেবল তার ভারসাতেই গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। চৈ, গাছপান, গজ-পিপুলের গুঁড়ির গাঁট থেকে যে খোপা খোপা শিকড় বেরোয়—তা বেরবার মানে এই যে, ও সব গাছ কোন একটা খাড়া গাছকে বেয়ে ওঠে ; সে গাছটাকে জড়িয়ে ধরবার জন্মেই ঐ সব শিকড়ের দরকার। পাথরকুচির পাতাকে মাটিতে ফেলে রাখলে, পাতার কিনার দিয়ে যে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তার মানে ঐ শিকড়ের উপরেই নতুন গাছ হবে।

বটগাছের বেজায়গার শিকড়ের মত আরো অনেক গাছের শিকড় আছে, যা দেখতে মোটেই শিকড়ের মত নয়। বট গাছের বুরি দেখলে ঠিক মনে হবে সেগুলো শিকড় নয়, গুঁড়ি—যদিও আসল গুঁড়ির চেয়ে সরু। কিন্তু সেগুলো যে গুঁড়ি নয়, তা এই থেকেই বোঝা যায় যে, গুঁড়ির মত তাদের গায়ে গাঁট নেই—তাদের গা থেকে পাতামুক্ক ডালপালা বেরোয় না। কিন্তু এই সব শিকড় দেখতে অনেকটা গুঁড়ির মত বলে, এদের নাম হচ্ছে রূপচোরাশিকড়।

সমুদ্রের ধারে যে গরাণ গাছ হয়, তাদের তলার দিককার গুঁড়ি থেকে বেজায়গার শিকড় বেরায়—তাও রূপচোরা শিকড়, তাও দেখতে গুঁড়ির মত। ভাঁটার সময় যখন শিকড় সব জেগে ওঠে, তখন ঠিক মনে হয় গাছের গোড়ার দিককার গুঁড়িটা অনেকগুলো ফ্যাকুড়ায় চিরে গেছে। এরকম শিকড় বেরবার মানে এই যে, গরাণ গাছ যে মাটিতে জন্মায়, সে হচ্ছে পেকো বেলো মাটি, তাতে শিকড় তেমন এঁটে বসতে পারেনা, যেমন এঁটেল মাটিতে বসে; তার উপর জলের স্রোত তাকে কেবলই গোড়া ধরে ঝাঁকিয়ে, কাজেই এরকম কায়দা ছাড়া সে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার বেজায়গার শিকড়গুলোর ফাঁক দিয়ে ছ ছ করে জল বয়ে যায়—তখন ঠিক মনে হয় একটা মাকড়সা তার লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলোকে হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগেই বলেছি শিকড় মাটির রস টানে, কিন্তু সে রস মানে শুধুই জল নয়—জলে গোলা শক্ত খাবার। * যে সব খাবার জলে গোলেনা, তাদের গলিয়ে নেবার জন্যে শিকড় নিজের গায়ের ভিতর থেকে একরকম টক রস (অ্যাসিড) বের করে। ঐ টক রসে গলানো খাবারকে সে জলের মতই টেনে নেয়।

* গাছের শক্ত খাবার হচ্ছে এই ক'টা—লোহা, গন্ধক, বালি, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নিসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরস্। লোহা যেমন একটা ধাতু, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নিসিয়াম, পটাসিয়ামও তেমনি এক একটা ধাতু। ফসফরস্ কোন ধাতু নয়—গন্ধকের মতই একটা জিনিষ। ফসফরস্ অক্ষকাবে দপ্ দপ্ করে জলে, কিন্তু আগুনের মত হাত পুড়িয়ে দেয় না।

অর্কিডের মত যে-সব নিরীহ পরগাছা অন্য গাছের উপর পাখীর মত ভর দিয়ে থাকে মাত্র, তাদের শিকড় শু লুটে-যাওয়া শিকড় নয় যে, যে গাছের উপর গজিয়েছে সেই গাছেরই রস চুষে খাবে; আর সে শিকড় মাটি পর্য্যন্তও নাবেনা যে, মাটি থেকে রস টানবে। কাজেই সে শিকড় অন্য ফন্দীতে খাবার জোগাড় করে। তার শু দরকার মাটি আর জল। এ দুইই সে পায় বাতাস থেকে। তোমরা জান হাজার হাজার ধূলোর গুঁড়ো দিনরাত বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে— আর এও জান যে, অনেক জল বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে। এখন, ধূলোর গুঁড়োদের এইটুকুই মজা যে, তারা খালি গায়ে থাকতে চায় না; হাওয়ার বাষ্পকে গলিয়ে জল করে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেদের মুড়ে রাখে। এই সব জলেমোড়া ধূলোর গুঁড়ো হতে নিরীহ পরগাছার শিকড় খাবার বের করে নেয়। তাছাড়া যে গাছের উপর ঐ সব পরগাছা জন্মায়, তার ছালের ফাটলের মধ্যেও শিশির বৃষ্টিতে ভেজা ধূলা থাকে। পরগাছার শিকড় ঐ ফাটলের মধ্যে ঢুকে ঠিক যেন মাটির রস চুষে খায়। টোকা পানার মত যে সব গাছের শিকড় জলে থাকে, তাদের জলচরা শিকড়, আর অর্কিডের মত নিরীহ পরগাছাদের বাতাসচরা শিকড় খুবই নরম; কিন্তু যে সব গাছ মাটি থেকে রস টানে তাদের মাটিচরা শিকড়, আর রান্নুসে পরগাছাদের শিকড় বেশ শক্ত— কেননা শক্ত জিনিষের মধ্যে তাদের ঘুরতে হয়।

গাছের গুঁড়ি।—বীচি থেকে বেরিয়েই ক'ল সোজা উপর দিকে ওঠে। যদি বীচি বেশী মাটির নীচে পৌঁতা থাকে, তাহলে কলের মাথাটি কলের মত কুঁকড়ে মাটি খুঁড়ে ওঠে, পাছে মাটির

ঘষড়ায় জখম হয়ে যায়; আর মাটির উপরে উঠেই পাক খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ক'ল যখন বড় হয়ে পাতা বের করে, তখন তাকে গুঁড়ি বলে।

গুঁড়ি উপরে ওঠে আলোর খোঁজে। যদি সোজা উপর থেকে আলো না আসে, তাহলে যেদিক থেকে আলো আসে সেইদিকেই গুঁড়ি বেঁকে যায়। একটা অন্ধকার ঘরের জানলার কাছে টবে করে একটা চায়াগাছ রেখে দাও—দু'চারদিন পরেই দেখবে ডালপাতাসুন্ধ গুঁড়িটা বাইরের আলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

পাতায় যে গাছের খাবার রান্না হয়, তা আগেই বলেছি। কিন্তু যখন ক'ল বা কচি গুঁড়ির গায়ে পাতা বেরোয়নি, অথচ শিকড় রস টানছে, তখন খাবার রাঁধে কে?—খাবার রাঁধে বীচিপাতা। ক'ল বুঝেবুঝেই অনেক সময় বীচিপাতাকে কাঁধে করে' মাটির উপরে ঠেলে ওঠে। একটা তেঁতুলের কচি চারার দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে এ কথা ঠিক কিনা। গুঁড়ির গায়ে দু'চারটে পাতা বেরলেই বীচিপাতা খসে' পড়ে' যায়।

গুঁড়ির গা নলের মত সমান নয়; তার গায়ে গাঁট আছে। সব গুঁড়ির গাঁট তেমন চোখে মালুম হয় না—যেমন আখ বাঁশ সুপুত্রীর হয়।

দুই গাঁটের মাঝামাঝি জায়গাকে পাব বলে। তোমরা সকলেই জান যে, পাবের চেয়ে গাঁট বেশী শক্ত আর নীরেট। মাঝে মাঝে গাঁট আছে বলেই গাছের গুঁড়ি অত মজবুত—ঝড়ঝাপটায় টপ করে' ভেঙ্গে পড়ে না। হাড়জোড়া গাছের পাবের চেয়ে গাঁটগুলোই সরু সরু—সেইজন্য তার গুঁড়িটা দেখতে শিকলের মত। কিন্তু গাঁটগুলো যে পাবের চেয়ে শক্ত, তাতে ভুল নেই।

যে সব গাছের গুঁড়ি খুব সরু আর লগ্‌বগে, ঝড়ের সময় তাদের তলার গুঁড়িতেই টান পড়ে বেশী। এই জন্যে তাদের আগার গুঁড়ির চেয়ে তলার গুঁড়ির গাঁটগুলো কাছাকাছি।

যে সব গাছের গুঁড়ি মোটা আর শক্ত, তারাও এমন জিনিষ দিয়ে আগাগোড়া তৈরী যে, নোয়ালেও ভাঙতে চায় না। বেতকে যে কি রকম বেঁকানো যায়, তা তোমরা জান; কিন্তু অতটা না বেঁকলেও সব গাছই যে কিছু না কিছু বেঁকে, তা ঝড়ের সময় যে-কোন গাছের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে। সুপুরা গাছ ত মাটির উপর শুয়ে পড়ে আর উঠে দাঁড়ায়—দেখলে মনে হয় যেন রাগের চোটেই মাথা বুটছে!

গুঁড়ি গাঁট থেকেই পাতা বের করে। কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে একটা করে পাতা বেরায়—যেমন লাউ, বাঁশ, পেঁপে, জবার; কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে দুটো করে পাতা বেরায়—যেমন গন্ধরাজ, তুলসী, ঘলঘসের; আবার কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে অনেকগুলো করে পাতা বেরায়—যেমন ছাতিম, ডালিমের।

প্রতি পাতার উপর-কোলে একটা করে ছোট কুঁড়ি থাকে। ঐ কোলকুঁড়িই পাতাসুদ্ধ ডাল হয়ে ফুটে বেরায়। পাতা খসে গেলেও, কোলকুঁড়ি প্রায় খসে না।

গুঁড়ির মাথাতেও একটা কুঁড়ি থাকে, যাকে মাথার কুঁড়ি বলে। মাথার কুঁড়ি বাড়লেই গুঁড়ি লম্বাতে বাড়ে। ডাল হচ্ছে গুঁড়ির ফঁ্যাকড়া, সরু গুঁড়ি বললেও চলে; তাই ডালের মাথাতেও মাথার কুঁড়ি আছে।

সব কোলকুঁড়িই যে ডালপালা হয়ে ফুটে বেরায় তা নয়; তা যদি বেরতো, তাহলে এক একটা গাছ আশেপাশে বেড়ে এক একটা

পাহাড়ের মত হয়ে পড়ত—গুঁড়িটা ডালপালার ভার বহিতে পারত না, শিকড়গুলো গাছের খাবার জোগাতে পারত না, আর পাতা-গুলোকে কাজ না করে' চুপ করে' বসে থাকতে হত ; কেননা অত পাতা গাছের দরকারই নেই। তাই বেশীর ভাগ কোলকুঁড়িই হয়ে অবধি ঘুমিয়ে থাকে।

ঘুমন্ত কুঁড়িরা যে একেবারেই জাগে না, তা নয়—দরকার হলে জাগে। অনেক সময় দেখা যায় একটা ঘূনধরা সজনে গাছ ঘাড়মোড় ভেঙ্গে ছড়মুড় করে পড়ে' গেল, কি একটা তেঁতুল গাছের ডালপালা সব বাজ পড়ে জ্বলে' গেল। গাছটার নেড়া গুঁড়ি অনেক দিন ধরে' মড়ার মত পড়ে' রইল, তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই মরা-গুঁড়ির গা থেকেই কচি কচি ডালপালা তড়বড়িয়ে ফুটে বেরচ্ছে—যেন সেকালের কোন মুনিঋষি এসে একটুখানি জলের ছিটে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এ আর কিছুই নয়, যে ঘুমন্ত কুঁড়িগুলো এতকাল ধরে' পড়ে' পড়ে' ঘুমচ্ছিল,—গাছটা মরে' যায় দেখে, তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

মাথার কুঁড়ির মধ্যে গুঁড়ির একেবারে কচি ডগাটি পাতায় পাতায় মোড়া থাকে। মাথার কুঁড়িটা যতই ফুটতে থাকে, ততই গুঁড়ির ডগাটি পাতা ছড়াতে ছড়াতে বেড়ে যায়। ডগার পাবটি যখন বাড়চে, তখন তলার পাবগুলো যেমন তেমনই থাকে ; থাকেনা কেবল ধান, বাঁশ, আখের মত দু-একটা গাছের। তাদের ডগার পাবটিও যেমন বাড়ে, অমনি তলার পাবগুলোকেও কে যেন টেনে টেনে লম্বা করে' দেয়। সেই জন্মেই ঐ সব গাছ দেখতে দেখতে উঁচু হয়ে ওঠে। একটা বাঁশগাছ একদিনেই দু'হাত বাড়ে। ধানগাছের বাড় আরো বেশী।

আজ বানের জলে ধানগাছের মাথার উপর তিনহাত জল দাঁড়িয়ে গেল, কাল কি পরশ দেখবে, সে জলের উপর মাথা জাগিয়েছে।

তাল, নারকোল, খেজুর, সুপুরীর মত প্রায় সব এক-বীচিপাত গাছের মাথার কুঁড়িটাই বাড়ে, কোলকুঁড়িগুলো ঘুমিয়েই থাকে। একেই ত ও সব গাছের শিকড়-গুঁড়ির জোর কম, তা'তে আবার যদি রাশি রাশি ডালপালা বেরায়, তাহলে টেঁকাই দায়।

গুঁড়ির মাথার কুঁড়ি বেড়েই যায়, তবে কোন কোন গাছে এও দেখা যায় যে, মাথার কুঁড়িটা খানিক দূর বেড়েই ঘুমন্ত কোলকুঁড়ির মত ঘুমিয়ে পড়ল, কি ফুল হয়ে ফুটে উঠল, কি একেবারেই মরে' গেল। তখন কি হয়? গুঁড়ির বাড় কি বন্ধ হয়ে থাকে?—তা থাকে না। ঐ মাথার কুঁড়ির ঠিক নীচেই যে কোলকুঁড়িটা ঘুমিয়েছিল, সেইটেই মাথার কুঁড়ির মত হয়ে যায়—সেইটে থেকেই গুঁড়ির মত মোটা ডাল বেরিয়ে উপরদিকে ওঠে।

আসল গুঁড়ির মাথার কুঁড়িটা ঘুমিয়ে পড়লে কি মরে' গেলে কখনো কখনো তার তলার দিককার দুটো কুঁড়িই দুদিক থেকে ত্যারচা ডাল হয়ে ফুটে বেরায়; আবার সেই ডাল দুটোর মাথার কুঁড়ি যখন ঘুমিয়ে পড়ে কি মরে' যায়, তখন তাদের প্রত্যেকের তলা থেকে আবার দুটো করে কোলকুঁড়ি ত্যারচা ডাল হয়ে ফুটে ওঠে।

এক একটা গাছের আবার মাথার কুঁড়িটা মরে' গেলে, তার তলার দিককার দশ বিশটা কোলকুঁড়ি হয়ত একসঙ্গে ফুটে ওঠে—যেন আসল গুঁড়িটা হঠাৎ দশ বিশটা ফঁাকড়া-গুঁড়িতে চিরে গেল। ভবানীপুর বকুলবাগানের মোড়ে যে ২৭-মাথা খেজুর গাছটী আছে, তার এই রকম খামখেয়ালী বাড়। তার মাথার কুঁড়ির বাড় খেমে যেতেই

তলার ২৭টা কুঁড়ি একসঙ্গে ফুটে উঠে তার ঘাড়ে ২৭টা মাথা চাপিয়ে দিয়েছে।

আসল গুঁড়িটাকে ডালপালা আর পাতার বোঝা বইতে হয় বলে' গাছও যত বাড়তে থাকে, সেও তত মোটা হতে থাকে। কেবল তাল, নারকোলের মত গোটাকয়েক গাছ মাথায় বাড়লেও গায়ে বাড়ে না। তবে তাদের তা'তে বিশেষ লোকসান নেই, কেননা তাদের ডালপালা হয় না যে বইতে হবে।

থামের যেমন তলার দিকটা উপর দিকের চেয়ে মোটা, গাছেরও ঠিক তাই। এতে এই সুবিধা হয় যে, গাছ বেশী ভার বইতে পারে।

গুঁড়ির গা সব গাছের সমান নয়; কোন গাছের তেলা,—যেমন বাঁশ, পেয়ারা, ইউক্যালিপ্টসের; কোন গাছের খস্খসে—যেমন আম, নিম, কুলের; কোন গাছের গুঁড়ি শোঁয়ায় ভরা—যেমন লাউ, তুলসী, সূর্যমুখীর; কোন গাছের গুঁড়ি কাঁটায় ভরা—যেমন গোলাপ, পদ্ম, কণ্ঠিকারী, কাঁটানটে, কুলেখাড়ার; কোন গাছের গুঁড়ি আগাগোড়া কুঁড়ো-মাথানো—যেমন আকন্দ্রের; কোন গাছের গুঁড়ি চট্চটে—যেমন তামাক, লাল ভেরাণ্ডার; কোন গাছের গুঁড়িতে খোঁচা দিলে দুধের মত কস্ বেরোয়—যেমন পেঁপে, রাংচিত্তে, করবীর; কোন গাছের গুঁড়ি চিরলেই ঝরঝর করে আঠা পড়ে—যেমন জিউলী, সজনে, রবারের।

আঠাই বল, কস্‌ই বল, শোঁয়াই বল, কুঁড়োই বল, কাঁটাই বল,—এ সব গাছের খাম্‌খেয়াল নয়, এর মানে আছে। এই দিয়েই গাছ পোকামাকড়, জন্তুজানো রের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়। এক রকম গুব্বরে পোকা আছে যারা গাছের গা ফুঁড়ে তার মধ্যে ডিম

পাড়তে যায়। রবার গাছের গা ফুঁড়লেই তারা ঝাঁঝালো আঠায় জড়িয়ে মারা যায়।

গুঁড়ি হয় কেন? গুঁড়ির আসল কাজটা কি?—তোমরা হয়ত বলবে গাছকে খাড়া করে' ধরে' রাখা। গাছকে সে খাড়া করে' ধরে' রাখে ঠিক—কিন্তু সব গুঁড়িই ত আর খাড়া গুঁড়ি নয়; লতানে গুঁড়িও ত আছে। গাছকে খাড়া করে' রাখবার জন্যই যদি গুঁড়ির দরকার হবে, তাহলে লতানে গাছের গুঁড়ি হতই না। এবার হয়ত তোমরা বলবে গুঁড়ির আসল কাজ হচ্ছে পাতা ফুল ফলের ভার বণ্ডা। তাই যদি হবে, তাহলে আনারস কচু ঘতকুমারী মুরগার মত যে সব গাছের সব গুঁড়িটাই চোরা গুঁড়ি, অর্থাৎ মাটির মধ্যে পোঁতা—সে সব গাছের গুঁড়ি হয় কেন?—তোমরা হয়ত এবার খাবার জমানো, খাবার চালাচালির কথা পাড়বে, কিন্তু ও সব কাজ ত গাছের পাতাও করতে পারে, শিকড়ও করতে পারে—অনেক গাছে করে'ও থাকে। চাপ্ড়া ঘাসের যে চোরা গুঁড়িও নেই, দেখা গুঁড়িও নেই—সে বেঁচে আছে কি করে'? তার যে শিকড়ের উপরেই পাতা। পাতাগুলো এলানো চুলের মত মাটির উপর গা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে, অর্থাৎ মাটিই তাদের ভার বয়।

ঠিক। কিন্তু চাপ্ড়াঘাসের একটা কি মস্ত অসুবিধে জানো? বেশী আওতায় জন্মালে সে বাঁচেনা। দুর্বা ঘাসের কিন্তু সে অসুবিধে নেই। সে যতই আওতায় জন্মাক, তার লতানে গুঁড়িটাই তাকে আওতা থেকে বের করে আলায় নিয়ে যায়। গুঁড়ির আসল কাজ হচ্ছে পাতাগুলোকে আলোর মুখ দেখানো

যদি বল সব গুঁড়িই তাহলে লতানে হয় না কেন? তাহলে বলব

যে উপর দিকে উঠলে যে গাছ বেশী আলো পাবে, ফাঁকা আলো পাবে। ধর—একটা মস্ত বন, কেবল ঘেঁসাঘেঁসি ঝোপগাছ। সেখানে দুর্ব্বা ঘাসের লতানে গুঁড়ি আর মাটি বেয়ে কত দূর দৌড়বে? তা ছাড়া পাতাখেকো জন্তুরা যাতে না পাতা পর্য্যন্ত নাগাল পায়, সে জন্যও গাছ উঁচুতে ওঠে। তা ছাড়া এক একটা গাছ বেয়াড়া লম্বা হয় অন্য গাছের সঙ্গে টক্কোর দিয়ে—কেননা সকলেই চায় আমার মাথায় পুরো ফাঁকা আলোটা লাগুক।

লতানে গাছ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না—কাজেই কি করে? গড়িয়ে গড়িয়েই যতটা পারে আলোর মুখ দেখবার চেষ্টা করে। পুঁই, তরমুজ, পটল, শুষ্নি, রাঙা-আলু, খুলকুড়ি, আমরুল—এই সব গাছের গুঁড়ি মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে চলে। এদের মধ্যে আবার শুষ্নি, খুলকুড়ি, রাঙাআলু, আমরুল একটু করে' যায় আর একটা গাঁট থেকে শিকড় বের করে—যেন হাঁপিয়ে ওঠে আর শিকড় বের করে' জিরোয়। দুর্ব্বা, আলু, হলুদের গুঁড়ি মাটির উপর দিয়ে যায় না, মাটির ভিতর দিয়ে দৌড়য়। তারা যেন একরকম মাটির ডুবুরি! পানকৌড়ির মত এক নিঃশ্বাসে খানিক দূর গিয়ে ভুস্ করে ভেসে ওঠে, আর যেখানেই ভেসে ওঠে সেইখানেই উপর দিকে একটা সরু ডাল বের করে' আবার ডুব দেয়।

অনেক লতানে গাছ কিন্তু মাটিতে লতিয়ে খুসী হয় না—তারা খাড়া গাছের মত উঁচুতে উঠবে। কি করে উঠবে?—পাশেই যদি কোন খাড়া গাছ কি পাঁচীল থাকে, তাহলে সেই পর্য্যন্ত লতিয়ে গিয়েই তাকে বেয়ে উঠবে। এই বেয়ে ওঠার জন্যে তারা মাথা খেলিয়ে নানান ফিকির বের করেছে। কেউ বা খাড়া গাছটাকে

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে,—যেমন সীম, গুলঞ্চ, মাধবীলতা, বরবটী, স্বর্ণ-লতা, তরুলতা। কেউ বা গুঁড়ি থেকে বেজায়গার শিকড় বের করে' তাই দিয়ে অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে' ওঠে,—যেমন চৈ, গাছপান, গজ-পিপুল, গোলমরিচ। কেউ বা বেজায়গার শিকড়ের বদলে বঁড়শীর মত কাঁটা বের করে' সেইগুলো অন্য গাছের গায়ে বাধিয়ে তাদের মাথায় চড়ে' বসে - যেমন কাঁটালিচাঁপা, কেলেকোঁড়া, গোলপ, শিয়াকুল, বেত, চীনেলতা, লতানে বাঁশ। কোন কোন লতার গা থেকে আবার লম্বা লম্বা আঁকড়া বের হয়। ঐ আঁকড়াগুলো যেই কোন জিনিসে ঠেকে, অম্নি তাকে জড়িয়ে ধরে,—যেমন লাউ, কুমড়ো, শঁশা, তরমুজ, ঝুম্‌কোলতার। আঁকড়াগুলো স্প্রিং-এর মত পঁ্যাচ খাওয়া, টান পড়লে অনেকখানি লম্বা হতে পারে, কাজেই টপ করে' যে ঝড়বাতাসে ছিঁড়ে যাবে, সে জো নেই। বিলাতে ভার্জিনিয়া ক্রীপার বলে একরকম লতা আছে, যা তেলা পাঁচীল বেয়ে উঠতে পারে, পিছলে পড়ে না। তার আঁকড়ার ডগায় ছোট ছোট বোতামের মত কতকগুলো জিনিস হয়, যা এম্নি চট্‌চটে যে দেয়ালের গায়ে তাই এঁটে এঁটে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়।

গাছ যে আঁকড়া বের করে, সে আঁকড়া সে পায় কোথায়? গাছের কোল-কুঁড়িই বদলে আঁকড়া হয়ে যায়। ঝুম্‌কোলতার একটা আঁকড়া যদি একটু ভাল করে' দেখ, তাহলেই দেখবে সে বেরিয়েছে পাতার ঠিক উপরকোল থেকে, আর পাতার উপরকোলে যে কোলকুঁড়ি থাকবার কথা, সে কোলকুঁড়ি নেই! হাড় জোড়া আর গোয়ালেলতার মাথার কুঁড়িই বদলে আঁকড়া হয়ে যায়।

কোলকুঁড়ি যে শুধু আঁকড়া হয়েই বেরোয় তা নয়, দরকার হলে

কাঁটা হয়েও বেরোয়। বেল, বুঁচ, বাগানবিলাসে গাছের কাঁটা হচ্ছে
রূপচোরা কোলকুঁড়ি

খাড়া গুঁড়ির খাড়া উপর দিকে ওঠবার কথা হলেও, অনেক সময় সে তা করতে পারে না। হয়ত তার মাথার উপর অন্য দু' তিনটে বড় গাছ এমনি বুঁকে পড়েছে যে, এক কোণের একটু ফাঁক দিয়ে মাথা গলানো ছাড়া তার উপায় নেই,—কাজেই তার গুঁড়িটাকে বেঁকাতে হয়। ফাঁকা মাঠের গাছকে অনেক সময় ঝড়ই ঘাড় ধরে' বেঁকিয়ে দিয়ে যায়। সমুদ্রের ধারে যেখানে দিনরাত্তিরই জোর বাতাস বইছে, সেখানকার অনেক গাছই এইরকম। ঘাড় তুলে ঘাড় ভাঙবার চেয়ে তারা ঘাড় নুইয়ে থাকাই ভাল বুঝেছে।

আমেরিকায় মেক্সিকো দেশে একরকম অকিড পরগাছা আছে, যা নীচের দিকে মাথা করে' ঝোলে। তার মানে, সে দেশে খুব বৃষ্টি হয়। মাথা উপর দিকে থাকলে জলের তোড়ে মাথা ভেঙে যেতে পারে। তা ছাড়া বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলেই যে জোলো হাওয়া ওঠে, তা হেঁটমাথা করেই তার ধরবার সুবিধে হয়।

তোমরা দেখেছ, কচি বেলায় গুঁড়ির রং থাকে সবুজ, বড় হলেই হয়ে যায় কটাসে। এর মানে চারাগাছের পাতা কম, অথচ ক্ষিদে বেশী, কেননা ধাঁ ধাঁ করে বাড়তে হবে; কাজেই তার গুঁড়িও গাছসবুজ দিয়ে পাতার মত খাবার রাঁধে। আর বড় গুঁড়ির রং কটাসে হয় এই জন্যে যে, তাকে খাবার রাঁধতে হয় না, খাবার জমাতে হয়; রাঁধা খাবারে বেশী তাত আলো লাগলে, তা নষ্ট হয়ে যায়। কটাসে রঙের ভিতর দিয়ে তাত আলো চুঁইয়ে যায় কম।

যে সব গাছের খুব কুচি কুচি পাতা—যেমন বাজবরণ; কি মোটেই পাতা নেই—যেমন ফণীমনসা (নাগযাণী); * সে সব গাছের খাবার রাঁধেও গুঁড়ি, খাবার জমায়ও গুঁড়ি। তাদের গুঁড়ি পাতার মতই সবুজ, অথচ খাবার-পোরা বলে' শাঁসালো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

* ফণীমনসার গুঁড়ি একে পাতার মত সবুজ, তা'তে পাতার মত চেপ্টা না হলেও খুব চেপ্টা—কাজেই অনেকে পাতা বলে ভুল করে। কিন্তু ও যে পাতা নয়, রূপচোরা গুঁড়ি—তা এই থেকেই বোঝা যায় যে, ওর গায়ে গাঁট আছে। আর ও পাতা হলে ও-র ছুপিঠই সমান সবুজ হত না।

রূপচোরা গুঁড়ি অনেক সময় শিকড়ের মতও দেখতে হয়। আলু, হলুদ, কচু, ওলের গেঁড় যে, মূলোশালগমের মত শিকড় নয়—তা হয় গাঁট, না হয় কুঁড়ি, না হয় পাতা, না হয় পাতা খসাব দাগ দেখে বুঝবে। আলুর গায়ে যে পাতলা অংশের মত খোসা দেখ, সেই হচ্ছে পাতা—মাটির নীচে অন্ধকারে থেকে অন্য পাতার মত সবুজ হতে পারে নি; আর যেগুলোকে আলুর চোখ বলে জানো, সেইগুলোই পাতার কোলকুঁড়ি। কচুর কোলকুঁড়িগুলোকে আমরা কচুরমুখি বলে' থাকি।

লোহার ব্যথা ।



ও ভাই কৰ্ম্মকার !

আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কৰ্ম্ম আর ?
কোন্ ভোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলগো যন্ত্র তৌল ।
ঠকা ঠাই ঠাই—কাঁদিছে 'নেহাই', আগুন ঢুলিছে ঘুমে ;
শ্রাস্ত সঁড়াসি ক্রাস্ত ওঠে তালগোছে 'ছেনি' চুমে ।
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি,—
ক্রাস্ত নিখিল, করগো শিখিল তোমার বজ্রমুঠি ।

রাত্রি দুপ'রে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে ;
ভাঙিলে গড়িলে—সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা কধে ।
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল ব'বিসম ;
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ দাহ মম ।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ ;
ধড় হ'তে কঁভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি ;
স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে চাই—পড়ে হাতুড়ির বাড়ি ।

আগুনের তাপে, সাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায় ;
 তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায় ।
 যাহা অন্য়— হোকনা প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ ;
 আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ ?
 তোমার হস্তে ইম্পাত হই, সহি শান পান পোড়,—
 রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর ?
 তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা—দিন রাত মরে খেটে,
 না বুঝে চাতুরি, নেহাই হাতুড়ি, ভাই হয়ে ভাইএ পেটে !

ও ভাই কর্মকার !

রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার ;
 কহগো বন্ধু, কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
 আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি ?
 তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
 কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি ?
 কি কহিছ ভাই ? আমি হব তুমি, এই প্রেম সহি যদি ?
 পিটনের গুণে লোহা কবে হায়, পায় কামারের গদি !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।

কাগজ ।

(‘আনন্দবাজারে’র জন্ম বিশেষভাবে লিখিত)

ইংরাজরা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের জন্মদিনে, many happy returns of the day, এই বাঁধা গৎ আওড়ে থাকেন। এর অর্থ—এদিন যেম বার বার ফিরে আসে ; সংক্ষেপে তোমার যেন বছর বছর পুনর্জন্ম হয়।

আমিও আপনাদের কাগজ সম্বন্ধে এই বিলিতি দস্তুর শুভকামনা করছি।

এ কামনা আমার কেবল মুখের কথা নয়। সংবাদপত্র জিনিষটে কি, এবং কি জন্ম সকলে তার উন্নতি কামনা করতে বাধ্য, তা জানলে আমার কামনার আস্তুরিকতা সম্বন্ধে কারও আর সন্দেহ থাকবে না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি।

সত্যতা জিনিষটি কি?—তার কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অদ্বাবধি কোনও সত্য মানব দিতে পারেন নি। সত্যতার বৃদ্ধি যে মানুষের সুখের বৃদ্ধি অথবা সন্তোষের বৃদ্ধি নয়, তার প্রমাণ সত্যমানবের তুল্য অসম্ভূষ্ট লোক আর দুনিয়াতে নেই। সত্যতার পাণ্ডারা সত্যমানবের অসন্তোষের নাম দিয়েছেন divine discontent—অর্থাৎ দিব্য অসন্তোষ। এ হচ্ছে সুখের লোভে সোয়াল্টির প্রতি অসন্তোষ। পৃথিবীর সব চাইতে সত্যদেশ ইউরোপে যুদ্ধের পর থেকে শুধু এই কথাই শোনা যাচ্ছে যে—“সুখের লাগিয়া

এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল”। এর থেকেই বোঝা যায় যে, সভ্যযুগে ভবের হাট হচ্ছে নিরানন্দ বাজার।

সভ্যতার আমরা সংজ্ঞা না দিতে পারলেও তাকে চিনিযে দিতে পারি। তার একটি লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এ কথা কে না জানে যে, কাগজের বাইরে সভ্যতা নেই।

কোন জাত কত লিখেছে বা লিখছে, তার হিসেব থেকেই আমরা সকল জাতের সভ্যতা অসভ্যতার তারতম্য নির্ণয় করি। এই দেখুন না কেন, আমরা বৈদিক যুগকে সভ্যতার আদি যুগ মনে করি, আর প্রাক্‌বৈদিক যুগকে অসভ্যতার শেষ যুগ। এ দুই পিঠোপিঠি যুগের আসল প্রভেদটা কি?—এই কি নয় যে, পরযুগের ঋক্বেদ বলে এক-খানি বই আছে, আর পূর্বযুগের প্রাক্‌বেদ বলে কোনো বই নেই?

সংবাদপত্রের প্রসাদে যত লেখা হয়, তত আর কিছুতেই হয় না, হতে পারে না। সুতরাং এ সত্য স্পষ্ট যে, সভ্যতার চরম যুগ হচ্ছে কাগজের যুগ। সংবাদপত্রই হচ্ছে সভ্যতার একাধারে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে যে সাধনা করে এসেছে, এখন বোঝা যাচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেই সকল মনোবৃত্তির চর্চা করা, যার ফলে সভ্যতার চরম অবস্থায় সে কাগজ লিখতে পারবে ও পড়তে পারবে। মানবসমাজ তার উন্নতির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। এর পরেই তার স্বর্গারোহণ—বকতে বকতে।

(২)

আমাদের দেশে সংবাদপত্র তাঁরাই এনেছেন, যাঁরা এদেশে সভ্যতা এনেছেন। কিন্তু পরের আনীত ও বিদেশ থেকে আনীত বলে, সংবাদপত্র যে এ দেশে টিকবে না—এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

গোল আলুও পরের দ্বারা আনীত ও বিদেশ থেকে আনীত, তাই বলে আলুর ফসল কি এদেশে কচুর চাইতে জোর ফলছে না? বরং এই কথাই কি সত্য নয় যে, এ যুগে আলুই হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রধান আহার? সংবাদপত্রও হয়ে উঠেছে তদনুরূপ আমাদের মনের প্রধান খোরাক। দেহের বলবীৰ্য্য আমরা যেমন আলুর কাছ থেকে সংগ্রহ করি, মনের বলবীৰ্য্যও আমরা তেমনি সংবাদপত্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করব,—যেমন সভ্য ইউরোপের লোক এখন করছে।

কাগজের আর একটি গুণ আছে—ও হচ্ছে মনের কাপড়। ম্যাঞ্জেফটারের ধুতি যেমন আমাদের দেহের নগ্নতা ঢেকে রাখে, খবরের কাগজও তেমনি আমাদের মনের নগ্নতা ঢেকে রাখে। আমরা যখন সভ্য হয়েছি, তখন ও আবরণ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। ভবিষ্যতে বড় জোর আমরা কাগজের খদ্দর বানাতে পারব। কিন্তু তারও টানা হবে বিলেতি ভাব, আর পোড়েন হবে দেশী ভাষা। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না; কেননা ভারতবর্ষের সভ্যতা চিরকালই দোসূতী।

সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি যাঁরা দেখতে পারেন না, এমন লোক এখনও পৃথিবীতে বিরল নয়। এঁরা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত—(১) সাহিত্যিক দল, (২) শাসনকর্তার দল।

সাহিত্যিক দলের ভয় যে, সংবাদপত্রের চাপে সাহিত্য মারা যাবে; যেমন কলের চাপে তাঁত মারা গিয়েছে। এই ব্যাপারকেই বাঙ্গলায় বলে চোর পাল্লালে বুদ্ধি বাড়ে। সাহিত্য যে মারা গিয়েছে, এ জ্ঞান কি সাহিত্যিকদের আজও হয় নি?—সে যাই হোক, তার দু'দিন যেতে দিন, দেখতে পাবেন যে, এই সাহিত্যিক শত্রুর দল সব সংবাদপত্রের

দলে ভক্তি হয়েছে। সাহিত্যে ফেল করলে লোকে যে সংবাদপত্রে প্রমোশন পায়, তার উদাহরণ আমি।

শাসনকর্তারা যে সংবাদপত্র ভালবাসেন না, তার কারণ পৃথিবীতে কাজের লোক কথা ভালবাসে না, বিশেষতঃ সে কথা যদি তাঁদের স্বেচ্ছামত কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। নূতন শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম কাজ হচ্ছে কাগজের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। ইটালীতে মুসোলীনি ও রুশিয়ায় লেনিন, উভয়েই নিজের মুখপত্র ছাড়া অপর সকল কাগজ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের দেশের স্মুখে মস্ত একটা ফাঁড়া আছে। যেদিন স্বরাজ হবে, সেদিন অনেক কাগজ চাপা পড়বে। কিন্তু সংবাদপত্র এ ফাঁড়াও কাটিয়ে উঠবে। যিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের গত একশ বৎসরের আইনকানূনের ইতিহাস জানেন, তিনি অবশ্যই জানেন যে, Press Act press-কে চাপতে পারে নি। যার পিছনে স্বয়ং প্রকৃতির ঠেলা আছে, কার সাধ্য রোধে তার গতি! প্রকৃতি অন্ধ বটে, কিন্তু বেজায় জোয়ান। আর যখন গতি মানেই উন্নতি, তখন সংবাদপত্রের উন্নতি অনিবার্য।

সুতরাং বর্তমান শাসক-সম্প্রদায় যতই কেন ছটফট করুন না— সংবাদপত্রের প্রসার ও প্রচার দিন দিন বেড়েই যাবে। সংক্ষেপে ও-বস্তু অচিরে কচুরিপানার মত বাঙলাদেশকে ছেয়ে ফেলবে।

(৩)

আমি যে অন্তরের সঙ্গে আপনাদের কাগজের আয়ুর্দ্ধির কামনা করছি, তার একটি বিশেষ কারণ আছে। এক বিষয়ে আমি ও “আনন্দবাজার” সমবস্তু ;—“আনন্দবাজার”ও কোন পার্টির মুখপত্র

নয়, আমিও কোন পার্টির মুখপাত্র নই। “আনন্দবাজার” No-changer, আর আমি Independent। No-changer যে No-party, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ সত্যকার পার্টি হচ্ছে all-changer।

এখন Independent নামক জীবটির পরিচয় দিই। সমাজে লোকে যেমন জাত হারালে বোষ্টম হয়,—পলিটিক্‌সে লোকে তেমনি জাত হারালে Independent হয়। আমরা জনকতক যে পলিটিকাল জাত হারিয়েছি, তার কারণ আমরা জাত রক্ষা করতে চেয়েছিলুম সনাতন পদ্ধতি অনুসারে—নতুন জিনিষ থেকে আলাগা হয়ে।

এখন যে আমার কোনও জাতে ঢুকতে পারছি নে, তার কারণ সব দলই বলেন যে, ভলান্টিয়ার হয়ে আমাদের দলে যোগ দাও—অর্থাৎ “ঘরের খেয়ে তুমি আমাদের হয়ে কাউন্সিলের মোষ তাড়াও।” উপরন্তু সকল দলই আমাকে দিয়ে স্বদলের গুণ গাওয়াতে চান, কিন্তু কেউই আমাকে নুন খাওয়াতে চান না। আমি অবশ্য নগদ বিদায়ের প্রার্থী নই। কিন্তু হয় ministerগিরি, নাহয় অস্তুতঃ কাউন্সিলের Presidentগিরির লোভটাও ত আমাকে দেখানো উচিত। কিন্তু সে লোভ আমাকে কেউ ভুলেও দেখান না। সখের সাহিত্যিক গুণাগিরি করবার যদি আমার প্রবৃত্তি থাকে, শক্তি থাকে, আর সেই সঙ্গে থাকে অবসর—তাহলে ভাল করে সে সখ মেটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, দলাদল নির্বিচারে সকলের উপর হাত চালানো।

এ কাজের মহাঃসুবিধা এই যে, এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। সকলের গায়ে হাত চালানো কারও গায়ে তা লাগবে না। কারণ সকল হচ্ছে সকল,—অর্থাৎ কেউ নয়। তা ছাড়া আমার হাত অত্যন্ত নরম, আর

পলিটিসিয়ানদের চামড়া স্বভাবতঃই পুরু। তবে এ দলের ভিতর এমন কেউ যদি থাকেন, যিনি কথার ফুলের ঘায়ে মুচ্ছা যান—তাহলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, তাঁর কুস্তির আখড়া রাজপথ নয়, পর্দার ও-পারে।

(৪)

এ যুগে কাগজ চালানো যে একটা ব্যবসা, তা সকলেই জানেন। কাগজের এই ব্যবসার দিকটে কি করে বড় করে তুলতে হয়, সে বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই; কারণ হাতে কলমে ও-ব্যবসা আমি কখনো চালাই নি—কারণ চালাতে পারি নি। তা ছাড়া ও বিদ্যে বাঙালী-লোকে আয়ত্ত্ব করতে পারবে না। মাড়োয়ারী ও-ব্যবসা যতদিন হাতে না নিচ্ছে, ততদিন মুদ্রাযন্ত্র টেকশাল হবে না। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, দেশী Northcliffe এখন গোকুলে বাড়ছে; আর বলা বাহুল্য যে, সে গোকুল হচ্ছে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। ইতিমধ্যে বাঙালী যদি মাড়োয়ারী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আমরা ইদানিস্তন যেরকম ইকন-মিক্স-গত-প্রাণ হয়ে উঠেছি, তাতে ভরসা হয় যে, আমরাও হয়ত এক-দিন সংবাদপত্রের circulationও gold currency-র মত ফুর্তিসে চালিয়ে দিতে পারব। জিনিষটে আসলে খুব সুসাধ্য। রূপোকে সোনা করতে পারলেই কেলা ফতে।

তবে একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। সংবাদ পত্রের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, press পুরোদস্তুর পেশাদার হবার পূর্বেও নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছিল। কি

উপায়ে?—বলছি। তিল কুড়িয়ে তাল করে। বারোমাসে গ্রাহকের উপর নির্ভর করলে ওর প্রচার দেশময় ছড়িয়ে পড়ে না। গ্রাহকের সংখ্যার চাইতে পাঠকের সংখ্যা যে ঢের বেশি, এ জ্ঞান আমাদের হওয়া চাই। পাঠক রাস্তায় রাস্তায় মেলে—গ্রাহক থাকে দূরে দূরে। কাগজ কাটাবার তাই শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নগদ বিক্রী। কাগজের hawker যে তার লেখকের চাইতে কম লোক নয়—এ জ্ঞানের উপর সংবাদপত্রের প্রাণ নির্ভর করে। লেখকরা পারে শুধু লিখতে, কিন্তু hawker-রা পারে তা পড়াতে। এর পর আমাদের কাগজ লেখবার পদ্ধতিও অনেকটা বদলাতে হবে। সভ্য পাঠক ভেবে পড়ে না, পড়েও ভাবে না। সভ্য-যুগ হচ্ছে নিশ্চিত যুগ; অতএব আমাদেরও না ভেবে এমন লেখা লিখতে হবে, যা পড়ে কেউ যেন না ভাবে।

(৫)

কাগজের প্রচার বৃদ্ধি করতে হলে, তার আগে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যতদিন দেশের বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর থাকবে, ততদিন কাগজের পাইকিরি ব্যবসা করা অসম্ভব। ইংরাজরা যাকে mass-press বলে—সে জিনিষ mass education-এর প্রশস্ত ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একটা উদাহরণ দিই। বাঙলা দেশে ইংরাজের চাইতে বাঙালীর সংখ্যা যে বেশী, এ কথা সবাই জানেন। আর এ কথাও সবাই জানেন যে, ইংরাজী কাগজ Statesman-এর কাটতি বাঙলা কাগজের কাটতির হাজার গুণ বেশী। এর কারণ ইংরাজসমাজে mass education আছে, বাঙালী সমাজে নেই। অতএব ছঁসিয়ার সংবাদপত্রকে লোকশিক্ষার

জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। বিলেতে লোক-শিক্ষা কাগজ-ওয়ালাদের চেষ্টামেচির ফলে compulsory হয়েছে। কারণ মানুষ লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হলে, খবরের কাগজ পড়তে বাধ্য হবে। অতএব এ বিষয়ে আপনাদের যে কি কর্তব্য, তা বলবার প্রয়োজন নেই। হিন্দীতে বলে, “আক্কেলীকো ইসারা ব্যসু”।

দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশের সংবাদপত্র তার স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। নইলে যে ডালে সে বসে আছে, সেই ডাল কাটতে সে চেষ্টা করত না, উঠতে বসতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ করত না। এ বিষয়ে অনেকে অন্ধ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার ফলে দলে দলে সুধু সংবাদপত্রের পাঠক সৃষ্টি হয়। আমরা যাকে উচ্চশিক্ষা বলি— তাও নামাস্তুরে লোকশিক্ষা। নিম্নশিক্ষা আর উচ্চশিক্ষার ভিতর প্রভেদ এইমাত্র যে, প্রাইমারিশিক্ষিত লোক সুধু বাঙলা পড়তে পারে, আর উচ্চশিক্ষিত লোক ইংরাজীও পড়তে পারে, কিন্তু তা লিখতে পারে না। এ কথা শুনে চমকে উঠবেন না। এঁরা অবশ্য ইংরাজীতে সংবাদপত্র লেখেন। কিন্তু যে ইংরাজী তাঁরা লেখেন, বিলিতী ইংরাজীর সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ, পালির সঙ্গে সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ। ও ভাষায় সুধু পলিটিকাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা যায়। সে বস্তু কি?—না সেই পলিটিকাল ধর্ম, যার আদর্শ হচ্ছে নির্বাণ।

বর্তমানের যুগ-ধর্ম হচ্ছে পলিটিক্স। এ যুগে ভগবানবুদ্ধ কিম্বা যিশুখৃষ্ট ধরাধামে অবতীর্ণ হলে তিনি যে সভ্য-সমাজে কল্কে পাবেন না, তা বলাই বাহুল্য,—যদি না তিনি তাঁর ধর্মের সঙ্গে পোনেরো আনা রাজধর্ম মেশান। আর সেই কেমিকাল ধর্মও আর মুণ্ডজটীলদের

মারফৎ প্রচার করতে পারবেন না। ঈশ্বরের “একজাত পুত্র” ষিশু-খৃষ্টকেও কাগজ বার করতে হবে, শাক্যরাজপুত্র বুদ্ধদেবকেও কাগজ বার করতে হবে। আর শাক্যসিংহকে লিখতে হবে মাগধী ইংরাজী। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সংবাদপত্রের একমাত্র কাজ হচ্ছে, মানবের অন্তর্নিহিত পলিটিক্সকে ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা। সকলেই জানেন যে, পঞ্চপ্রাণ মানে পঞ্চবায়ুঃ। আমাদের ভিতর যে পঞ্চপ্রাণ আছে, সে পঞ্চপ্রাণকেই এই ফুঁয়ের কাজে নিয়োজিত করতে হবে; আর সে ফুঁ কাগজের নলের ভিতর দিয়ে চালাতে হবে, নচেৎ তার জোর হবে না, ফুৎকার চীৎকারে পরিণত হবে না। সেকেলে ধর্মের সার কথা ছিল ওম্—অর্থাৎ নিঃশ্বাস ওরফে প্রাণবায়ু টানা। আর একালের ধর্মের সার কথা হয়েছে হুম্—অর্থাৎ নিঃশ্বাস ওরফে প্রাণবায়ু ছাড়া। সুতরাং যুগ-ধর্ম অনুসারে সংবাদপত্রকে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিতে হবে ওঙ্কারধ্বনিতে নয়—হুম্কারধ্বনিতে।

একালের এই যুগধর্ম-পলিটিক্সই সংবাদপত্রের জন্ম দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, পলিটিসিয়ান না থাকলে সংবাদপত্র বাঁচতে পারে না। সে কারণ পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্বন্ধ যে কি, তাও একটু জানা দরকার।

ইউরোপের গত একশ দেড়শ বছরের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় যে, সংবাদপত্র প্রথম আভিভূত হয়—পলিটিসিয়ানদের লাস্কুলস্বরূপে। তাই বহুদিন ধরে সে লাস্কুল পলিটিসিয়ানরা যে দিকে যে ভাবে আন্দোলিত ও আক্ষালিত করতেন, সে লাস্কুলও সেই দিকে সেই ভাবে সশব্দে আন্দোলিত ও আক্ষালিত হত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কাগজ পড়ে দেখুন, তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্ষুদে

ক্ষুদে অক্ষরে পলিটিসিয়ানদের বক্তৃতার রিপোর্টে ভরা। আর আমরা যাকে আর্টিকেল বলি, তাও ছিল ঐ সব বক্তৃতার টীকা ও ভাষ্য। এই বিরাট ভাষাসাহিত্যকে বিলেতের লোকে আজকাল Old Journalism বলে। আমাদের নূতন journalism আসলে বিলাতের সেই পুরোনো journalism.

কালক্রমে কাগজওয়ালারা যখন আবিষ্কার করলে যে, mass educationএর প্রসাদে পলিটিসিয়ানদের অপেক্ষা সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সামাজিক মনের উপর ঢের বেশী, তখনই জন্মাল new journalism.

পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে সংবাদপত্রের আজও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বজায় আছে। বদল হয়েছে এই যে, এখন সংবাদপত্র হয়েছে অঙ্গী, আর পলিটিসিয়ান হয়েছে তার অঙ্গ। সংক্ষেপে আগে the dog used to wag the tail, আর এখন the tail wags the dog.

পলিটিসিয়ানরা পূর্ব যুগে প্রমাণ করেছেন যে, কাজের চাইতে কথা বড়; আর কাগজওয়ালারা বর্তমান যুগে প্রমাণ করেছেন যে, কওয়া-কথার চাইতে লেখা-কথার শক্তি বেশী।

আমাদের সংবাদপত্রের উন্নতির পথও ওই। অবশ্য সংবাদপত্র যদি তার স্বহু সাব্যস্ত করতে চায়—তাহলে প্রথমে পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তার বিবাদ উপস্থিত হবে। কিন্তু তা'তে ভয় খেলে চলবে না। কারণ সংবাদপত্র আসলে বিসংবাদপত্র।

বীরবল।

দোল-পূর্ণিমায় ।

(১)

দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা

হৃদয় আকাশে ।

দোলফাগুনের চাঁদের আলোর

সুধায় মাখা সে ॥

কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে,

বচনহারা ধ্যানের পারে,

কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে

ছিল ঢাকা সে ।

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল

গোপন রেণুকা.

গন্ধে তারি ছন্দে মাতে

কবির বেণুকা ।

কোমল প্রাণের পাতে পাতে,

• লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে,

আমার গানের তানে তানে

রইল আঁকা সে ॥

(২)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে ।
দিলো তারে বনবীথি
পাখীর কাকলি-গীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙায় দিগন্ত ।
বাণী মম নিলো তুলি'
পলাশের ফুল-ধূলি,
এঁকে দিলো তোমার সীমন্ত ॥

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২ ।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।



দৌপালি সংঘ ।

(ঢাকা, নারীসভা ।)

আজ অনুভব করছি ঢাকা নগরী তার হৃদয়ের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করেছে, এই সঙ্গীতেই তার উপযুক্ত অভ্যর্থনা । যে অন্তর নিকেতনে মাধুর্যের ভাণ্ডার, সেইখানে সমাদর পাওয়াই কবির শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন ।

যাঁরা কর্মী, তাঁদেরই পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় আদর ; যাঁরা কোনো বড় প্রয়োজন সাধন করেছেন, পুরুষমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বড় পুরস্কার পান । কিন্তু আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে কোনো কর্মের প্রাপ্তিস্বীকার নেই । তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে, আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি —যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে, পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে । আজ মেয়েদের আনন্দধ্বনির মধ্যে যা' আমাকে পুরস্কৃত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরীশোধের কথা নেই । অশ্রু যে-কোনো আকারে উপকারের কাজ করি, তার জন্মে মজুরী দাবী করা চলে, তার জন্মে বাইরের দিক থেকে পারিতোষিক প্রত্যাশা করতে পারি । কিন্তু যদি কোনো কর্মের সহায়তা না করে'

কেবলমাত্র আনন্দের পাত্র ভরে দিয়ে থাকি—সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, রস দিয়ে,—তবে আনন্দই তার পুরস্কার।

সংসারে আনন্দভাণ্ডারের ভার ত মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্যের অমৃত মেয়েদেরই হৃদয়ে। তাদের স্নিগ্ধস্পর্শে জীবযাত্রার কঠোরতা ক্ষয় হয়, তাদের হাসি আর চোখের জলে দুঃখসস্তাপে শান্তি আনে, তাদের সেবায় ও নির্ভায় গৃহ কল্যাণে সৌন্দর্যে শোভিত হয়। এইজন্যে কবিকে পুরস্কার দেবার ভার ত তাদেরই, যে কবির কাজ হচ্ছে সংসারকে রসবর্ষণে শ্রীদান করা। যতদিন আমি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছি, অন্তরের মধ্যে এই আশ্বাস বারবার অনুভব করেছি যে, দেশের মেয়েদের কাছে আমার কবিতা পৌঁচেছে। পুরুষদের মধ্যে সহজে রসভোগের বাধা তাদের বিচার অভিমান, বুদ্ধির অহঙ্কার; বিদেশী সাহিত্যে নূতন অধিকারের উদ্ভেজনা তঁরা পুঁথিগত তুলনার সাহায্যে রসের যাচাই করতে বসে। কিন্তু যাচনদার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে আর পারে না। সহজ আনন্দ অনুভব করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই কাব্যের রসটিকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নেয়। শিক্ষার দ্বারা নানা সাহিত্যে প্রশস্ত অধিকারের দ্বারা সেই শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, এ কথা সত্য; কিন্তু যেখানে স্বভাবত সেই শক্তির দৈন্য, অথচ বইপড়া শিক্ষার দ্বারা সাহিত্য বিচাররীতির একটা বাহ্য কাঠামো হাতে এসেছে, সেইখানেই দুর্বিপাক, সেইখানেই সাহিত্যরাজ্যে মত্তহস্তী পদ্মবন দলুতে আসে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হয় নি বটে, কিন্তু তাদের চিন্তের মধ্যে সহজবোধের ঐশ্বর্য আছে। সেই কারণে আমার এই অহঙ্কারটুকু সত্য হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ

করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহিত্য মেয়েদের কাছে এই যে আতিথ্য পায়, এটি বিশেষ মূল্যবান। মেয়েদের আনন্দ পুরুষের শক্তির উদ্বোধন।

মাধুর্য্যই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুর হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুর হাতের পদ্মই তাকে পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে পুরুষের নানা প্রকার উদ্যম দেখতে পাই, সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারীচিত্তের প্রবর্তনা আছে। সেখানে হাওয়ার মধ্যে একটা উৎসাহ নারীর মন থেকে প্রবাহিত হয়ে পুরুষের সাধনাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। যে সমাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যবীর্য্যে কর্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের জোরে মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোঁটায়, ফল ফলায়—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকাশের আলোয়, বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে। প্রাণলক্ষ্মীর এই দিব্য দূতগুলি অলক্ষ্য আকারে অশ্রুত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে। তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অনুপ্রাণনা পুরুষের শক্তিকে তেজ জোগাবার সেই অলক্ষ্য দূত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে। এখনকার মনোবিজ্ঞান যেমন বলে যে, মনের গূঢ়চেতন লোকে আমাদের মর্ম্ম উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস; আমাদের দেশ তেমনি করেই বলেছে পুরুষের

উচ্চমের দ্বারা গোচরে যে কাজ হয়, অগোচরে তার শক্তিকে সচেষ্টি করে রাখে নারীপ্রকৃতি ।

কালে কালে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কক্ষক্ষেত্রে নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয় । তখন পুরাতন অভ্যাসের জায়গায় নূতন উৎসাহের দরকার হয় । নূতন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিত পথের দুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায়, মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি, —তাদের শাস্তি জীবন্মৃত্যু । একদিন আমরা ভারতবর্ষে আত্মীয় সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে নিবিড় নিবন্ধ একটি সমাজ পারিবারিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলাম । তাই আমাদের সংহিতাকাররা বলেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ । তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন । সেদিন ভারতবর্ষের এই গৃহধর্ম্ম-মূলক সভ্যতা ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল । তখন স্বভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই সাজিয়েছে, গৃহকে তারা সুন্দর করেছিল, পূর্ণ করেছিল । কিন্তু যে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেঙে গেছে । আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে । সে ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান । আজ আমাদের আশ্রয় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয় । আজ সমস্ত পুরাতন বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ৰিপ্ত করে দিচ্ছে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে । সেই বিক্ৰেপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে নূতন ব্যবস্থায় । এই বাঁচাবার

ভার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়ে-দের। যে নূতন উৎসাহে নূতন যুগের সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকে মিরস্তুর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নূতন দিন আজ এসেছে। এদিন পূর্বের কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঞ্জে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী, তাঁরাও সর্বমানবের মুক্তিদানত্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য এশিয়ার মরুবালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রীদূতদের পদ-চিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণসাধনার প্রাচীন বার্তা; আজ আমাদের পরম অর্গোরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম যেদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির পায়ের কাছে বসে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করচে। রাত্রে দেখি পূর্বকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিজ্রমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপমোচনের প্রার্থনা করচে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলে' ভক্তি করেছে। সেদিনকার বিশ্বযজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে? অমৃতের পাত্র কি কখনো নিঃশেষে রিক্ত হয়? গৃহপরিধির বাইরে আজ আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করা চাই। বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ দ্বার উন্মুক্ত, সর্বত্র যাবার পথ অব্যাহত, আজ সেখানে আমরা কি নিয়ে যাব? যারা বণিক তাবা পণ্য নিয়ে যায়, যারা দস্যু তারা লুণ্ঠ করবার অস্ত্র নিয়ে

ছোট্টে, যারা জ্ঞানতাপস তারা আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে। ভারতের লোক কি কেবল এই বলেই যাবে যে, আমরা পনের বুলি সংগ্রহ করতে এসেছি, আমরা অজ্ঞান, আমরা অশক্ত, আমরা অকিঞ্চন? তা নয়, এই বলতে হবে আমাদের গুরুর মুখ থেকে আমরা অমৃতবাণী এনেছি। সেই কথা বলবার শুভ সময়কে তোমরা শ্রদ্ধার দ্বারা পুণ্যময় কর। বাহির পৃথিবী থেকে অতিথি আসবে— তোমরা কল্যাণশঙ্খ বাজাও, তাদের বল, তোমরা শাস্ত হও, সাস্ত্রনা লাভ কর, তোমাদের ক্ষতবেদনা দূর হোক।

ভারতবর্ষ আতিথ্যকে বড় ধর্ম বলেছে, কেননা আতিথ্যের দ্বারাই বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য—সে যে খুব বড়, তাকে অল্পপরিধির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। খাঁচার মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, তাতেই ত পাখীর ডানার সম্পূর্ণ সার্থকতা মেলে না। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের হাওয়ার যোগসাধন করলে তবে ঘরের হাওয়ার কলুষ দূর হয়। অতিথি গৃহীকে গৃহকর্মের একান্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে আসেন। এইজন্মে অতিথিকে দেবতা বলা হয়েছে, কেননা দেবতাই বড়র সঙ্গে যোগের দ্বারা ছোট্টকে উদ্ধার করে।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্তবস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করছি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্মসাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি। এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে। এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্তনা, তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে। আজ তোমরা

তোমাদের কবিকে অভিনন্দন করচ, তার মধ্যে যদি তোমাদের এই কথাটির থাকে যে, “যাও বাহিরে, বিশ্বকে আহ্বান কর”—তাহলে আমি ধন্য হ’ব। সমুদ্রের পরপারে আমার নিমন্ত্রণ আছে; যদি শরীর নিতান্ত অক্ষম না হয়, তাহলে অল্প কয়েকদিন পরে যাব। সেই যাবার আগে তোমাদের কণ্ঠ থেকে আজ যেন এই কথা শুন্তে পাই যে, “যাও, ভারতের বাণীকে সমুদ্রপারে বহন করে নিয়ে যাও।”

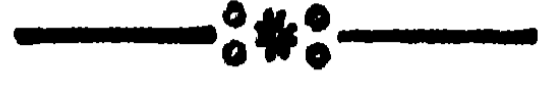
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

किमाश्चर्यमतःपरम् ।



महाभारतेर एकटि श्लोके आछे :-

“अहन्त्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतःपरम् ।”

अन्वार्थ :- प्रतिदिन जीवगण यममन्दिरे याछे, किन्तु अवशिष्ट यारा वर्तमान थाकचे तारा भावचे तारा अमर; ए अपेक्षा आर आश्चर्येयार विषय कि आछे ?

कथागुलि महाभारतेर वनपर्वे पाण्डुपुत्र वकरूपी धर्म्येयार प्रश्नेर उत्तरे बलेछिलेन । स्वयं धर्म्यराजइ यथन उत्तरटी यथायथ बले मेने नयेछिलेन, तथन कथागुलि ठिकइ बलते हवे । किन्तु वर्तमान युगेओ यदि धर्म्यपुत्र युधिष्ठिरेर वर्तमान थाका संभव ह'त, ताह'ले तिनि महाभारतेर परवर्ती संस्करणे निश्चयइ कथागुलि परिवर्तित ओ परिवर्द्धित क'रे बलतेन, मानुष प्रतिदिन मानुषेयार दुःखभार दूर करवार नव नव उन्नततर जीवन-यात्राप्रणाली बेर कछे, किन्तु यदिओ तार दुःखभार प्रतिदिन नव नव रूप धारण क'रे वेडेइ चलेचे, तथापि अनसुकाल धरे' तार एइ नवतर पन्था उद्भावनचेष्टार विराम नेइ—एर चाइते आश्चर्येयार विषय आर कि आछे ?

सेइ स्मरणातीत आदिम युग थेके आरम्भ करे' मानुष कतवार, कतभावने, कतरकमे चेष्टा करले, मानुषके अङ्ककार ह'ते आनोते नये यावार जन्म, बन्धन ह'ते मुक्तिते नये यावार जन्म, सकीर्ण

বিভিন্নতা হ'তে সাম্য-মৈত্রীর দিকে নিয়ে যাবার জন্ম। কিন্তু কে বলতে পারে তার চেফটা সত্যিই সার্থক হয়েছে? কে বলতে পারে তার দুঃখ-দৈন্য-বন্ধন-অন্ধ সঙ্কীর্ণতা এক তিল কমেচে? আর তা' যাচাই করবার নিকষ-পাথরই বা কোথায়? একদিকে যদি বা এতটুকু কমেচে মনে হচ্ছে, অপরদিকে যে তার দশ গুণ বেড়ে গিয়েচে দেখতে পাচ্ছি; একদিকের বাঁধন যদিবা একটু আল্লা হয়েছে, অন্যদিকে যে তার বিশ গুণ অঁট পড়ে' গিয়েচে। কিন্তু তথাপি মানুষের কি বিরাম আছে, নিত্য নিত্য এই উন্নততর জীবন-যাত্রা প্রণালী উদ্ভাবন করবার? না অন্ত আছে তার বিশ্বাসের যে, বক্ষ্যমান পন্থাই তার শ্রেষ্ঠ পন্থা?—কত অবতার, কত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, কত প্রচারক, কত দার্শনিক, কত যুগপ্রবর্তক আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরের বাণী নিয়ে। তাঁদের আশার বাণী, মুক্তির আহ্বান শুনে এই কোটি মানবসম্মান কতবার আনন্দোল্লাসে মেতে উঠল। ইঙ্গিতমাত্র কত কৃচ্ছ্রসাধনা, কত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কত স্বজনশোণিত পাত যে করলে, তার কি ইয়ত্তা আছে? ইষা, মুষা, বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্ফিউসিয়াস, মহম্মদ, রামমোহন—কত মহাপুরুষ এসেছিলেন এই মানবকে মুক্ত করতে, মানবের চিরন্তন দুঃখভার দূর ক'রে তাকে অসীম আনন্দ দান করতে; কিন্তু কোথায় তাঁরা আজ? সেই এক সনাতন উত্তর—‘যে অসীম অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হ'তে তাঁরা এসেছিলেন, সেই অন্ধকারের গহ্বরেই আবার সকলে ফিরে গিয়েছেন।’ আর এই হতভাগ্য মানবসম্মান?—সে যে শুধু যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল, তা' নয়; পরন্তু তাঁদেরই বিধান মাথায় করে' নব উৎসাহে নব উল্লাসে শুরু করলে এই অন্তহীন আত্মহনন, এই নৃশংস স্বজন

পীড়ন। ইতিহাস ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে আজ সেই সব মতবাদ প্রতিষ্ঠাব্যাপদেশে মানুষের জিঘাংসাবৃত্তির নিষ্ঠুরলীলার কাহিনী বহন করে'।

সৃষ্টির সেই মহারাজ বিশ্ব-বিধাতা এই চির-অবনত দুর্ভাগা মানব সন্তানের পরিত্রাণের জন্য যে সব মহাত্মাদের প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের সেই মহাবাণী লক্ষ্য করে' যে কত লক্ষ লক্ষ লোক শোণিত তর্পণ করেছে, তা'ত আমরা ভুলতে পারিনি। হায়রে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা! এই কাঞ্চনযুগের অশুসন্ধানে কত দারুণ অসাম্য, কত নিদারুণ বৈরতা, কত নিষ্ঠুর বন্ধনই যে সৃষ্ট হয়েছে, বোধকরি স্বয়ং বিধাতাও তা' মনে ক'রে রাখতে পারেন নি। এক একবার এই মহামন্ডের ভূমিকম্প পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে চলে গিয়েচে, আর শত শত জাতি, শত শত সাম্রাজ্যসৌধ চুরমার হ'য়ে পড়েচে—ধরিত্রী আপন সন্তানের শোণিতে স্নান করে উঠেচে। যেদিন বাঙ্কার শৈল শিখরে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিজনবিষাগ প্রথম বেজে উঠল, সেদিন মানুষ যে কি আশা, কি আকাঙ্ক্ষা, কি আনন্দে নৃত্য করে উঠেছিল, কারোর কাছেই তা অবিদিত নেই; এবং আজ আমরা সকলেই যে কি সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুশীতল ছায়াতলে কালযাপন করছি, এ কথাও বোধ করি কাউকে বলতে হবে না। তবুও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটুটি আমরা সেই যুগতৃষ্ণিকার হাতছানি লক্ষ্য করে'।

দশহাজার বছর পূর্বে যখন আমরা ককেসস্ পাহাড়তলী থেকে প্রথম শুভ্র সত্যতার আদর্শ নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তখনও বলতে ছাড়িনি—আমরা যা এনেছি, তাই মানবজীবনের উন্নতির চরম আদর্শ; এবং মানুষকে লাঠি মেরে বোকাতেও ছাড়িনি—আমাদের আদর্শই

শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আবার হাজার বৎসর পর সেই আমরাই বলেছি, “মা না, ও যা বলেছি ও ঠিক নয়। সুখের পথ, আনন্দের পথ ও নয়।” তখনও কি কম মনীষা, কম শক্তি আমরা ব্যয় করেছি জগৎকে বোঝাতে যে, প্রাচীরের জীর্ণ নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে মুক্তির নব আহ্বান, আনন্দের নব আশ্বাদ লাভ করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য? কিন্তু সেই চরম লক্ষ্য লক্ষ্য ক’রে যে নব আদর্শের বাণী আমরা প্রচার করলাম, কৈ দু’দিনত আমরা সে কথা মেনে চলতে পারলাম না। এরি মধ্যে যে আবার বলতে শুরু করেছি :—

“Ye wanderers that were my sires,

* * * * *

Why did you leave for garth and town
Your life by heath and river’s brink,
Why lay your gipsy freedom down,
And doom your child to Pen and Ink” ?

কত যত্নে কত প্রাণপাত ক’রে গড়া ইমারৎ যে সব আবার ভাঙতে বসেচি ; আবার যে তারস্বরে প্রচার করতে আরম্ভ করেছি—ফেরো ফেরো ফেরো, সুখের পথ ও নয়, আনন্দের পথ ও নয়।

জীববিশেষের গলায় চামড়ার বন্ধনী বেঁধে দিয়ে যেমন তাকে আভিজাত্যের ছাপ দেওয়া হয়, তেমনি ‘সিভিলিজেশনের’ (Civilization) ছাপ এঁটে দিয়ে মানুষের মধ্যে আমরা যে একটা উৎকট ব্যবধান সৃষ্টি করেছি, তার মূলেও ত আমাদের সনাতন প্রচেষ্টাই প্রকটিত। এই সিভিলিজেশনের এক একটা বন্ডা যখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, আমরা এমনি অভিভূত হ’য়ে পড়েছি যে, যুগ যুগ ধরে তারই ছাঁকারে প্রতিধ্বনি করে’ জপেছি, “নাশ্যপন্থা বিচ্যুতেহয়নায়,

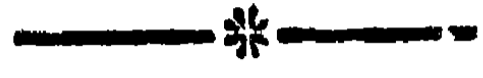
নাশ্যপশ্চা বিদ্যতেহয়নায়” । কিন্তু অয়নায় পশ্চা যে অস্তি, তাও আমাদের বৃদ্ধিতে বেশী দেবী হয় নি । কারণ যাকে ‘সিভিলিজেসন’ বলে’ শতবর্ষ ধ’রে কীর্তন করে এলাম, দু’দিন পরে তাকে হীন “বার্বারিজম্” বলতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করলাম না ।

তারপর ‘সোস্যালিজম্,’ ‘ইন্ডিভিজুয়্যালিজম্,’ ‘কমিউনিজম্’ প্রভৃতি কত মূর্তিতে যে মানুষের সেই অক্লান্ত প্রচেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোধান হয়েছে এবং অদ্যপি হচ্ছে, তা’ ভাবলে স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বিস্মিত না হ’য়ে পারেন না । কত নিখিল মঙ্গলবিধায়িনী সন্মিলনী, কত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠামূলক সমিতি, কত আন্তর্জাতিক শান্তিসভার প্রতিষ্ঠান হল, যার প্রত্যেকটির মূলমন্ত্র ছিল নিখিল মানবের সুখশান্তি বিধান করবার নবতর পশ্চা উদ্ভাবন । কিন্তু এই সভ্যতার আদর্শ যুগে দাঁড়িয়েও কি আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সেই সুখের অদৃশ্য তটভূমির দিকে আমরা এক পাও বেশি এগিয়েছি ?

সেই অখণ্ড সুখরাজ্যজয়ের দুর্ব্বার তাড়নায়, এই অফুরন্ত মানবের অপ্রমেয় শক্তি নিয়ে আমরা পৃথিবীর বুকে যে অঘটন ঘটিয়েছি, তা’ ভাবলে সত্যিই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয় । কিন্তু যদিচ সে স্বর্গরাজ্যের সৌম্যরেখা এখনও আমাদের দিগ্বলয়ের পরপারেই রয়ে গিয়েছে, এবং যদিচ “It may be we shall touch the Happy Isles” ছাড়া অন্য কথা বলবার আমাদের গ্ৰাঘ্য অধিকার নেই, তথাপি কি অস্ত আছে, প্রতিদিন এই মুক্তি ও সুখসাধনের নবতর প্রণালী উদ্ভাবন চেষ্টার ? তাই ধর্মপুত্রের বাক্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছা হয়—
কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ !

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার ।

“ভূতের কথা” ।



আজ যে ‘ভূতের’ কথা বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি, সে অশ্বথ কি তাল গাছের ভূত নয় ; শ্মশানে মশানে যে ‘ভূত’ বিচরণ করে, তাহাও নয় । তবে আবার কোন্ ভূতের কথা বলিব ? যাহা ‘ভূত’, যাহা ‘অতীত’, যাহা কাল-সাগরে লীন, তাহারই কথা । তবে কি মনে করেন যে, আমি রাতারাতি একটা প্রকাণ্ড প্রভুতাত্ত্বিক হইয়া পড়িলাম ? তাহাও নয় । সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা হইতে এই প্রভুতাত্ত্বিক রোগে অভিভূত, বা ‘ভূতপ্রাপ্ত’ রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয় — এমন কি “সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায়” ‘ভূতের’ কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় স্থানই পায় না । পণ্ডিতস্বৰ্গ বান্ধিগণের পক্ষে ত প্রভুতত্ত্ব অবশ্য অনুশীলনীয় ও অনুসন্ধেয় । ইতিহাস, পুরাণ, কিম্বদন্তি প্রভৃতির আলোচনার সুখও আছে, লাভও আছে । নানা উপাদানে, কল্পনার সাহায্যে একটা অতীত জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বাস করা কম আনন্দদায়ক নয় । তারপরে, বর্তমানকে যখন অতীতই নিয়মিত করিতেছে, তখন অতীতের আলোচনা লাভজনকই বা হইবে না কেন ? কোনো জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির কথা জানিতে হইলে, কি তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কিছু কল্পনা করিতে হইলেই, তাহার অতীত ইতিহাস ইত্যাদির আলোচনা বা অধ্যয়ন আবশ্যিক । অতীত বা ‘ভূত’কে স্মরণে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না । কিন্তু অতিরিক্ত

মাত্রায় ‘ভূতের’ বিষয় আলোচনা করিলে, বা শুধু ‘ভূত’ লইয়া ব্যাপ্ত থাকিলে যে আশ্রয়কে ‘ভূত’ পায়, এবং শেষে “রোমা”র পক্ষেও সে ভূত ছাড়ানো কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। ‘স্বর্ণযুগ’, ‘সত্যযুগ’, ‘বীরযুগ’ (Golden Age, Heroic Age, &c.) সমস্তই অতীতে বা ‘ভূতে’ সংস্থাপিত। কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে বা পুরাণে ভবিষ্যতে ঠিক স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ না হোক—কল্পান্তে ‘নবীন জগৎ’ ‘নবীন ভাব’ ‘নব রহস্যের’ (millennium) উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু ‘ভূতে’র প্রতি ঝাঁকটাই যেন বেশী।

যুগ বিভাগ বা বর্ষ-বিভাগ নেহাৎ কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক নয়। ভূতবিদেরা পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিভিন্ন যুগের চিহ্ন দেখিয়া থাকেন; তাহা হইতেই ‘প্রস্তর যুগ’, ‘লৌহ-যুগ’ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মানব-সভ্যতার যুগ-বিভাগ করিয়া থাকেন, এবং পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাবের পূর্বেও যে সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ, কি খনিজ পদার্থ ছিল, তাহারও কাল ও যুগ বিভাগ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান ‘ভূতে’ কখনও বিশ্বাসবান্ নহেন। ক্রম-বিকাশ বা বিবর্তবাদীরা ভবিষ্যতেই স্বর্ণ-যুগের কল্পনা করেন—তাহাদের মতে অতিমানুষ বা দেবতারা ভবিষ্যতেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন; ‘ভূতে’ তাহারা দেখেন শুধু সেই ‘মহাভূত’ সমাধি,—তাহা পাঁচটিই হোক বা চৌষটি কি ততোধিকই হোক।

সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তদ্বিপরীত। বাইবেলে আদি-সৃষ্টি নর-দম্পতি নিষিদ্ধ ফলভক্ষণের পূর্বে ছিলেন ‘অপাপ-বিদ্ধ’, তৎপরে ক্রমশঃ পাপভারাক্রান্ত হইয়া বংশানুক্রমে পাপপ্রলোভন জগতে সংক্রামিত করিয়াছেন।

অবশ্য পুনরুত্থানের (Resurrection) দিনে ত্রাণকর্তা যিশুর কৃপায় সে পাপভার আবার বিমোচন হইবে, এ প্রকার আশার বাণী তাহাতে পাওয়া যায়; তবে সে আশা কবে যে পূরণ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

আমাদের দেশে ত আমরা ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই কয়েকটি যুগ-বিভাগ করিয়া, কল্পনানেত্রে মানবের অধঃপতনের ইতিহাস ও ছবিই বিলোকন করি। সত্য-যুগে—পুণ্যং পূর্ণং, পাপং নাস্তি, পুঙ্করনামতীর্থং, মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ, ইচ্ছামৃত্যুঃ, একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, লক্ষবর্ষ পরমাযুঃ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভোজন-পাত্রং। আর সেই সত্যযুগের লক্ষণ হইতেছে—সত্যধর্ম্মরতো নিত্যং, তীর্থানাঞ্চ সদাশ্রয়াঃ, নন্দন্তি দেবতাঃ সর্বাঃ, সত্যোমতাপরানরাঃ। সুতরাং আমাদের Superman বা অতিমানুষ ছিলেন সেই সুদূর অতীতে বা সত্য-যুগে। আর আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ ক্রমশঃ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্রকায়, অস্বাস্থ্যঃ, পাপরত মনুষ্যাধমে পরিণত হইয়াছি এবং হইতেছি। কলিকালে—পুণ্যমেকপাদং, পাপং ত্রিপাদং, সার্কিত্রিহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, বিংশত্যধিক শতবর্ষ পরমাযুঃ। আর সেই কলিকালের লক্ষণ হইতেছে—ধর্ম্মঃ সংকুচিতস্তপোবিচলিতঃ, সত্যঞ্চ দূরেগতং, ক্ষৌণী মন্দফলা, নৃপাশ্চ কুটীলাঃ, শাস্ত্রেতরা ভ্রাক্ষণাঃ, লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ, স্ত্রিয়োপি চপলাঃ, পার্শ্বানুরক্তজনাঃ, সাধু সীদতি, দুর্জনঃ প্রভবতি, প্রায়ঃ প্রবৃন্তে কলৌ। সত্যযুগের ছবি ও কলিযুগের ছবি তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, আমরা অতীতে কেন এত শ্রদ্ধাবান্। মহানির্বাণ তন্ত্রেও কলিকালের কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ আছে, যথা :—

যদা তু শ্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ,
ভবিষ্যন্তি শিবে শাস্তে, তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ।
যদা দ্বিত্বাঃ অতিদুর্দাস্তাঃ কর্কশাঃ কলহেরতাঃ
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্তারং, তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥

ইত্যাদি—

বর্তমানে অসন্তোষ মানবচরিত্রের একটি বিশেষত্ব। এই অসন্তোষই মানবের ক্রমোন্নতির একটি প্রধান কারণ, এবং ইহাই আবার কোন কোন জাতির পক্ষে অধোগতিরও কারণ বটে। আমরা ‘কলির জীব’, সুতরাং আমাদের অধোগতি অনিবার্য। আবার প্রলয়াস্তে যখন সত্যযুগোৎপত্তি হইবে, তখন হয়ত আমাদের সৌভাগ্যসূর্যের রশ্মিপাতে এই ভারত-ভূমি আলোকিত হইবে, কিন্তু প্রলয়কালপর্যন্ত আমরা ‘যে তিমিরে সে তিমিরে’। কোন জাতির পক্ষে ‘ভূতে’ বা অতীতে অতিশ্রদ্ধা বা অস্বাভাবিক প্রীতি, জাতীয় জীবনগঠনের পক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহাই বিশেষভাবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাসলেখক মহামতি বাকল ভারতের অতীতে বা ভূতে অতিশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।—

Of all the various ways in which the imagination has distorted truth, there is none that has worked so much harm as an exaggerated respect for past ages. This reverence for antiquity is repugnant to every maxim of reason, and is merely the indulgence of a poetic sentiment, in favour of the remote and unknown.

কল্পনা সত্যকে যতপ্রকার উপায়ে বিকৃতি করিতে পারে, তন্মধ্যে অতীত যুগের প্রতি অতিশ্রদ্ধা যে পরিমাণে অনিষ্ট করিয়াছে, তেমনটি আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। আর এই প্রাচীনকালের প্রতি ভক্তি, বিজ্ঞানের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার বিরোধী এবং সুধু “সুদূর ও অজ্ঞাতের” প্রতি কবিকল্পনার আসক্তি বই আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহার বঙ্গানুবাদ এই প্রকার হইতে পারে :—

“ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেও কল্পনার অপ্রতিহত প্রভুত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সর্ব প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, গদ্যরচনার প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ ছিল না। উৎকৃষ্ট লেখকগণ প্রায় সকলেই, জাতীয় চিন্তা প্রণালীর অনুকূল বলিয়া, পদ্যরচনায় অবহিত ছিলেন। ব্যাকরণ, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, ভূগোল, দর্শন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ গ্রন্থই পদ্যে লিখিত এবং নিয়মিত ছন্দে গ্রথিত।

ভারতীয় সাহিত্যের এই বিশেষত্ব যে কেবল বাহ্য আকারেই প্রকটিত তাহা নয়—তাহার মূল প্রকৃতিতেও সেই বিশেষত্ব পরিষ্কৃত। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে দূরে রাখাই যেন সে সাহিত্যের প্রকৃতি, ইহা বলিলে অত্যাুক্তি হইবে না। কল্পনার বাহুল্য ব্যাধিতে পরিণত, এবং প্রত্যেক বিষয়েই তাহার তাণ্ডল-লীলা।

ইহা হইতেই কবিদিগের প্রাচীন ‘সুখযুগের’ কল্পনা! সে যুগে মহাশাস্ত্র বিরাজমান, নীচ প্রবৃত্তি প্রশমিত এবং পাপ দূরে গত। ইহা হইতেই ধর্মতত্ত্ববিদগণের মনুষ্যজাতির আদিম সরলতায় ও পুণ্যে এবং পরে সেই উচ্চাবস্থা হইতে অধোগতিতে বিশ্বাস। ইহা হইতেই,

প্রাচীনকালে মানব সুধু ধান্মিক ও সুখী ছিল তাহা নয়, তাহার শারীরিক গঠনও শ্রেষ্ঠ ছিল, সে দীর্ঘবপু ও দীর্ঘায়ু ছিল—আমাদের শ্রায় দুর্বল ও অধঃপতিত মানবের সেই আয়ু এবং দৈহিক দৈর্ঘ্যলাভ অসম্ভব—এইপ্রকার বিশ্বাসের উৎপত্তি।” আমাদের পূর্ববর্ণিত যুগ-বিভাগ মহামতি বাকলের উক্তি সর্বতোভাবে সমর্থন করিতেছে।

আজকাল আমরা আমাদের বর্তমান জাতীয় অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সমস্ত কারণ নির্ণীত না হইলে, তাহা পরিহার করিতে বা তাহার প্রতিকার করিতে সক্ষম হইব না। আমরা আবার জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ও গণ্যমান্য জাতিতে পরিণত হইব—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং আমাদের বর্তমান ব্যাধি ও তৎপ্রতিকারের বিষয় চিন্তা করিতেই হইবে। এক দিকে যেমন আমাদের প্রাচীন গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল আনয়ন করিব, অপরদিকে যাহাতে ভবিষ্যৎ আশার অরুণালোকে আমাদের হৃদয় উৎভাসিত হইয়া উঠে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। একটি বালককে অহর্নিশি ‘মন্দ’ বলিলে সে ‘মন্দ’ হইয়াই উঠিবে; আর যদি তাহার ক্রটি দেখাইয়াও দুইটা আশার বাণী শুনানো যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই একদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। “প্রাচীনকালে যাহা ছিল তাহাই ভাল—বর্তমান সুধুই সেই প্রাচীন কালের আবর্জনা”—ইহা যে জাতি ভাবে, তাহার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তমসাচ্ছন্ন। দিবাবসানে রাত্রি হয়, কিন্তু রাত্রির অবসানের অপেক্ষা করিতে পারিলেই আবার সেই উষার অরুণালোক এবং ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন তপনের তীব্র দীপ্তি পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞানবাদী ও প্রাচীন শাস্ত্রবাদীদিগের বিরোধ, সনাতন শাস্ত্র-

বাদীদিগের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, ও বিজ্ঞানবাদীদিগের ভবিষ্যতে আশা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ডারুইন্ ও ওয়ালেছের ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত-বাদ যখন যুরোপে প্রচারিত হইল, তখনই সমস্ত ধর্মযাজকেরা উদ্ভূত-দণ্ড হইলেন। কোথায় সেই ধর্মশাস্ত্র কথিত, সারল্যে ও সাধুতায় বিমণ্ডিত মানবদম্পতি হইতে লোক সমূহের উৎপত্তি, আর কোথায় মনুষ্যাকৃতি মর্কট (anthropoid ape) হইতে বর্তমান সুসভ্য জাতি সমূহের ক্রম-বিবর্তন! মর্কট ত দূরের কথা, অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য পূর্বপুরুষ হইতে মানবের বর্তমান সভ্যতা বিবর্তিত, ইহা স্বীকার করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত। কিন্তু উন্নতিশীল যুরোপে সহজেই বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং সেই মত অবলম্বন করিয়া আবার কেহ কেহ ভবিষ্যৎ অতি-মানুষের কল্পনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে যে অধঃপতনের দৃষ্টান্ত নাই, তাহা নয়। জড়জগতেও সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক উদ্ভিদ ও জীব জন্তুর কিছুকাল উন্নতি হইয়া পরে অধোগতি হইতে থাকে, বা উন্নতির বেগ প্রতিহত হয়। নৈসর্গিক কারণসম্বায়েই এ অবস্থা ঘটে। কিন্তু উন্নতি-কামী মানবের সে অবস্থা ঘটিলে চলিবে কেন?

প্রাচীন অনেক সভ্যজাতির অধোগতি হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, এবং ইতিহাসও তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যে জাতি আবার 'নবজীবন' লাভ করিতে চায়, তাহার পক্ষে নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নবীন উদ্যমের আবশ্যিক। 'ভূতে' শ্রদ্ধাবান হইতে হয়—হও, কিন্তু ভবিষ্যতে আশা স্থাপন কর; নচেৎ শোকে ও নিরাশাসাগরে মগ্ন হইয়া, কুল পাওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে

দূরীভূত হইবে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধায় যদি ভবিষ্যতের আশার বীজ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তবেই না উন্নতির সম্ভাবনা। যে জাতির ইতিহাস নাই, যে জাতির অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি একেবারেই নাই, তাহার উন্নতির সম্ভাবনাও যেমন সুদূরপর্যায়ত; আবার যে জাতি কেবল অতিশ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া ভবিষ্যৎ আশা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে জাতির পক্ষেও উন্নতির আশা তদ্রূপ সুদূরপর্যায়ত।

মহামতি বাকলের কথা লইয়া ইত্যাকার আলোচনা করিতে করিতে, ভারত-গৌরব, ঋষি-কল্প, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বর্তমান সভাপতি, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ স্মর্ জগদীশচন্দ্র সেদিন তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিতেছেন :—

“যে মুমূর্ষু, সেইত মৃত-বস্তু লইয়া আগ্লাইয়া থাকে; যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্লাবিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবল পুরাতন গ্রন্থপ্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি ‘জীবন্ত সাহিত্য’ গঠিত করিয়া তুলিবে।”

এই আশার বাণী লইয়া বৈজ্ঞানিক অক্লান্তদেহে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। আশা ভবিষ্যতে, কার্য্য বর্তমানে, শ্রদ্ধা অতীতে।

সেই শ্রদ্ধা অতি-শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া যদি বর্তমানের কার্যকারিণী শক্তিকে পরাভব করে, এবং ভবিষ্যতের আশালোককে ক্ষীণ বা পরিম্লান করে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে,—

“ভূতে পশ্যন্তি বর্ষরাঃ ॥”

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত ।



সোনার তরী ।

—[***]—

সোনার তরী কবির ত্রিশ হইতে বত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা । ইহার অনেকগুলি কবিতাতেই প্রতীক্ষিতাবে নদীর প্রভাব আছে । ইহার পদ্মা বর্ষার পদ্মা । প্রথম বর্ষাসমাগমে নদী ছাপাইয়া উদ্বেল আনন্দে আপনাকে লইয়া আপনি মত্ত হইয়া ওঠে, তাহার তীরের বন্ধন যে আছে বারে বারে তাহা ভুলিয়া যায়, আপনার প্রাচুর্যের গণ্ডিতে আপনি সীমানদ্ধ হইয়া থাকে ;—এই বইখানিতে কবির প্রতিভারও সেই অবস্থা । অকস্মাৎ শক্তির পূর্ণতা অনুভব করিতে পারিয়া কবি দুঃসহ আনন্দ বেগে পূর্ণ পালের মত ফুলিয়া উঠিয়াছেন । বর্ষার পদ্মার মত কবি ইহাতে আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত । এক কথায় সোনার তরীর পদ্মায় তীর হইতে নীরের প্রাধান্য ; লোকালয় হইতে জলাশয়ের আতিশয্য । ভূতত্ত্বে বলে পৃথিবী প্রথমে জলময় ছিল—কালক্রমে তাহাতে ডাঙ্গা জাগিয়াছে ; কবির পৃথিবী এই পুস্তকে জলময়—স্থলের রেখা তাহাতে কদাচিত দেখা যায় । বর্ষার উন্মত্ততার অবসানে যেমন ধীরে ধীরে ডাঙা স্পর্শ হইতে থাকে, তেমনি দেখিব কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে জলাশয়ের বিস্তৃতি কমিয়া লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়িতেছে, কবি নিজেকে লইয়া আর মুগ্ধ না থাকিয়া বিচিত্র পৃথিবীর সহিত পরিচয় সাধনে ব্যস্ত । কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার । বিশ্বের বৈচিত্র্যকে বিশেষ শক্তি দ্বারা নিজের অন্তরে আনন্দময় রূপ দিয়া

আবার তাহা বিশ্ববাসীকে ফিরাইয়া দেওয়া কবি ও শিল্পীর কাজ, এবং ইহাতেই আর্টের চরম সার্থকতা। মেঘদূতের মূল সূত্রটি লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব মেঘদূত কেন চিরন্তন—কালিদাস কেন অপূর্ব। কালিদাসের মেঘ বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ছিল, শিপ্রা-তীরের কবি স্বয়ং এই উভয়ধিধ সর্ববাস্তবতা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। পদ্মাতীরের কবি সোনার তরীতে অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ অর্ধেক মাত্র—কেবল নিজেকে লইয়াই সম্মুখ—পৃথিবীর সহিত তাঁহার প্রেম ও জ্ঞানের পরিচয় স্থাপিত হয় নাই। কয়েকটি কবিতার আলোচনা করিলে আগার কথা উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মানস-সুন্দরী কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র এই কবিতাটি লিখিলেই অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন। কবিতাটির নামেই প্রতীয়মান, কবি নিজের কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রীকে সম্বোধন করিতেছেন। কল্পনার সহিত বাস্তবলোকের সংমিশ্রণ হইয়াছে নিঃসন্দেহ। তবু এ কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, বিশেষ ভাবে নারীর মানসমূর্ত্তিকে, অর্থাৎ নারী যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার এবং অস্তঃপুরবাসিনী—তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা লিখিত। ইহার সহিত পরবর্ত্তী পুস্তক চিত্রার উর্ব্বশীর কত প্রভেদ। সম্পূর্ণ এক বস্তুকে সম্পূর্ণ দুই স্থান হইতে দেখা হইয়াছে। উর্ব্বশী হইতেছে নারীর বিশ্বগত মূর্ত্তিটি—ব্যক্তিগত নহে; মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে। মানস-সুন্দরীতে কবির নজর ছিল নিজের দিকে, এখানে তাহা পৃথিবীর দিকে।

দেউল কবিতাটিতে কবি যে বিশ্ববিহীন নিস্তব্ধতা ও নিভৃত ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিজের অন্তরের। বস্তু পড়িয়া হঠাৎ দেউল

ভাঙিয়া “সংসারের অশেষ সুর ভিতরে এল ছুটি।” ইহা কবির আকাঙ্ক্ষার বিষয়—কিন্তু এখনও উপলব্ধ সত্য নহে। বসুন্ধরা কবিতায় তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন, “এখনো মেটেনি আশা, এখনো তোমার স্তন-অমৃত পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি।” কবি জীবধাত্রী ধরিত্রীকে ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে রাজী নন; শিশু যেমন মাতাকে আঁকড়িয়া থাকে, কবি তেমনিভাবে অন্তর্জগৎকে, নিভৃতবাসিনীকে কল্পনার বাহুবেষ্টনে ঘিরিয়া আছেন। সোনার তরীতে বাহির, বিশ্বের কথা অল্পই, ইহাতে নিজের হৃদয়কে নিঃশেষে ভোগ করিবার ও জানিবার আকাঙ্ক্ষা একমাত্র লক্ষ্য। বস্তুত নিজের সহিত যোগ স্থাপিত না হইলে, প্রেমের বন্ধন গ্রন্থিযুক্ত না হইলে, পৃথিবীতে বাহির হইয়া কোনো লাভ নাই, কারণ অপরকে জানা যায় নিজেকে জানিবার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই—যেমন বর্ষায় একবার নদী আনন্দে ও জলে উদ্বেল না হইয়া উঠিলে তারপরে ফসল ফলিবে জমির কোন্ রসের অভিজ্ঞতায়? কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—গল্পপন্থ সংব্যাপ্ত যে কবির জীবন, তাহার সমস্ত সার্থকতা কেবলমাত্র পড়ে খুঁজিলে মিলিবার নয়। পৃথিবী যেমন বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকাকে লইয়া সম্পূর্ণ, কবির জীবনও তাহার কল্পলোক ও বাস্তবের সমাবেশেই গঠিত। বায়ুমণ্ডলে যে সব কাণ্ড ঘটে, তাহার সহিত পৃথিবীর ধূলি রাজ্যের বিশেষ যোগ নাই; তাহার মেঘবিলাস, তাহার বর্ণচ্ছটা, তাহার বিদ্যুৎবিকাশ, তাহার ইন্দ্রধনুর মনিমাণিক্যের কলাপবিস্তার সমস্তই খানিকটা অপার্থিব; কিন্তু সেই মেঘ যখন বৃষ্টিরূপে, সেই বিদ্যুৎ যখন বজ্ররবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। কাব্যটা আমাদের মনের সেই উর্দ্ধলোক—সেখানে

এমন সব অলৌকিক ব্যাপার হয়, যাহার সব তথ্য উদঘাটন কবির দ্বারাও সম্ভব নয়। গল্পের এই ভূমিরাজ্যের কোনো কোনো খবর আমরা বলিতে পারি বটে। সোনার তরীর কবিতাগুলিতে যে সমস্ত আশা, আশঙ্কা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াও অতৃপ্তির যে একটা আভাস, নিজের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলিত হইবার যে প্রবৃত্তি,—কবির গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে তাহা দেখা যায়, অশরীরী রূপ কাটাইয়া অনেকটা মূর্তিধারণ করিয়াছে। সোনার তরীর পূর্বে লিখিত অনেকগুলি গল্পে আমরা দেখিতে পাইব, কবি স্বরচিত কল্পলোক ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসীদের জীবন-যাত্রার সহিত কিরূপ ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত গল্পগুলিও লিরিক-গল্প। এগুলি পাথরের খোদিত মূর্তির মত নিরেট নহে—বুড়ুদের মত ভঙ্গুর। এক একটি চরিত্রের বস্তুকে অবলম্বন করিয়া এক একটি আকাশকুসুম ফোটানো। উর্ণনাভ যেমন সামান্য যে-কোনো একটা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া নিজের শরীরের রস দিয়া জাল বুনিতে থাকে, এও অনেকটা তেমনি তুচ্ছ একটা বিষয়কে আশ্রয় করিয়া আপনাকে লোক এবং লোকালয়ের মধ্যে, অন্তরকে বাহিরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার একটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র। খোকাবাবু, সম্পত্তি সমর্পন, দালিয়া, মুক্তির উপায়, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া প্রভৃতি গল্প ইহার প্রমাণ। তাঁহার অঙ্কিত এই সব চরিত্রের আভাস, কে বলিতে পারে কতদিন কবি তাঁহার পরিচিত অপরিচিত কত লোকের মুখে কতদিন দেখিয়াছেন। তাঁহার রাইচরণ, অর্থলিপ্সু যজ্ঞেশ্বর, বুড়ো জেলে, সন্ন্যাসগ্রস্ত মাখন, সুরগালা, কাদম্বিনী, কাবুলিওয়ালা,

ফটিক চক্রবর্তী, বোবা মেয়ে সুভা, পলায়নপরা মহামায়া, বঙ্গ-সাহিত্যের
ধ্রুবলোকে স্থান পাইবার পূর্বে শিলাইদহের নগণ্য পল্লীর অধিবাসী
ছিল। কবি ইহাদিগের আশ্রয়ে সমস্ত গ্রাম্যজীবনের সহিত পরিচয়
স্থাপন করিয়া নিজের কল্পলোক হইতে বাহিরে আসিবার ইচ্ছাকে
কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিয়াছেন। পরবর্তী রচনাসমূহে আমরা দেখিব
কবির জীবন গঢ় ও পঢ়ের দুই পক্ষের সাহায্যে কিরূপ সর্ববাস্তব
সম্পূর্ণতার অভিমুখে বল বন্ধিম গতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিনী।

সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের পত্র ।



[আজ দিন চার পাঁচ হল, আমার পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে, :সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্রে লেখা একখানি পত্রের সাক্ষাৎ পেলুম । আমার “পদচারণ” উপহার পেয়ে তিনি আধ-মজা করে ঐ পত্রখানি আমাকে লেখেন । সত্যেন্দ্রনাথের হাত থেকে যখন যা বেরিয়েছে, তারই আমার বিশ্বাস ছাপার অক্ষরে ওঠবার অধিকার আছে । এই বিশ্বাসবশতই সে পত্রখানি আমি সবুজ-পত্রে প্রকাশ করছি । আশা করি কেউ মনে করবেন না যে, ওখানি আমি আমার সার্টিফিকেট হিসেবে পাঠকের দরবারে পেশ করছি ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।]

পদচারণের কবি —

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়

সমীপে—

রসের যে সিধা পেনু তোলে চাঁটি পড়ার শব্দে,—
পাঠাই রসীদ তার, ঢাকে কাঠি খামিবার পরে ;
জানেন্ তো কুঁড়ে গরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুঁড়েমি কায়েমি যার, ক্রটি তার ঘটে পদে পদে ।

• মরম বোঝে না কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে,
কেউ কয় ‘চালিয়ান্ !’ ‘কি অসভ্য !’ কেউ মনে করে ।
আমি শুধু তুলি হাই,—চিঠির কাগজ নাই ঘরে,—
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,—এক ফোঁটা জল মাই গঁদে !

লেফাফা দূরস্থ অতি, পোষ্টাপিসে বিকিকিনি তার,
লেফাফাচুরস্ত হওয়া তাই আর হ'ল না আমার ।

ছ ছ করে বে-পরোয়া চ'লে যেতে চায় দিনগুলো,
হাঁ হাঁ ক'রে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধ'রে ?
বিশেষে গরম দেশে,—হাঁফ ধরে, নাকে ঢোকে ধূলো ;
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি ছ'বার বছরে ।

গোড়াতে জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয়-বচনে,
ওগো ছন্দ- * ! পদচারণের কবির !
পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতিকুঞ্জবনে,
তারিফে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরস্তর !

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ ।

* অস্পষ্ট ।

সামান্য কারণে ।

(য়াথিস্তো বেনাভেস্তুর স্পানিশ হইতে)

একাক্ষ নাটিকা ।

পাত্র পাত্রী ।

এমিলিয়া ।

মানুয়েল ।

গণ্খালেথ্ ।

হার্নান্দেথ্ ।

একজন ভৃত্য ।

প্রথম দৃশ্য ।

বৈঠকখানা ।

গণ্খালেথ্ , মানুয়েল ও ভৃত্য ।

ভৃত্য—আর পেড়াপিড়ি করবেন না ; আপনাকে বলছি সেঞোর*
বাড়ী নেই, আজ মোটেই ফিরবেন না ।

গণ্—যখন আমি এসেছি, তিনি নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছেন ; আমি
ভিতরের খবর বিলক্ষণ জানি ।

ভৃত্য—আমাকে মুস্কিলে ফেলতে চান আপনি—

* সেঞোর—ভদ্রলোক ; সেঞোরা—ভদ্রমহিলা ।

গণ—মোটাই না...এই কার্ডখানা তাঁকে দাওগে।

ভৃত্য—কিন্তু, মশাই...

গণ—কিংবা তাঁর স্ত্রীকে, একই কথা...যেমন করে'ই হোক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে।

ভৃত্য—দেখুন...

গণ—আর কোন কথা না, আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

ভৃত্য—মশাই,...আপনার যা খুশী করতে পারেন; কিন্তু আমি বলে' রাখছি আপনাকে...

গণ—কিছু বলে' রাখবার দরকার নেই তোমার। তোমাকে তিনি হয়ত এরকম লুকুম দিয়েছেন...হুঁ;...সবই জানি আমি,...এ রকম অবস্থায় কি ঘটে;...আর কি করতে হয় সাধারণতঃ, সেটাও জানি; এখনই তুমি দেখতে পাবে—

ভৃত্য - আপনার যেমন অভিরুচি।

(মানুষেলের প্রবেশ)

গণ—দেখলে ?

ভৃত্য—সেঞোরের লুকুম আমি তামিল করেছি—কিন্তু সেঞোর...

মানু - আচ্ছা...

(ভৃত্যের প্রস্থান)

গণ—বুঝেছেনত আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার নেহাৎ দরকার কেন?

মানু—আপনিও বুঝেছেন কারো সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইনে কেন—বিশেষতঃ আপনার মত বন্ধুদের সঙ্গেত নয়ই। আমি

জানি কি বলতে এসেছেন আমাকে...অनावश्यक, সম্পূর্ণ
অनावश्यक; আমার সঙ্কল্প অটল...ঘটনাটা কি তা' প্রেসিডেন্ট
আপনাকে বলেছেন, খবরের কাগজেও পড়েছেন;...আপনাকে
আর বেশী কিছু বলবার নেই।

গণ—কিন্তু...

মানু—অনর্থক, সম্পূর্ণ অনর্থক...কেউ বলতে পারবে না এ
গোলযোগ আমি ডেকে এনেছি। আপনি জানেন মন্ত্রীসভায়
প্রবেশ করা অবধি আমাকে কত ত্যাগস্বীকার করতে
হয়েছে; মন্ত্রীসভায় থাকা মানে আমার পক্ষে ত্যাগস্বীকারের
পরম্পরা মাত্র; যতক্ষণ কেবল আমার ব্যক্তিগত মত, এমন
কি আমার মনোভাব সম্বন্ধে কথা ছিল, আমি মন্ত্রীর দপ্তর
চালিয়েছি,—কিন্তু এখন, আর না; এখন কথা হচ্ছে জনসাধা-
রণের প্রতি, দেশের প্রতি আমার কর্তব্য নিয়ে; এই নূতন
ত্যাগের দাবী মেনে নেওয়া আর আমার সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবন
অস্বীকার করা একই কথা; তার অর্থ আমাদের দলে আমার
অস্তিত্ব অস্বীকার করা; আমার ব্যক্তিত্ব, আমার বিবেকবুদ্ধি
অস্বীকার করা; ততদূর যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য—কারণ,
সেটা আমার অমিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করার সমান হবে।

গণ—কিন্তু ভাই! অবস্থাটী কি, একবার ভেবে দেখ। ঐ গোলযোগ...

মানু—সে দোষ আমার নয়...আমার সৎপরামর্শ কেউ কানে তুলে না,
আমি যা' ছেড়ে দিতে রাজি সেটা অগ্রাহ্য করলে—দল আমার
সর্বস্ব নয়;...আমি আইডিয়াকে মানুষের চেয়ে বড় বলে'
মানি।

গণ—সেই জন্মই মানুষের সঙ্গে রফা করা দরকার, যাতে করে

নির্বিব্বাদে আইডিয়ার অনুসরণ করতে পারেন।

মানু—মিছে বাক্যব্যয় করছেন। আমার সঙ্কল্প অটল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূর্ববানুরূপ ও হার্নান্দেথ্।

হার—ঠিক! আমি জানতেম বাড়ীতেই আছেন আপনি.....

চাকরটা ত আমাকে ঢুকতে দিতেই চায় না। ওহে গণ-
থালেথ্...

গণ—কি ভাই হার্নান্দেথ্! তুমিও কি আমার মত এসেছ...আমাদের
বহুমান্য বন্ধুকে সম্মত করাতে?

হার—আমাদের প্রিয় বন্ধুকে...কিন্তু আপনিই রাজি করিয়েছেন
নিশ্চয়...সেটা হতেই পারে না...বর্তমান অবস্থায় সঙ্কটডেকে
আনা—আর সঙ্কট কিনা...তুচ্ছ বিষয়ের জন্ম! আপনার ব্যক্তি-
গত অসন্তোষের কারণ থাকলেও বা বুঝতেম;—বিশেষতঃ
আপনি জানেন, গবরমেণ্টে ও মেয়র-আফিসে যথার্থ বন্ধু যাঁরা,
তাঁরা আপনার হাতে রয়েছেন।

মানু—কিন্তু আমি যে-সকল গুরুতর বিষয়ের অনুমোদন করেছি,
উক্ত বন্ধুগণ যে সে-সকল বিষয়ে আমার মতে সাই দেন না।

হার—কিন্তু কারণটাই ত যথেষ্ট নয়; ব্যক্তিগত ভাবে ত কেউ
আপনাকে কিছু দিতে অস্বীকার করবেন না।

মানু—জনসাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে দিতে
যে অস্বীকার করছেন।

গণ—কিন্তু জনসাধারণ আপনি বলছেন কা'কে ! সংবাদপত্রগুলোকে ?

ওগুলো পড়া যদি আপনি ভাগ করতেন !

মানু—আমার বাবা দুর্বলতাবশতঃ আমাকে কলেজে দেন এবং আমিও দুর্বলতাবশতঃ লেখাপড়াটা শিখে ফেলি...হ্যাঁ, গোড়ায় পড়বার বদ-অভ্যাসটা ঐরকম করেই হয়। বিপদ এলে চোখ মেলে দেখতে চায় না বলে' অষ্ট্টিচ ডানার নাচে মাথা গৌজবার যে অভ্যাস করেছে, যে ব্যক্তি শাসনভার নিতে যায় তার পক্ষে সেটা মোটেই সদভ্যাস নয়।

গণ—কিন্তু, প্রিয় বন্ধু, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশী চরিত্রবল আছে বলে' আমার বিশ্বাস ছিল।

মানু—আজকাল আপনারা চরিত্রবল বলেন কোনরূপ চরিত্র না থাকাকে, কোনরকম কাজ করতে বাধাবোধ না করাকে। ও কথা এ স্থলে খাটে না ভাই।

হার—সব-কিছুর উপরে ওঠা, সেটা ঠিক জিনিষ নয়,...সকল বিষয় স্বীয় স্বাভিন্দ্র্য রক্ষা করা...

মানু—কেন মিছে আপনারা ক্লান্ত হচ্ছেন ! আমার সঙ্গল অটল।

গণ—কিন্তু প্রিয় বন্ধু...ভেবে দেখুন...আপনি ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুতর করে তুলছেন, বিরুদ্ধপক্ষের হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দিচ্ছেন...

মানু—ঠিক তার উণ্টো ! আমি আমার সহকারীদের মিটমাট করবার পন্থা সহজ করে দিচ্ছি।

হার—আপনি ভ জানেন যে, আপনার পদে নূতন লোক এখন নিযুক্ত

হলে তাতে দলের ভিতরকার অনৈক্য বাইরে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

মানু—আমি তাই চাই! সব দলকে আলাদা আলাদা করে' দিতে হবে, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে হবে, প্রচ্ছন্ন গোলযোগ ঘুচিয়ে দিতে হবে।

গণ—কিন্তু প্রচ্ছন্ন গোলযোগ ঘোচাবার বিপদ আপনি ত জানেন। বিশেষতঃ সে চেষ্টার ফলে যখন আপনার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

মানু—আমি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে' থাকতে রাজি আছি।

হার—একবার দেখুন না যতখানি ছাড়া আপনার পক্ষে সম্ভব, তার শেষ সীমা পর্যন্ত আসতে পারেন কি না।

মানু—তার শেষ সীমা পর্যন্ত আমি অনেক আগেই এসেছি।

হার—তবু যদি একটা কোন উপায় খুঁজে পান, যা অবলম্বন করা সম্ভব।

মানু—আমি সেরূপ একটি উপায়ের প্রস্তাব ত করেছি।

গণ—সেটা সম্ভবপর নয়।

মানু—তবে দ্বিতীয় উপায় আর নেই।

হার—একটু সময় দিন আমাদের; সকলে মিলে একটা উপায় আমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারব।

মানু—না।

গণ—একটা দিন।

মানু—না।

গণ—একটি ঘণ্টা মাত্র,—বিরুদ্ধপক্ষের দলপতির সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে দেখব, আর তাঁর উত্তর নিয়ে তখনি ফিরব—কিন্তু আরো একটুখানি ছাড়বেন আপনি ।

মানু—ক'খনো না । যা ছাড়তে পারি তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি পৌঁচেছি ।

হার—আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আর একবার কথা না বলে' আপনার সঙ্কল্পের কথা কাউকে জানাবেন না,—এই প্রতিশ্রুতিটুকু আমাদের দেবেন ত ?

মানু—আপনারা কিছুই করতে পারবেন না । উপায় সম্বন্ধে আমার শেষ প্রস্তাব সর্ববাংশে গ্রহণ করা না হ'লে আপনাদের প্রত্যাবর্তন অনর্থক ।

গণ—সর্ববাংশে ? আর এক ধাপ এগিয়ে আসুন, বন্ধুর ।

মানু—সামনে এগিয়ে চলা ভিন্ন অন্য কোনরূপ চলা আমার জানা নেই । আর এক ধাপ এগনোর মানে আরো কিছু কম ছাড়া ।

হার—আপোষের দিকে এগিয়ে আসুন—আর সকলেও ঐ মুখে এগিয়ে আসবে, তখন সব মিটে যাবে—ইতিমধ্যে....., এক ঘণ্টা সবুর....., এক ঘণ্টা....., আপনি ভেবে দেখুন; ইতিমধ্যে....., আমরা চেষ্টা করে'.....

মানু—আমার বিশ্বাস আপনারা কিছুই করতে পারবেন না—আমি যতটা আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি, তা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন; 'সেটুকুও ছেড়েছি আপনাদের সন্তাবের জন্য কৃতজ্ঞতাবশতঃ ।

গণ—আপনি ত জানেন, আমরা আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ।

হার—যতক্ষণ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ততক্ষণ আমরা
আপনার অনুগত থাকব। শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

গণ—প্রিয় বন্ধু.....

(উভয়ের প্রশ্ন)

মানু—কারো সঙ্গে আর দেখা করব না—কোন অজুহাতেই কাউকেও
আর আসতে দেবে না—বলবে আমি মোটরে করে বেরিয়ে
গেছি—একবারে সহর ছেড়ে মফঃস্বলে গেছি—কোথায় আছি
জাননা—কাউকেও না, যাই হোক না কেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

মানুয়েল এবং এমিলিয়া।

এমিলিয়া—মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করে' দেখা দেবেন কি ?

মানুয়েল -- এস, এস !

এমি—এখনও খবরের কাগজ পড় নি ?

মানু—কেন ?

এমি — কারণ, রোজই তা' পড়ে' পড়ে' তোমার মেজাজ বিগুড়ে যায়।

যদি আমার মত হ'তে—আমি ও-জিনিস কখনো পড়িনে।

মানু—তোমাকে মন্ত্রীসভার সভাপতিত্বে বরণ করা উচিত।

এমি—অবশ্য সমাজের ও নাটকের খবর ছাড়া—আর বিজ্ঞাপন।

মানু—ঠিক বলেছ ; বিজ্ঞাপনগুলি একবার দেখা যেতে পারে।

এমি—কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার জন্য তোমার মুখ দেখাই যথেষ্ট—

আজকের দিনটা ভাল।

মানু—সে কথা সত্য ; আজ কোন খবর নেই।

এমি—অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ! আর বাস্তবিক, কি খবরই বা থাকবে...দিনের পর দিন এমন একঘেয়েভাবে চলা আর কখনো দেখেছ ? বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে—একসূচেষ্টা পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে ।

মানু—আমার চেয়ে দেখছি তুমি বেশী খবর রাখ—তবু বল যে খবরের কাগজ পড়িনে ।

এমি—বাস্তবিক পড়িনে; আমার দরজীর কাছে শুনেছি—পারী থেকে তারা একটা ফরমাসী মাল পাঠিয়েছে, তার টাকা দেবার সময় হয়েছে, টাকা দিয়েও দিয়েছি আমি—কি বলছ ? দেখ, ব'লো না যেন যে আমি বেশি টাকার দাবী করছি—আমি, আমি.....হাঁ সেঞোর ! সাধারণ মাসিক খরচ থেকে...

মানু—আমি ত কোন আপত্তি করছি নে ।

এমি—ওঃ, আমি ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত মন্ত বড় একজন মন্ত্রিণী হয়েছি ! দেখ, আমি কোনরকম বায়না করি নে—উপরি খরচের তহবিলে হাত না দিয়ে আমার পোষাকের ব্যয় নির্বাহ !. তোমার ধারণাই নেই তা'তে কিরকম খরচ লাগে—সমস্ত কাগজগুলো বলে আমার বেশভূষায় সুরুচি ও বিশেষত্ব প্রকাশ পায় । মন্ত্রীপক্ষের কাগজেও বলে, বিরুদ্ধপক্ষের কাগজেও এই কথা বলে ।

মানু—সামাজিক সংবাদদাতারা চিরদিনই মন্ত্রীপক্ষীয় হয়ে থাকে । স্ত্রীশাসন চিরকালই অত্যন্ত অত্যাচারী এবং তিলমাত্র বিরুদ্ধতা সহ করতে পারে না ।

এমি—বরং অত্যন্ত উদার, তাই তার বিরুদ্ধাচরণ হতেই পারে না...

কি শিষ্টতার অভাব তোমার !

মানু—পারো থেকে এমন কি আশ্চর্য্য জিনিষ এল, আমরা শুনতে পাই কি ?

এমি—ওঃ ! শীঘ্রই দেখতে পাবে...সে একটা কবিতা,...একটা স্বপ্ন...একটা আদর্শ পোষাক ! সে আর্টের একটি সৃষ্টি ! পুরুষেরা সে সব সূক্ষ্মতত্ত্বসাম্রাজ্যের অধিকারী নয়...তবে সমষ্টি হিসেবে বটে ;—কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে...

মানু--কিন্তু সেই ব্যক্তির একটা অংশ সম্ভবতঃ জিনিষটার দাম ।

এমি—দামের কথা বল্ছ ? এরকমের পোষাক বরাবরই সস্তা হয়, আর আমার কাছে তাদের দর আলাদা । ঠিক এই জিনিষ অন্যের কাছে তিন হাজারের কমে ছাড়বে না, কিন্তু আমার কাছে নিয়েছে দু'হাজার নয় শ পঁয়তাল্লিশ..., সবসুদ্ধ... কার্টম্ শুল্ক, ডাক খরচা...

মানু—হঁ ! সস্তা বটে ।

এমি—সে একটা প্রকৃত সৃষ্টি..., আর আশ্চর্য্য এই যে, দেখতে কিছুই নয়..., সেই ত সত্যিকার ফ্যাশন, একেবারে সাদামাঠা... হাতে নিয়ে হয়ত বলবে, এর আবার দাম কি,...যে-সে ত এমন জিনিষ বানাতে পারে । কিন্তু যেই সেটা কারো গায়ে ওঠে...তখন...দেখবে...দেখবে...

মানু—সে সৌভাগ্য কবে হচ্ছে ?...

এমি—কি যে জিজ্ঞাসা কর ! পরশু সকালে, প্রাসাদে, যখন তুরস্ক যুবরাজের সম্বর্ধনার্থ ভোজ হবে ।

মানু—পারস্যদেশের—

এমি—তবেই হ'ল... এবার আর বুককাটা পোষাক নিয়ে বক্তৃতা
দেবার সুবিধা পাচ্ছ না...

মানু—না, আমি আর কিছু বলছি নে..., ভাল কথা...সে ভোজটা
যখন...

এমি—কি ! বন্ধ হয়ে গিয়েছে ? যুবরাজ আসবেন না ?

মানু—তিনি আসবেন, হাঁ সেঞোরা,—আর তিনি না এলে আর কেউ
আসবে,...কিন্তু সেদিন আর আমি মন্ত্রী থাকব না ।

এমি—কিরকম ! কেন, কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে ? তাই বা কি
করে' হবে ? আমার চুল-বাঁধুনী ত আমাকে কিছুই বলেনি ! ..

মানু—সে এখনও এ খবর জানে না...

এমি—সে ত গণ্থালেথ্ আর হার্নাদেথের বাড়ীতেও কাজ করে !...

মানু--সঙ্কটটা আংশিক মাত্র - আমি একাই ইস্তফা দিচ্ছি...

এমি—তুমি একা ? এমন কি করেছ তুমি, যে তোমাকে একা ইস্তফা
দিতে হচ্ছে ?

মানু—এখন তোমাকে সে কথা বলতে পারছি—কিন্তু যথেষ্ট কারণ
আছে...

এমি—আঃ, তাহ'লে তোমার আপন ইচ্ছায় --

মানু—তা' নয়ত কি ? তুমি কি ভাবছ তারা আমাকে ত্যাগ করেছে ?

এমি—তা ছাড়া ত আমি বুঝতে পারছি নে । ব্যাপারখানা কি —

মানু—আমার মতের সঙ্গে গবরমেণ্টের মতের মিল হচ্ছে না... ;
সকলের উপরে আমার মত...

এমি—আমার বিশ্বাস ছিল তোমার মতই গবরমেণ্টের মত...

মানু—কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমারও তাই বিশ্বাস ছিল।..

এমি—ওঃ, তাহলে মোটে কাল সন্ধ্যায় এই ব্যাপার ঘটেছে!... আর আমাকে তুমি কোন কথাই বলনি!...

মানু—রাত্রে একবার সব ভেবে দেখুন মনে কবেছিলেম।

এমি—ও, তাই সারারাত ছটফট করছিলে!... ইস্তফাপত্র তারা গ্রহণ করেছে?

মানু—করুক বা না করুক...

এমি—ওঃ! তাহলে এখনও সেটা পাঠাওনি?

মানু—হাঁ, একরকমে... চিঠিতে দস্তুরমতভাবে এখনও পাঠাইনি।... তারা আশা করছে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে... তারই চেষ্টা চলছে...

এমি—নিরস্ত করতে পেরেছে?...

মানু—কোনমতেই নয়... আমার সঙ্কল্প অটল। যতখানি ছাড়া যায় আমি ছেড়েছি...

এমি—তুমি যে ধার চেয়েছিলে, তা দিতে চায় না তারা?

মানু—হাঁ, তা দেবে...; আমাকে তুষ্ট করবার জন্য তারা উঠে পড়ে' লেগেছে।

এমি—তবে...?

মানু—তা'তে কিছু এসে যায় না... ধার নিয়েত কথা নয়... এ হচ্ছে জনসাধারণের নিকট, দেশের নিকট আমার দায়িত্বের কথা... তোমাকে আর কি বোঝাব?—তবে এটুকু জেনে রাখ যে বথেষ্ট কারণ আছে...

এমি—কি জানি...; কিন্তু তোমার একা ইস্তফা দেওয়া...এটা অত্যন্ত
বিসদৃশ...লোকে বলবে তোমার কোন কারণই নেই...

মানু—তা'ত বলবেই...

এমি—আরো এক কথা...,সবাই নিজ নিজ পদে বাহাল থাকবে...কি
বিশী যে দেখাবে...আর তোমার শত্রুরা আনন্দ করবে...

মানু—আমার শত্রুরা সীকার করবে যে আমার আন্তরিকতা আছে।

এমি—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে আমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে চেয়ে
শত্রুর সঙ্গে সদ্ভাব রাখা তোমার বেশী পছন্দসই।

মানু—দেখ এমিলিয়া! তোমাকে রাজনৈতিক বন্ধুরূপে কোনদিন
দেখতে ইচ্ছা করিনি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ত দূরের
কথা।

এমি—আমিও তা মনে করিনে...,কিন্তু চিরকাল দেখেছি আমি কেমন
সংপরামর্শদাত্রী গৃহিণী...,সেইরূপেই সর্বদা আমাকে দেখো।
এ কথা বলতে পারবে না যে আমি কখন তোমার কাজে হাত
দিতে গিয়েছি। তোমাকে সুপারিশ-পত্র দেওয়ার জন্মও
কখন বিরক্ত করিনি...,তুমিত জান কত লোকে সেজন্ম
আমাকে ধরেছে...তোমাকে কোনরকমে বিরক্ত করব না বলে
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অসদ্ভাব পর্য্যন্ত হয়েছে। তুমি মন্ত্রী হবার
পরে, কি চেয়েছি তোমার কাছে? কেবল আমার দাসীর
বাগদত্ত বরের জন্ম একটা পুলিশের চাকরীর একটু সুপারিশ;
আর আমার চুলবাঁধুণীর ষোনের যাতে আইনপরিষদের এক
সভ্যের কিনেমোটোগ্রাফে চাকরী হয়, তার জন্ম একটুখানি
সুপারিশ। আমার পদমর্যাদার কখন অপব্যবহার করেছি,

সে কথা বলতে পারবে না। আমার জায়গায় আর কেউ হলে একবার দেখতে কি করত। তোমার সহযোগী রুইথ গোমেথের ঘরে ত একজন আছে, সে তার স্বামীকে না ব্রেক-ফাস্ট, না ডিনার, কোনটাই শান্তিতে খেতে দেয় না...এবং স্বামী যদি তার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন ত সে এ মন্ত্রীর কাছে সে মন্ত্রীর কাছে চেয়ে চেয়ে বেড়াবে।

মানু—এ মন্ত্রী সে মন্ত্রী যদি না থাকত !

এমি—যার তার কাছে চাইত। তার স্বামী ত তবু মহা খুসী আছে।

মানু—মোটাই না ;—কাউন্সিলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়...

এমি—তাই বলে' পদত্যাগ করবার আবশ্যিক হয় না ! শূন্ছ ?—ঘণ্টা বাজছে। বন্ধুবান্ধবেরা কেউ হয়ত আসছেন তোমাকে বোঝাবার জন্য ; কোন অপরিচিত লোক হয়ত খবর নিতে আসছে...

মানু—আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না বলে' দিয়েছি...

এমি—তোমার পদত্যাগের কারণ তাহ'লে বাস্তবিক গুরুতর ?

মানু-- অত্যন্ত গুরুতর।

এমি—অন্ততপক্ষে সবুর করাও চলবে না ?

মানু—কি উদ্দেশ্যে ? যা হবার তা হবে...আর তুমিও ত সর্বদা বল যে তোমার ইচ্ছা আমি এ সব কাজের চাপ থেকে মুক্ত হই,...এ সব খেজালতের...

এমি - হাঁ সেঞোর,...হাঁ,...তা বলি বটে ; তবে কথা হচ্ছে...

মানু—কথা হচ্ছে ?

এমি—একবার আমার, মন্ত্রীর-স্ত্রী হবার সাধ মিটলে !...

মানু—যদি তুমি এত জাঁকজমক ভক্ত না হতে ! তোমার কথায় মনে হয় যেন আমার মন্ত্রীপদ রাখতে হয় কেবল লোক দেখাবার জন্তু, ...কেবল...ওহো, এই দেখ ! সেই পারীর পোষাক, ... পরশু ঐটে পরে' বাহার দেখাবার সখ...

এমি—কি বলছ ? আমি বড় ভুল করে ফেলেছি !

মানু—আর কোন সুযোগ যেন তুমি পাবে না ! কোন বল...

এমি—সেটা বল-নাচের পোষাক নয়...ডিনারের;—সেটা এমন ধাঁচের যে ডিনার ছাড়া, এবং রাজবাড়ীর ডিনার ছাড়া, আর কোন সময়ে কাজে লাগবে না।

মানু—সেই সঙ্গে বল যে পার্সী যুবরাজের সম্বন্ধনার ডিনার ছাড়া... সেটাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত ! জানিনে এমন কি বিশেষকর আছে সে পোষাকে, যে একটা বিশেষ সময় ছাড়া কাজে লাগবে না !

এমি—কি যে বলছ তার ঠিক নেই;—সেটা ঠিক অমনি ধরণের, ... আর আমারও সখ ঠিক সেই সময়ে বাহার দেখান। অশু গবরমেন্ট ছেড়ে এই গবরমেন্টে মন্ত্রী হ'তে তোমার এত ইচ্ছা কেন ?...সেইটে বল...

মানু—বেশ, এইত আমি নিজের ইচ্ছায় ছাড়ছি...

এমি—হারনান্দেথকে ক্ষেপাবার জন্তু, ...তুমিই আমাকে এ কথা বলেছ...তাহ'লে বুঝতে পার আর কাউকে ক্ষেপাবার জন্তু আমার এত আগ্রহ কেন, ...আমি জানি সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে; ...তোমার সহকারী মন্ত্রীদের কা'র স্ত্রী...

মানু—কে বললে ?

এমি—হাঁ হাঁ, আমি শুনেছি ;...আমাকে বলেছে ; বলেছে যে আমার
অত্যন্ত বদরুচি...মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল আমার অল্প বয়েস
ব'লে!...

মানু—আরো বলতে পার, সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে...

এমি—ওটা অবশ্য তোমার কথা, ...শুনে খুব খুসী হলেম...কিন্তু সে ত
যে-কেউ হতে পারে ;...কিন্তু মার্জিতরুচি হওয়া—সেটা ঢের
বেশি শক্ত কথা ।

মানু—তোমার মার্জিত রুচিও বটে, ...যেমনটি হওয়া উচিত...

এমি—তা হোক,—কিন্তু এবার দেখবে ! এক এক সময়ে আমার
বেশভূষা ঠিক হয় নি তা' বুঝতে পেরেছি, বাড়াবাড়ি হয়ে
গিয়েছে...কিন্তু এবারকারের পোষাক একদম সেরা ছাঁদের ;
এ নিয়ে কুড়িদিন ধরে দরজীর সঙ্গে রোজ আমার লেখালেখি
হয়েছে, ...নমুনা, নক্সা, বর্ণনাপত্র কেবল যাওয়া আসা করেছে,
...কিছুতে ঠিক করতে পারছিলুম না কি ক'রে যে মনের
কল্পনাগুলোকে রূপ দিতে পারি । “আপনি স্বপ্ন দেখছেন”
—পোষাকওয়ালা আমাকে এক চিঠিতে লিখলে...

মানু—তাই নাকি !

এমি—“সর্বদা আমার কথা মনে রাখবেন,”—প্রত্যেক চিঠিতে আমি
তাকে লিখতাম...

মানু—তাহলে জেন যে ঐ চিঠিপত্র ধার হাতে পড়বে...

এমি—সেই পোষাক তোমার জন্ম পর্তে যাচ্ছি, বুঝলে ? তোমার
জন্ম ! আমি চাই আর কেউ দেখবার আগে তুমি সেটা
দেখবে, তুমি তার প্রশংসা করবে ।

মানু—না, না..., সে সুযোগ ত হচ্ছেই...

এমি—পরশু...

মানু—হাঁ, রিয়াল থিয়েটারে সেদিন একটা অভিনয় আছে, সেদিন যদি পর...

এমি—রিয়াল-থিয়েটারের পক্ষে সেটা বড় বেশী জমকালো হবে ; লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে...

মানু—যেন সেইটেই তোমার অভিপ্রায় নয় !

এমি—লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ? মোটেই না ! সত্যিকার ষ্টাইল ত সেইখানেই... কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, অথচ সকলের চোখেই পড়বে...

মানু—সেটা কিরকম দাঁড়ায় আমার কাছে পরিষ্কার হল না । যাই হোক, পোষাকেরও গুণ্ডুরহস্ত আছে বটে...

এমি—ঠিক রাজনীতির মত... আজই তার একটার পরিচয় পাওয়া যাবে...

মানু—একটার ? কোন্টির ?

এমি—তোমার পদত্যাগ বন্ধ করবার ।

মানু—একটা পোষাকের জন্ম ? উপভোগ্য প্রস্তাব বটে !

এমি—পোষাকের জন্ম না, আমার জন্ম ! তুমি কি মনে কর তোমার এই ত্যাগের মূল্য আমি বুঝিনে ? যদিও সেটাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যায় না,....কিন্তু তুমিও ত তোমার বন্ধুদের মত সকলের আগে আনন্দ প্রকাশ করবে ?

মানু—আমার বন্ধুরা করবেন নিশ্চয় , আর আমাকে লক্ষ্য করে কি হাসিটাই হাসবেন !

এমি—যেন তাঁরা তুচ্ছতর কারণে গুরুতর কোন কাজ কোনকালে করেন নি !

মানু—পোষাক পরে' বাহার দেবার খেয়ালের চেয়েও বেশী তুচ্ছ কারণে ?

এমি—একগাছা ফিতে গায়ে লাগাবার বা মুখস্বকরা বক্তৃতা শুনিয়া দেবার খেয়ালও হতে পারে । সবই অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি...; কিন্তু তোমাদের পুরুষদের ধারণা যে তোমাদের অহঙ্কার অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের জিনিষ... আর বাস্তবিক ধর্তে গেলে পদত্যাগ করবার জন্য তোমার এত জিদের কারণ কি ?—না অহঙ্কার ।

মানু—আত্মসম্মান !

এমি—অহঙ্কার ! একটা কথা যখন বলে ফেলেছ, সেটা আর না করা চলে না...; তোমার দৃঢ়তার খ্যাতি বজায় রাখবার অহঙ্কার । আর সেজন্য তুমি বন্ধুবান্ধবদের মুস্কিলে ফেলতে প্রস্তুত, গবর-মেন্টকে একটা ছুস্তর সঙ্কটের মুখে এগিয়ে দিতে প্রস্তুত..., কোন লাভই হবে না...; সকলের ধারণা তুমি দাস্তিক, এক গুঁয়ে, কোন অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে' নিতে পার না... এ দোষ তোমার চিরকালই আছে...; কাগজগুলো প্রত্যেক দিন তোমার সম্বন্ধে এই কথাইত বলে...

মানু—তবু সেগুলো পড়তে হবে ?

এমি—কখনো কখনো,...হাতে এসে পড়লো...; রোজ সেগুলো তোমার সম্বন্ধে লিখবে...“মন্ত্রীর একগুঁয়েমি..., তাঁর এক-বগুগা স্বভাব...তিনি একগুঁয়েমিকে দৃঢ়তা বলিয়া ভুল

করেন"...সে কথা কিছু মিথ্যাও নয় ; ঐ জন্যই ত বাড়ীতে কেউ দেখা করতে আসে না...

মানু—এমিলিয়া ! তুমি অত্যন্ত অপ্রীতিকর কথা বলতে ভালবাস।

এমি—সত্য কথা চিরদিনই অপ্রীতিকর...তুমি আমাকে আর শুনিও না যে মন্ত্রীসভার আর সকলের কথা কিছু নয়, তুমি যা বলছ তাই একেবারে বেদবাক্য...আর তা হ'লই বা...; শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের মত মেনে চলে...তঁারাও আরেক সময়ে তোমার কথা অনুসারে চলবেন...তুমি লোক হাসাতে যাচ্ছ... তোমার পরামর্শদাতা হয়েছেন তোমার "পরমবন্ধু" পেপে.., তাই তোমার এমন দুর্দশা। বেশী করে দৃঢ়তা দেখাতে গিয়ে এখনই একটা কাণ্ড বাধিয়ে ব'স, তখন যা'তে তোমার অনিষ্ট হয় সেইরূপ পরামর্শ দেবার সুযোগ হবে...পেপের মতলব তুমি মন্ত্রীপদ ছাড় ; সে তোমাকে ভয়ানক হিংসে করে।

মানু—কিন্তু পেপে কতখানি দেখেছে, আর কিই বা পরামর্শ দেবে আমাকে ?...

এমি—কি বল তুমি...সে সব দেখেছে, সব জানে...যখন থেকে তোমার আফিসঘরে সে পা দিয়েছে..আমি হলেম ঐ যা' বলেছি...কুরুচিসম্পন্ন...হাল-ফেশান খাবার ঘর হচ্ছে পাড়া-গোঁয়ে কফিশালার মত দেখতে, আর তোমার আফিস দেখতে মুদ্দফরাসের ঘরের মত...মুদ্দফরাসের মত দেখাবার জন্য তুমি এমন দরজীর কাছেরই যাও, যে পোষাক পর্যন্ত ঠিক করে তৈরী করতে জানে না। সেদিন রাত্রে বল-নাচের নিমন্ত্রণে দূতাবাসে গেলাম ; আজকাল হঠেনের মত বুককাটা

জামা কেউ পরে না, মাটির চুড়ির হাতা কেউ পরে না...
তোমাকে দিল এইরকম সাজিয়ে.., তুমি যে এই সব সৌখীন
জামা পর, গুণ্ডা হাতু কর—দেখবে কাগজগুণ্ডা এই নিয়ে
তোমার কেমন ব্যঙ্গচিত্র বের করে...০০০

মানু—এমিলিয়া! এমিলিয়া! আমার সমস্ত স্নায়ু উত্তেজিত হ'য়ে
উঠেছে, তাই কোন উত্তর দিলেম না।

এমি—তোমার রাজনৈতিক উৎপাত আমার উপর যতখানি, তার
প্রতিশোধ নিতে পারলে তবে ঠিক হ'ত। তোমার রাজনীতি
চর্চার দরুণ—আমার লাভের মধ্যে যত ক্ষতি ও অসুবিধা
হয়েছে.. তোমার জন্ম আমার পরম বন্ধুদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ
হয়েছে,... আর এমন বিস্তর লোকের সঙ্গে আলাপ করতে
হয়েছে যাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি নে,... যারা কোনরকমে
সম্মানের যোগ্য নয়, যারা আলাপের অযোগ্য। প্রত্যেক
বিষয়েই এইরকম,... আগাগোড়া ত্যাগস্বীকার... গেল গরমের
সময় তুমি মাদ্রিদে একা পড়ে থাকবে বলে হাওয়া বদলানো
হ'ল না, কারণ তোমার পরম সোহাগের কর্তেস্* ছেড়ে যাবার
উপায় ছিল না,... এবার বড়দিনের সময় তোমার নানা প্রিয়
প্ল্যানের পাল্লায় পড়ে মাকে দেখতে যাওয়া হল না। আর
একবার একজনের ঘাতে একটু সম্ভ্রাম হয়, একটা খেয়াল
একজনের হয়েছে বলে,... সেটা যেন একটা অপরাধ,... তার
জন্ম কিনা সে হল কুটচক্রিনী, সে ভয়ানক কি একটা দাবী

কর্তেস্—Sp. Cortes = আইন সভা।

করছে, একজনের রাষ্ট্রীয় জীবন, একজনের আত্মসম্মান নষ্ট করে দিচ্ছে, ..আরো কত শুনব! তোমার কেবল বলা বাকী রইল যে, রুইথ্ গোমেথ তার স্বামীকে যেমন করেছে, আমিও তেমনি তোমাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছি;...সেটুকু বাকী থাকে কেন...বল, আমাকে ও কথাও বল...বলে ফেল...

মানু—এমিলিয়া! এমিলিয়া!...

এমি—না, এবার আমিই বলব যে তুমি ইস্তফা দাও...আজই এই মুহূর্তে! কিন্তু ফের আমার কাছে রাজনীতি বা মন্ত্রীর দপ্তরের কথা তুলতে পাবে না...এখান থেকে উঠে ছোট এমন কোন পল্লীতে গিয়ে আমরা বাস করব, যেখানে অন্ততঃ শান্তি মিলবে ...ঐ জিনিষটাই আমি চিরকাল চেয়েছি,...ছোট বাড়ীটি হবে, দু' চারটে মুরগী পায়রা থাকবে,...আর, আর...এইরকমের নরক নয়, এ সব দলাদলি নয়...তোমাকে এ অবস্থায় দেখবার চাইতে...তোমার আর সকলের উপরে বিরক্তির শোধ আমার উপর দিয়ে তোলবার আগে...

মানু—এ যে বিরুদ্ধপক্ষের কুড়িটা বক্তৃতার চেয়েও সাংঘাতিক... আমি এই চল্লেম কংগ্রেসে,...সেনেটে,...এ ছাড়া আর সবই সহ্য করতে পারব...আমার ওভারকোট, টুপি...

এমি—তাহলে ইস্তফা দেবে না?

মানু—না, ইস্তফা দেব না...মন্ত্রীসভায় না থাকলে আর কোন্ ছুতায় অত সময় বাইরে থাকব...কে আর এক বছরের মধ্যে তোমাকে ঘাঁটাতে যায়! ভোজে যেও, পোষাকের বাহার

দেখিও। এ ধরনের সমস্যার মীমাংসা পেটিকোটের দ্বারা
হস্তগত এই প্রথম নয়...খুশী হয়েছ ?

এমি—হয়েছি, কিন্তু রাগ ক'রো না...যখন পোষাকটা দেখবে, সব
বুঝবে তখন !

মানু—তা বুঝব, কিন্তু কাল থেকে তোমার সমাজসমাচার ছাড়া আর
কিছু পড়া চলবে না, কারণ খবরের কাগজগুলো আমার
সম্বন্ধে যা বলতে শুরু করবে !

এমি—বিরুদ্ধ দলের কাগজ। তুমি ইস্তফা দিলে মন্ত্রীপক্ষের কাগজও
সেইরকম বলত...ওগুলো ত ঐ বলার উপরেই আছে !

মানু—এর পরেও মেয়েরা আবার চায় যে তাদের ভোট দেবার
অধিকার দেওয়া হোক, যেন তারা সমস্ত দুনিয়াই শাসন
করে না !

এমি—আমি ছাড়া ! আমি ও সব চাই না...এ বিষয়ে প্রস্তাব উঠলে
তুমি তার বিপক্ষে ভোট দিতে পার।

শ্রীমনীমাধব চৌধুরী।



সাধুমা'র কথা ।



[সৌভাগ্যক্রমে এবং ঘটনাচক্রে একটি আত্মজীবনী পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে, যার লেখিকা অতীতে ছিলেন বিশিষ্ট বংশের কন্যা ও বধূ, এবং বর্তমানে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিনী। আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা মহিলা না হলেও, নারীমূলভ মরল রেখাপাতে ও গল্পচ্ছলে নিজের জীবনীসহ সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ঘরের এমন উজ্জ্বল চিত্র তিনি এঁকেছেন যে, আমাদের পক্ষে তা' যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, অপের পাঠকের পক্ষেও তাই হবে মনে হবে', যথাসম্ভব সংকোচনপূর্বক এই বিস্তৃত আত্মকাহিনী খণ্ডে-খণ্ডে সবুজপত্রে প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছি। স, স।

আমার মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ধর্মপ্রাণা ছিলেন, তাঁর ধৈর্য ও দয়ার বিষয় লেখা আমার গ্যায় অক্ষমা কন্যার অসাধ্য। তবে নারায়ণের কৃপায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব। আমার মা'র প্রথমে একটি কন্যা হয়। 'সেটি জন্মগ্রহণ করে' মাত্র ১৩ দিন জীবিত ছিল। পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়, তাঁর জন্ম হবার পর আমার পিতামহী বড় বেশীরকম আনন্দিত হন। তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে এক মাস নহবৎ বসে, আর দরিদ্রদের অন্নবস্ত্র দান করা হয়। পরে ঐ পৌত্রীর জন্ম একটা ধাত্রী নিযুক্ত করেন। ত্রিভূলের উপর সদা সর্বদা রেখে তাঁকে পালন করা হয়। এমন কি, আমার মায়েরও কোলে করবার পর্য্যন্ত সাধ্য ছিল না। অবশ্য পাঠকপাঠিকারা বলতে পারেন যে, সে বিষয় আমি কিরূপে জানলুম? আমার মা'র মুখে

সকলই গল্প শুনেছি, সেজন্য লিখছি। যতটুকু সুখ পেলে মানুষ মনে করে অপরিমিত, তা তিনি পেয়েছিলেন। আবার দুঃখও যাকে বলে অপরিমিত, তাও শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। এ দুটির কোনটিতেই মাতাঠাকুরাণীর ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। তাঁর সুখের কথা কিছু গল্প শুনেছি। তাঁর পিতা সেকালের হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পসার বিলক্ষণ ছিল। উপার্জনও বিস্তর করেন; কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না। সমস্তই পরিবারগণের ও নিজের ভোজন ও সুখবিলাসে ব্যয় করেন। আমার মাকে অতি সুখে ও যত্নে লালনপালন করেন। মাতাঠাকুরাণীর সাত বছর বয়সে বিবাহের সম্বন্ধ হয়। পানপত্র ও খুব সমারোহের সহিত হয়। আর সেইদিন অবধি নিত্যই দুই পক্ষ হতে নানারকম বস্ত্র, অলঙ্কার, বিলাসের বস্তু আর নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রীর আদানপ্রদান চলে। পরে দশ বছর বয়সে সমারোহের সহিত বিবাহউৎসব সম্পন্ন হয়। নববধূও খুব আদরের সহিত দিন যাপন করেন। কিন্তু এ সুখ অতি অল্পদিনই রইল। পরে বারো বছর বয়সেই তাঁর প্রথম কন্যা হল, পরে আবার তেবো বছর বয়সে একটা পুত্র হয়। পুত্রটী হবার পর হতেই তাঁর মনোকষ্ট আরম্ভ হয়, কারণ আমার পিতামহীর মেজাজ নতুন ধরনের ছিল। তিনি ঐ ছেলেটীকে মা'র কোলে আদবে দিতেন না। এর কারণ আর কিছু নয়, সুধু কৰ্মফল,—সুখের সংসারে দুঃখ—হরিষে বিষাদ। পিতামহীর মনে এই ভাব যে, এ ছেলে দাই রেখে আমি পালন করব; ও মা'র কাছে গেলে আমার প্রতি বেশী ভালবাসা হবে না; এ ছেলে আমাকে মা বলে ডাকবে। ফলে হ'লও তাই, কিন্তু মার প্রাণ সর্বদাই একবার কোলে

নেবার জন্য উৎসুক হত। আমার ঠাকুরমা যেদিন বড় বে'নের বাড়ী বেড়াতে যেতেন, মা যেন সেদিন একটু আনন্দ পেতেন। ঘরে বস্ত্র অলঙ্কার খাত্তাখাত্তোর, কোন বিলাসের দ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না। তবে সর্বদা ঘরে রুদ্ধ অবস্থায় থাকাই তাঁর ব্যবস্থা ছিল। আর তার উপর প্রথম কণ্ঠাটী হয়ে মরে' যাওয়ার পরে ছেলেটি হ'ল, তাকে নিয়ে যে একটু আনন্দ করবেন, কি একটু কোলে নেবেন, তাঁর অদৃষ্টে সেটিও ঘটেনি। ঠাকুরমার অনুপস্থিত হওয়া শুনেই মা অমনি আমার দাদাকে একবার ডেকে কোলে নিতেন। একদিন এইরকমে তাঁর স্তনপান করাবার সাধ হয়। সেদিন একেবারে তুমুল কাণ্ড হয়। পুরানো ঝি মা'র কাছে চুপি চুপি মন রক্ষা করে' ডেকে এনে “খোকাকে নাও বোঁঠাকরণ” বলে দেয়। আবার ঠাকুরমা সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসতেই পুরানো ঝি সংবাদ দাখিল করেছেন—মা, আজ বোঁঠাকরণ খোকাকে দুধ খাইয়েছেন। আমার পিতামহী স্বর্গগতা দেবী। আমার তাঁর নিন্দা করা যদিও অন্যায় হয়, এটি যদিও মনে আছে, কিন্তু লিখতে গেলে সত্যই লেখা উচিত। তিনি কিছু খোসামোদপ্রিয় লোক ছিলেন, লাগানো কথাটা খুব শুনতেন। তিনি যদিও বিছাবতী ও গুণবতী ছিলেন। এমন কি, আমার পিতামহ যখন বায়ুরোগে পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি নিজে অগিদারী সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা দেখতেন। কিন্তু ঐদিন ঐ কারণে আমার মা'র বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ছেলে কোলে নেওয়া সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ঝি'য় প্রতি কড়া হুকুম জারি হয়—খবরদার আর কখনও খোকা দোতলায় না যায়, ও ছেলেকে মেরে ফেলবে। এখনকার বোঁঝিরা কেমন গানবাজনা করে, স্বচ্ছন্দে সুখে বেড়ায় ;

কিন্তু আমার মা ঘরের বারান্দায় বেরতে পারেন নি, মনের কন্টেই দিন গত হয়েছে। যদি কোনদিন ঠাকুরমা কোথায়ও বেড়াতে যেতেন, তবে একবার উঠান দেখবার সাধ হত, বেরিয়ে দেখতেন, ও মনে কত আনন্দ হত। তবু রাস্তা কি গাড়ীঘোড়া দেখবার সম্পর্কও ছিল না। এ উঠানে কি আছে? আছে একটা বোজানো পাঠকুয়া, আর একটা জলযুক্ত কুয়া। বৃহৎ উঠান, তিনদিকে রোয়াক, আর একদিকে চৌতলা-সমান প্রাচীর। এই দৃশ্য দেখতে মা'র বাসনা হত। আমার এ গল্প শুনে বড় আক্ষেপ হয়। পরে আরও শুনে আশ্চর্যান্বিত হই যে, একদিন ঠাকুরমা তাঁর মাসীর বাড়ী গেলেন, মা অমনি উঠান দেখতে বেরিয়েছেন। একটা দাসীর মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন; একটু পরে উঠে আবার কুয়া ও উঠান দেখছেন। এমন সময় আমার ঠাকুরমা এসে পড়েছেন। তখন যদি দাঁড়িয়ে ঘরে যান, তাহলে নীচে থেকে দেখা যায়। অগত্যা কি করেন, বুপ্ করে বসে পড়ে, অমনি শুয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঘরে যান। এইরূপ নানা প্রকার মানসিক কন্টে কাল যাপন করেন। পরে আমার জন্ম হয়, ও খুব আনন্দোৎসব হয়। ঠাকুরমা খুব ভালও বাসতেন, তবে দাদার মত নয়। সেজন্য আমার পালনভার মায়ের উপরেই ছিল। আমার কাছে একটা চাকর ও একটা বি ছিল, আর ঠাকুরমার ও ঠাকুরদাদার দৃষ্টি অষ্টপ্রহর ছিল।

আমার পিতামহী ত্রিতলের উপর শুতেন। যখন আমার পিতামহের খাওয়া হয়ে যেত, পরে তিনিও আহার করে উপরে যেতেন। দোতলার ঘরে বি চাবি বন্ধ করে, আমার পিতামাতার সংবাদ এনে দিত। পরে ঠাকুরের প্রসাদী বেলফুলের গড়ে, মিঠা পানের দোনা,

রূপার ক্রপের মালা, গামছা, জলের রূপার ঘটি, আর একজন লণ্ঠন নিত। এই সকল অনুষ্ঠান সমাপন কবে, পরে তেতলায় উঠতেন। আমরা ঠাকুরমাকে দিদিমা বলে ডাকতুম, ঠাকুরদাদাকে কর্তামণি বলে ডাকতুম, এখন হতে সেই নামেই অভিহিত করব।

ভোরবেলা আমি ভূমিষ্ঠ হই। খুব আনন্দ হতে লাগল। বাজনায় বাড়ী ভরে উঠল। ছেলের কোলে মেয়ে হলুম কিনা। আর লোকে বলে যে, আমার নাকি একটু রূপলাবণ্যও হয়েছিল। আমাদের এক কবিরাজ মহাশয় ছিলেন। তিনি বোজ প্রাতঃকালে ও বৈকালে দুইবার সব বাড়ী একবার একবার ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন, কে কেমন আছে। বাবুবা ও মায়েরা সুধু প্রণাম নিয়েই ক্ষান্ত হতেন, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি ও দাসদাসী সকলেই—কেউ কবিরাজদাদা ও ছেলে বলে আবদার করত আর হাত দেখাত। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন ছ'বছরের, আমি কবিরাজ ছেলেকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির করে' তুলতুম। আর মিছে করে বলতুম—ছেলে, আজ আমার বড় গায়ে ব্যথা। মাথা ধরেছে বললেই বলতেন—হাত দেখি, ছ', নাড়ি চঞ্চল, আজ আর ভাত নয়। আমরা তখন হাসতে লাগলুম। আমি ও আমার দাদা দুজনেই কবিরাজ ছেলেকে নিয়ে এইরূপ আনন্দ করতুম। কিন্তু ছেলে এত ভালমানুষ ছিলেন যে, এতে কোনদিন তাঁর একটু রাগ বা বিরক্তির ভাব দেখতে পাইনি। তিনি থাকতেন আর খেতেন আমাদের বাড়ীর আর এক অংশে, আমার পিতার ছোটকাকিমার কাছে, আমার ছোটদিদিমার বাড়ীতে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড সাতমহল ছিল। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, বৃহৎ পরিবার হলেই ক্রমে ক্রমে খুঁটিনাটি

সামান্য কারণে পৃথক হয়ে পড়ে। এঁরাও এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হন। আমার পিতামহরা তিন ভাই ছিলেন। আমার কর্তামণি মেজ ছিলেন। এঁরা দুজনে সম্মুখের অংশ আধা আধি পান। পশ্চাৎ ভাগটা ছোটনাদামহাশয়ের ভাগে পড়ে। কিছু লম্বা অধিক ছিল। ঐখানে ঢোলের মহল নামে একটা মহল— তাতে ঐ কবিরাজ মহাশয়ের বাসা ছিল। কবিরাজ মহাশয় সব বাড়ী ঘুরে শেষে বাসায় যেয়ে ছোটমার সঙ্গে দেখা করে, একটু তত্ত্বাবধান করে, পরে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর খবরাখবর দিতেন ও গল্পগুজব করতেন। ছোটদিদিমার কথা যখন পেড়েছি, তখন যতটুকু সংক্ষেপে পারা যায় তাঁর দোষগুণ কিছু বলা চাই। তিনি বড়ই চতুরা ছিলেন, এবং একটু বেশীরকম স্পষ্টবক্তা ছিলেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে প্রায় সকল লোকের বনিবনাও হত না। আমার দিদিমার কাছে যা শুনেছি তাই লিখছি। এতে গুরুজনের নিন্দাজনিত পাপ আপনারা মাপ করবেন। তাঁর জন্মেই বিবাদবিসম্বাদ বাধে, ও বাড়ীটিতে রাতারাতি বিস্তর রাজ লেগে প্রাচীর উঠে যায়। এমন কঠিন পণ যে রাত্রি প্রভাত হলে কেউ আর কারোর মুখদর্শন করব না। এই সকল ভাব বহুদিন স্থায়ী হয়। তবে প্রথম প্রথম কি পাঠানো ও খবর নেওয়াটা ছিল। সেজন্য আমার জন্মাবার পরেই ছোটদিদিমা তাঁর একটা পুরানো কিকে পাঠান। সে দেখে গিয়ে কি বলে, ভগবান জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যেমন কবিরাজ ছেলে বলেছেন—ছোটমা, আজ মেজমার ওখানে বাবুর একটা চমৎকার খুকি হয়েছে, যেমন রং তেমনি একমাথা কৌকড়া কৌকড়া চুল আর বাটাপানা মুখ, ঠিক তাঁদের মত মেয়েটী। এ সকল অসহ্য কথা ছোটদিদিমার সহ্য করা

স্বকঠিন হয়। তিনি একটু আওয়াজটা উচ্ছে চড়িয়ে বলেন—হ্যাঁ, এই যে স্বর্ণ দেখে এসে বললে যে সর্পমাথা কোটরচোখী পেঁচামুখীর মত এক কন্যা হয়েছে, শুনেছি বাছা শুনেছি! এখন পাঠক পাঠিকারা শুনুন, এটা অসামান্য রূপের বর্ণনা বটে। দুটোর মধ্যে যেটা হয় বিশ্বাস করুন, তবে যদি আমার উপর বিচাবের ভার পড়ে, তাহলে তা'তে দর্পণের আবশ্যক। তাতে আমি দেখেছি আমি কিছুই নয়,—স্বরূপা নয় আর কুরূপা নয়, একটা মানবী মূর্তি এই পর্য্যন্ত।

তবে শুনুন। আমার মা আমায় পেয়ে বড়ই খুসি হন। একেত প্রথম কন্যাটি মারা যায়, আবার ছেলেটিকে নিয়েও আনন্দ করতে পান নি। সেজন্য আমার দিনের মধ্যে চারপ্রকার সাজ বদল হত। আর দিদিমাও খুব ভালবাসতেন। তিনি আপন হাতে রোজ রূপটান্ মাখাতেন, এটি একটা আগেকার প্রথা ছিল। তাঁরা বলতেন যে এতে শরীর পোষ্টাই আর সুশ্রী হয়। এর অনেক তদ্বির ছিল, ও অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করা হত। বাদাম, পেস্টা, পোস্ট, জাফরাণ, মোমদিস্তা, দুধ, সর, কুসুমফুল—এই সকল জিনিষ মোলায়েম করে বেঁটে, দুধ ও ময়দা দিয়ে গোলা হ'ত। তাই মাখানো হত, তার উপর বেসন, তারপর উত্তম সাবান মাখানো হত। এতে আমার শরীরটা খুব ভাল ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে অতিশয় স্থূল হল, তা'তে তখনকার দিনে নিন্দনীয় ছিল না, বরং আনন্দই ছিল। তার উপর আবার রংটি সাদার উপর গৌলাপী ছিল, সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। আবার নাকটা টি কলো ছিল, চোখ দুটি মাঝামাঝি ছিল। ভুরু ছোড়াটিত আমার দর্পণে অতি করুণ্য ঠেকে, কিন্তু সে কালে আমার

জন্ম হয়, তখন এর বড় বেশী সুখ্যাতি ছিল। ঠোঁট দুটো অবশ্য পাতলাই ছিল। একশত আর মুগটা বড় খারাপ দেখায় নি। কিন্তু আমার যখন জ্ঞান হল সুরূপ ও কুরূপ বিচার করবার, তখন দেখতুম যে আমি একটা মানুষ— এই পর্যায়। তবে আমার একটা শোভা ছিল কিনা বটে—টাঁচর কেশ। আমাদের মেয়েমহলে বলে কেশেই বেশ। এটা আমার প্রচুর পরিমাণে ছিল। যাই হোক, এর বর্ণনা কিছু বিস্তর হয়ে পড়ল। মোটের উপর পাঠিকাগণ এই বুঝবেন যে, সে আমলে আমার রূপের খুব নাম ছিল। আমার কর্তামণিও এই রূপে ভুলেছিলেন। তিন মাস বয়স থেকেই ছবি তোলা আরম্ভ হয়। আমাকে তিন মাস থেকেই ইডেন পার্কের হাওয়া খাওয়া অভ্যাস করানো হয়। আমাদের একটা দাদা ছিলেন, তিনি আমাদের খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি আমাদের বড় ভালবাসতেন। আর আমরাও তাঁকে খুব ভালবাসতুম ও আদর করতুম। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে বসতেন। আর গরম জলে বসানো থাকত দুধের বোতল, সঙ্গে সূজনী ও অয়েলক্রথ্ থাকত। এত হাঙ্গামা করেও আমরা হাওয়া খাওয়ানো চাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার আদর দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকে। আমার যেটুকু লেখা সাজ হয়ে গেল, এটুকু এই রূপেই আমার শোনা কথা। এইবার আমার পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এখন থেকে যতটুকু মনে পড়ে সেটুকু লিখব।

আমার কর্তামণির তিনটি ঘোড়া ও দুখানি গাড়ী ছিল। সকাল ৪টায় আমার বাবা ও আমি গাড়ী চড়ে মাঠে যেতুম। মা নিজে স্পিরিট ল্যাম্প চা তৈরী করে দিতেন। আমি ও বাবা দুজনে চা পান করে, গরম কাপড় পরে, জুতো মোজা ও টুপি এঁটে বেড়াতে

বেরতুম। তখন আকাশে তারা থাকত। যখন মাঠে পৌঁছতুম, তখন বেশ ফরসা হয়ে যেত। ছুটাছুটা ও খেলা খুব হত। দু'চার জন ইংরেজ বালিকার সঙ্গেও ভাব হয়েছিল। এইরূপ বেলা আটটা পর্যন্ত খেলা করে কোনদিন একেবারে বাড়ী আসা হত, আবার কোনদিন উইলসেন হোটেলে গিয়ে চা, বিস্কুট, কেক খাওয়া হত, আর মনের মতন খেলনাও কেনা হ'ত। পরে বাড়ী এসে কাপড় ছেড়ে একটু দৌড়াদৌড়ি হত। দাদাকে গল্প বলা হত, তাঁকে খেলনা দেখানো হত। তা ছাড়া বলতুম—আমি ভাই এই দেখলুম, ঐ দেখলুম; এটা কিনেছি, কেক কিনেছি। হয়ত কোনদিন দাদার জন্যে লুকিয়ে রুমালে কেক বেঁধে এনেছি। দাদাকে দিতুম। লজ্জেলুস্ ও চকোলেট প্রায়ই আনতুম। কেক রোজ আনতুম না, কারণ আমার দাদা পেটরোগা ছিলেন। তাঁর আহারাদির একটু বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল, কেক খাওয়া দিদিমা শুনলে বক্বেন। কিন্তু আমার ঠিক তার উল্টে। বললে আপনাদের অবিশ্বাস হবে যে, এত করে খাওয়া বোধহয় এত অল্প বয়সে কেউ খায় না। তা ছাড়া এ বয়সে আমি চঞ্চলাও খুব বেশী ছিলাম; কেউ কোন বিষয় নিষেধও করত না—এইটী আশ্চর্যের বিষয়। বেড়িয়ে এসেই কাপড়গুলি গয়ারাম চাকর ছাড়িয়ে দিলে। যিকে আমি বড়ই ভালবাসতুম, কারণ সে ছেলেবেলা থেকেই আমার লাগনপালনের ভার নিয়েছিল। সে আমার ইজারটী বদলে সাদা ইজার ও গাউন পরিয়ে দিলে। তখন আর আমায় পায় কে?—আমি কাপড় ছেড়েই, দাদার সঙ্গে একটু দুষ্টিমি করে, ছুটলুম অমনি পাণের বাড়ী। সেখানে আমার জ্যেঠামহাশয়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। আমার দুই জ্যেঠাইমা ছিলেন—বড়মা ও মেজমা।

এঁরা আমার ঠিক মাতৃস্নেহ দিতেন। আমার বড়মা খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল ঠিক কাঁচা সোনার বর্ণ, আর সৌন্দর্য্যে ঠিক দেবীপ্রতিমার মত ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তিনি পূজা অর্চনা নিয়েই বহু সময় অতিবাহিত করতেন। এঁর কাছে আমরা আদার বা খেলা করবার বড় ফুরসুত পেতাম না। বৈকালে একটু বসবার ঘরে বসতেন। কিন্তু আমার রোজ বেড়াতে যাওয়া ছিল ব'লে তাঁর কাছে বসা বা খেলা হয়ে উঠত না। তবে কোনদিন যদি বেশী বাদল হত, তাহলে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হত। সেদিন বড়মার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতুম। হয়ত তাসখেলা দেখতুম, নাহয় রামায়ণ শুনতুম। আর একটু একটু মুখস্থ করতুম—যোগসিদ্ধ মহা-তেজা, জনক নামেতে রাজা, আমি সীতা তাহার নন্দিনী। দশরথসুত রাম, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম, বিবাহ করেন পণে জিনি। শুভ বিবাহের পর, গেলাম শশুর ঘর, কতমত করিলাম সুখ, শশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ী-গণের তত, নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক। হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড। কুঞ্জ দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা, মোরে বিধি কৈল লগুভণ্ড। আমি কন্যা পৃথিবীর, স্মামী মোর রঘুবীর, মোরে বন্দী কৈল নিশাচর। সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস বিরচিত, সুললিত গীত মনোহর ॥ এটুকু আমার প্রথম মুখস্থ বিছা'র নমুনা।

আমার মেজমা ঠিক তাঁর দু'টী মেয়েকে যেমন ভালবাসতেন ও আদর করতেন—আমাকে তেমনি করতেন; বরং আমি তাঁর কাছে বেশী আদার করতুম। দুষ্টামীর জন্ম মা'র কাছে ধমক খেতুম কখনো কখনো। সেজন্ম তত আদার জানাতে সাহস হত না। মেজমার কৈ

মাছে বড় ডিম বেরলে, আমি যদি তখন ও-বাড়ীতে থাকতুম তাহলে সেটা আমার মুখে না দিয়ে তিনি কখনো বড়দিদি কি ছোটদিদিকে দেন নি। আমসত্ত্ব দিয়ে কলা ক্ষীর ভাত কি পরমান্ন মাখলে আমরা বসে খেতুম। আমরা সবাই মিলে খুব দৌড়াদৌড়ি ও লুকোচুরি খেলতুম। এমন কি, এক এক দিন আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে হত না। জোর করে চাকর এসে ধরে নিয়ে যেত।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে ।

(সিংহল থেকে নেপাল)

(১)

কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতন ।

[অনেকের বোধ হয় মনে আছে যে, বছর পাঁচেক আগে বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ এবং পুরাতত্ত্ববিৎ আচার্য্য সিল্ভা লেভি সন্দ্রোক বাঙ্গলা দেশে এসেছিলেন, এবং নেপালে গিয়েছিলেন । তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অমায়িক ব্যবহারে বাঙ্গালী বন্ধুগণ যেমন আকৃষ্ট, তাঁর পল্লীর সৌজন্য ও সহৃদয়তায় মেয়েরাও তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন ।

আমাদের সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আপনার লোক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সুদূর স্বদেশে ফিরে গিয়েও যে এই “ক্ষণিকের অতিথি” আমাদের ভোলেন নি, তার প্রমাণ তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত উল্লিখিত পুস্তকপ্রেরণে ও পুস্তকাস্তর্গত বর্ণনেও পাওয়া যায় । সেই অনাড়ম্বর স্বল্পভাষী প্রোঢ়া রমণীর মধ্যে যে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লুকানো ছিল, তা' এই পুস্তকপাঠ ভিন্ন আমাদের জানবার উপায় ছিল না । হাক্কা হাতের ছ'চার টানে তিনি এই নব নব দৃশ্যবটনা-বহুল বিদেশভ্রমণের যে জীবন্ত ছবি এঁকেছেন, তা' অনুবাদের মলিন দর্পণে প্রতিফলিত খণ্ডিতাকারেও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হবে বলে' আমাদের বিশ্বাস । যারা এ দেশের নিছক প্রশংসা শোনবার আশা করবেন, তাঁরা হতাশ হবেন তা আগেই বলে রাখছি । কিন্তু পরের চোখে নিজেদের কেমন দেখায় জানবার জন্ত যাদের কৌতূহল আছে, তাঁরা এই বিদেশিনীর দৈনিক লিপি থেকে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন এই ভরসায়, লেখিকার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আমি তাঁর ভ্রমণকাহিনীর কিস্তদংশ অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলেম । জনতে পাই তিনি বাঙালীতে যে চিঠি লিখতেন, এই বইখানি তারই সংগ্রহ ।

শ্রী ইন্দিরা দেবী ।]

সিংহল।—বন্দরে লাগবার হৈচৈয়ের মধ্যে, মঙ্গলবার ১লা নবেম্বর ১৯২১, ১১টার সময় আমরা জাহাজ থেকে নাবলুম। সিংহলী সুন্দরীর প্রথম নমুনা;—দু’টি মেয়ের পরণে একইরকম ছোট সাদা কুর্তা, গায়ে বেশ চোস্ত বসা, কোমরে বেশ কমে’ ঝাঁটা, কুণ্ডুই পর্যন্ত আস্তিন, লম্বা সায়া; একটু নড়লে চড়লেই বেশের দুই অংশের মধ্যে শরীর দেখা যায়। পুরুষেরা সামাজিক অবস্থা অনুসারে কমবেশী কাপড় পরে; রিক্শ বা পুস্পুস্টানা কুলিদের পরণে এক জাগিয়া মাত্র, কিন্তু প্রায় সকলেরই একটি করে’ ছাতা আছে। আমাদের সভ্যতা যা’ কিছু বিস্তার করেছে, এমন কি তামাক এবং মদের চেয়েও, এই জিনিষটিরই আদর বেশি হয়েছে বলে’ বোধ হয়। এটি সবরকম কায়দায়, এমন কি পিঠে বুলিয়েও লোকে নিয়ে বেড়ায়।

রাস্তায় ছোট ছেলেদের চোখের বাহারে বড় সুন্দর দেখায়; তাদের খালি গা, কখনো কখনো কোমরে একটা ছোট ঘুন্সি বাঁধা; কখনো কখনো এই ঘুন্সিতে ঝোলানো একটি হর্তনাকার রূপালী পদক আমাদের আদিম পিতার আঙুরপাতার স্থান অধিকার করে।

* * * * *

আমরা এখানকার একটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক—র সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি কেঁচে স্বদেশী পোষাক ধরেছেন, আগা-গোড়া সাদারঙের নরম কাশীরেশমের কাপড়, খালি পায়ে চাপ্লি জুতা। তাঁর স্ত্রী এলেন, সাদার উপর গোলাপীরঙের এক ইংরাজ রমণী, পরণে ফল্‌সাইরঙের সুন্দর সাড়ী; অবশ্য ইংরাজসমাজ এঁদের প্রতি বিমুখ।

এঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, ধারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় এসে আমার ঘেন চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল, আমি থমকে দাঁড়ালুম; ফলের মত রাঙা রাস্তা, নানা প্রকার সুগন্ধী গাছ, মাটিতে বারে'-পড়া ফুলের আন্তর, যেন মশলা-দেওয়া এই সকল তীব্র সৌরভ,—বোধহয় কল্পনার চোখে অমরাবতী দেখতে গেলে এইরকমই দেখে থাকি। সূর্য্য যে আকাশে অস্ত যাচ্ছে, সে আকাশ যেন নাটকের রঙ্গমঞ্চ, সেখানে ভয়াবহ মেঘ দ্রুতবেগে চলাফেরা করছে, তাদের রঙে চোখ ঝলসে যায়,—এমন সময় হঠাৎ সন্ধ্যার ছায়া নামল। মস্ত মস্ত কাকের বাঁক এক এক জায়গায় জড় হচ্ছে, বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে, আকাশ ঝঙ্কার করে' ফেলছে।

বুধবার, ২রা—আজ সকালে আমরা কলম্বো থেকে ক্যাণ্ডি যানার প্রচলিত পথে যাত্রা করলাম। এ রাস্তা বিখ্যাত ও বহুবার বর্ণিত :—গ্রাম, থরকাটা ধানের ক্ষেত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের বন, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সেই ফুলের সৌন্দর্য্য যা'তে মনকে কিছু অভিভূত করে' ফেলে। এক জায়গায় করাতের কারখানায় একটা হাতী কাঠের বোঝা তুলছে; আর কিছুদূরে এক নালায় একটি ছোট্ট কুমীর অগ্রভঙ্গী করছেন।

* * * * *

বৃহস্পতিবার, ৩রা—শ্রীযুক্ত ক—দের সঙ্গে শেষ বিদায় নিয়ে, ও কিছু সওদা করে' আমরা ভারতবর্ষে যাবার গাড়িতে উঠলুম। কারণ সিংহল ভারতবর্ষ নয়,—এ কথা আমার সঙ্গী অবজ্ঞাতরে আমাকে বলেন।

আর সে কথাটাও ঠিক। কেননা জল প্রণালীটুকু পার হয়েই চোখে পড়ল—লম্বাচিওড়া কৌচানো কাপড়, হাতের কব্জায়, উপর হাতে, পায়ের গোছে ও নাকে গয়না, অলঙ্কাররাশি ধারণের জন্য কানের উপর নীচে চারিদিকে বিঁধনো। আমাদের ক্যাকাসে রঙে ঘে সোনার ছেজা খোলে না, এই সব শ্যামলা রঙের উপর সেই সোনা তার স্বাভাবিক ভেজ ধারণ করে ও নিজ ভাস্বর দীপ্তিতে পূর্ণমাত্রায় শোভা পায়। ছোট মেয়েরা স্বভাবের সরল বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাথায় ফুল গৌজা, ছোট খোঁপার চারদিকে ফুলের মালা জড়ানো। এ দেশ সুন্দর চোখের দেশ, এত বেশি বড় চোখ যেন সমস্ত মুখটাকে গিলে খায়। এ দেশের পেটগুলিও বিলক্ষণ বড়; হতভাগা ছোঁড়াগুলি কি খায় তা' মহাদেবই জানেন!

আমরা ঠিক করেছিলুম দক্ষিণের মন্দিরগুলি দেখে যাব, তা' বহুই সময় লাগুক; কিন্তু আমার সঙ্গী কাজ আরম্ভ করবার জন্য বাস্তু, তাই মাদুরা ছাড়া কিছু দেখা হবে না। সে এক প্রকাণ্ড সহর, সেখানে হোটেল নেই, কেবল যাত্রীদের জন্য ষ্টেশনেই কতকগুলি ঘর ঠিক করা আছে; এখানকার বাসিন্দারাই এখানে একলা রাজত্ব করে।

এক বুড়ো ব্রাহ্মণ সম্ভাবিত যাত্রীর আশায় ষ্টেশনের রোয়াকে অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের মত সহজ শিকার পেয়েই চেপে ধরলে, আমরাও তৎক্ষণাৎ মন্দিরে চল্লুম। তার বর্ণনা কে করবে? মন্দির কি একটা?—না, মন্দিরের সার চলেছে, “গোপুরম্”গুলির উপর উচ্চ চূড়া, বোঁধকরি আটটি হবে; তার ভিত্তির গায়ে এমন এক আঙ্গুলপরিমাণ জায়গা নেই যা হাজার রকমে খোদিত, চিত্রিত, ভূষিত নয়; শত শত সহস্র দেবতার মূর্তি। কিন্তু এগুলি ত কোন্ হার; সেই

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য থাম ওয়ালা দালান দেখতে হয়। একটার মধ্যেই বোধহয় অমন হাজার থাম; দেবদেবী ও অবতারের মূর্তি, দেয়ালের মাথায় হাতী, বাঁদর সাপ, মাছ ও বিশ্বের জন্তুকানোয়ারের লক্ষ্য, টানা পাড়, রূপকের ছবি প্রভৃতি অনবরত চলেছে, রাশিকৃত হয়েছে, মূর্তি ও গঠনের এমন ভিড় জমিয়ে তুলেছে যে মাথা ঘুরে যায়। 'মাইলের পর মাইল ধরে' এইরকম তিনিস—বিষ্ময়কর, ভয়ঙ্কর, অমানুষিক, মুগ্ধকর। এই ব্যটার মুখে আমাদের গরীববেচারি পাশ্চাত্য কল্পনা-শক্তি ধ বনে যায়। * * * * * এও কি সম্ভব যে, এই পাগলের মত দু'হাতে কবে' বিলিয়ে-দেওয়া কল্পনার ঐশ্বর্য আমাদের পশ্চিমের শিল্পী, আমাদের ভাস্কর, আমাদের কারিগরদের পক্ষে একেবারে গুপ্তহস্ত? আমাদের ওখানে কি এর কোন নক্সা বা নকল বা ছবি নেই? Angkor-এর পরিচয় আমরা সবেমাত্র পেতে আরম্ভ করেছি; কিন্তু কৃষ্ণ-ভারতবর্ষের মন্দির ত ভগ্নাবশেষ নয়, সেই জগুই তার এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ; তার অলি-গলিতে, দরদালানে সর্বদাই আনা-গোনার ভিড়, গ্রামসুন্দর লোক সেখানে কিলবিল করছে। একটি দেউড়ির মধ্যে এক ছোটখাটো বাজার বসে গেছে; দোকানদাররা ভক্তদের কাছে ফুল বিক্রী করছে, যে মালা দিয়ে তারা দেবমূর্তি সাজাবে, যে ভস্ম, সিঁদূর, মাখন ও তেল তাদের দেবতাকে মাখাবে, সেই সব সরবরাহ করছে। সবরকম জাতের, সবরকম শ্রেণীর পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেমেয়ে যাচ্ছে আসছে, স্নান করছে, শুয়ে রয়েছে, বেড়াচ্ছে, পূজা করছে, গল্প করছে, খেলছে; 'গরু ও কুকুর যেমন রাস্তায় ভেমনি এখানেও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কড়িকাঠে ঝোলানো খাঁচার টিয়েপাখী চাঁচামেচি করছে; হাজার হাজার পাখী বাসার দিকে

উড়ে চলেছে, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এল। এই সব আলো, এই সব ফুল, এই সব অনাবৃত শরীর থেকে কি এক গুরুভার ঘনমধুর গন্ধ উঠে যেন গলা চেপে ধরছে।

আমাদের ব্রাহ্মণটি সবার কাছেই জাঁক করে' বলে' বেড়িয়েছেন যে এই ফরাসী ভদ্রলোকটি মস্ত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত, তাই সর্বত্রই আমরা লোকের আশুকুল্য পেয়েছি। একটা ছোট মন্দিরে—অবশ্য সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ—একটি শৈব পুরোহিত আমাদের মালা দিলেন (পঞ্চমুদ্রা, এবং ভাঙ্গানো টাকা অতি যাচ্ছেতাই!)।

* * * * *

রবিবার ৬ই মাদ্রাজে কাটিয়ে, আমরা ৮ই সকালে কলকাতা পৌঁছতেই ঠাকুরমশায়ের ছেলে র—র সঙ্গে দেখা হল, এবং তার সঙ্গে তাঁদের সহরের মধ্যস্থিত পুরাণো বাড়ী অথবা পুরাণো প্রাসাদে গেলুম। এইবার আমরা হিন্দু জীবনশ্রোতে মগ্ন হলুম।

পাশের একটি প্রাসাদে কবির দুই ভাইপো বাস করেন, অ—এবং গ—; দুজনেই বনেদী ঘরের মস্ত বড় চিত্রকর। তাঁরা এখনো সেকালে নিয়মানুসারে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত, অর্থাৎ একত্র থেকে একই সম্পত্তির আয় ভোগ করেন। মেয়েরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। দশ বারোটি সুন্দর ছেলে এক সঙ্গে খেলা করছে। আমি দেখলুম মা, মেয়ে, বউ, বছর সত্তেরোর একটি অপূর্বসুন্দরী যুবতী, এক ঝাঁক চাকরদাসী, জন পঞ্চাশেক লোক হবে,—সে এক ছোটখাটো রাজ্যবিশেষ।

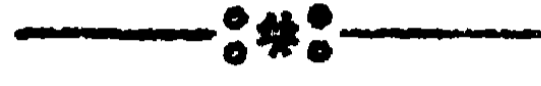
তার পরদিন আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছলুম।

নবম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

বায়তের কথা ।



আমার লেখা “বায়তের কথা” যখন সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে । এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি । সম্প্রতি তিনি আমাব অনুরোধে সেটি পড়ে, এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি চক্ৰিণপাতা চিঠি আমাকে লেখেন । এ পত্র অবশ্য দেখা হয়েছে চাপবার জন্য । সেই সঙ্গে তিনি আমাকে যে অপর একখানি পত্র লেখেন, তাতে তিনি পত্রখানি প্রথমে ভারতীতে বেন ছাপা হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন । রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মত “বায়তের কথা” সম্বন্ধে পত্রখানি আনি ভারতী সম্পাদিকাব হস্তে গুলু করি । কিন্তু সে চিঠিখানি ভারতীতে জঁমৎ রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে ;—পত্র প্রবন্ধের রূপ ধারণ করেছে । আমি পত্রের “তুমি” না থেকে প্রবন্ধের “সে” হয়ে গিয়েছি ; ভাষান্তরে পত্রের মধ্যম পুরুষ প্রবন্ধের উত্তম পুরুষ হয়ে উঠেছে । বলা বাহুল্য এই সামান্য পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের কথার চেহারা ফিবে গিয়েছে, যা ছিল সম্বোধন তা হয়ে উঠেছে জনান্তিকে । এই কারণে আমি ভারতীক উত্তমকে আবার রবীন্দ্রনাথের মধ্যমে পরিণত করে তাঁর পত্রখানি স্বরূপে প্রকাশ করছি ।

এ লেখা “টীকাসমেত” সবুজ পত্রে প্রকাশ করবার অনুমতি না চাইতেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন । গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আমি তাঁর পত্রের স্বরচিত পাদটীকাও এই সঙ্গে প্রকাশ করছি ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।

বায়তের কথা ।

শ্রীমান্ প্রমথ নাথ চৌধুরী,

কল্যাণীয়েষু ।

আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা উদ্ধমূল অবাঙশাখ । উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে : অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে । তোমার “বায়তের কথা” প’ড়ে আমার মনে হ’লো যে আমাদের পলিটিক্সও সেই জাতের । কংগ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিষটি শিকড় মেলেছে উপর-ওয়ালাদের উপর-মহলে,—কি আশা কি আশ্রয় উভয়েরই জন্মে এর অবলম্বন সেই উদ্ধলোকে ।

যাদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স । সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিস্থিতি উভয় ব্যাপারই বন্ধুতামঞ্চ ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিগ্ৰহ ইংরাজী ভাষা :—কখনো অমুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা । আর দেশে যখন এই প্রগল্ভ বাগ্বাত্যা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাম করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার স্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ’ন, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে, হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুঘলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক’রে বলছে, “অদৃষ্ট” ! দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব ।

সেই পলিটিক্স্ আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে বলভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বলচে “কালোমেঘ আর হেরব না গো দৃষ্টী”। তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিমান, এখন চলচে মান এবং বিচ্ছেদ। পাল্লা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেন “চাই” আজ তেমনি জোরেই বলচি “চাইনে”। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ কবেছি বটে যে, পল্লীবাসী জন-সাধারণের অবস্থার উন্নতি কবায়ে চাই। অর্থাৎ এরাই আশার আপন, ওরা আশার পর। কিন্তু “চাইনে, চাইনে” বলবার ছতকায়েই গলায় জোর গায়ের জোব চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু “চাই” জুড়ি, তাব আওয়াজ বড় মিঠী। যে অচিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল ধারোয়ারী জমিয়ে তুলতেই তা ফিরিয়ে যায়, তাবপরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু থাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নিঃশূণ দেশ-প্রেমের চর্চা কবেচি—দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপায়িক প্রেমচচার অর্থ যারা জোগান, তাদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যারা জোগান, তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই অর্থাৎ আমরা বাকি দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে ভাবা থাকে না। তাঁরা হতভম্ব প্রতাপহীন—কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চলত, তাহলে তাদের ডাকতে হত বটে,—সে কেবল খাজনা বন্ধ ক’রে মরবাব জন্মে; আর বাদেব অঙ্ক-ভক্ষা ধনুগুণ, তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়ি হয় দোকান বন্ধ ক’রে হরতাল করবাব জন্মে, উপর-ওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল নাকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া ক’রে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই বাংলার কথাটা মূলতবীই থেকে যায়। আগে পাণ্ডা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্জেস্টার পুরুক কোর্পান,—তারপর সময় পাওয়া যাবে বাংলার কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্স্

আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্সের সাজ ফরমাসের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্তে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদলে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে, ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্ করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সত্ত্ব মুখস্থ, কেন না আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেন্ট, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি ; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি ; কেন না গায়ের মাপ নেবার জন্তে মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্তেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্তে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনার আপনিত্তি আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেচে। জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারীতে আগে স্বরাজ পাব, তারপরে স্বরাজের লোক ডেকে বেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুৰ্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুনিশের পেরাদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, মহেশ্বরাজ সনাতনের ট্যাকসো, আর আছে ওকালতীর দ্রুৎষ্ট্রাকরাল সর্কশ্বলোলুপ হাদান

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্সে তোমার “রায়তের কথা” স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোংবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোংবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মঙ্গলাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে,— আগে গাড়ি টানাও, তাহলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই ; তারপরে পৌঁছনামাত্রই বথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্তে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল,

বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল ভাল-আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্ল্‌ তৈরী, তোমার গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্লের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তর্কিক, এত বড় উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও,—ঘোড়াটা যে চলে না, বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ক্যাসানের সাবধানী মানুষ, আশ্চর্যের খবরটা আগে চাও। এদিকে ভাল-ক্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘসচে ;—ঘরে আঁগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলচে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার “রায়তের কথা” সেই ঘোড়ার কথা—যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

(২)

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জেয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নর্জীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে, তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে—Made in Europe। যুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম্, কমুনিজম্, সিণ্ডিক্যালিজম্ প্রভৃতি নানা প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পথ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন যুরোপের বাধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাকুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটা রক্ত-পাতের ধ্বজা। বলচে পিষে ফেলো, দ’লে ফেলো; অর্থাৎ ধরনী নির্জমিদার নির্মহা-জন হোক। যেন জ্বরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাগী মারলে সে

মরে। এ কেমন, যেন বোয়ের দল বলচে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গা-যাত্রা করাও, তাহলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেবী করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। যুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে—তাদের সে তর সময় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স নিয়ে পার্লামেন্টার রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলাম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই যুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন যুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল কবেচে, তার মধ্যে মাটসিনি পারিবালাডিব সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাটোব পালা বদল হয়েছে। লক্ষ্যকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবাব তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। বৃদ্ধের দিনে ছিল রাজার মতিমা, এখন এক প্রজার মতিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আড়িনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বর্শেভিজ্‌ম্, ফাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে সব উত্থোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কাণ্ড-কারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জন্ম। অননি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে দেখতে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলাকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গৌরার্জুনের দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেই জন্তেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের

দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগানে। রাশিয়ার জ্বর-তন্দ্র ও বলশেভিক-তন্দ্র একই দিনের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে কোড়াটা বা হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায়, তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অগ্র লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সান্তিত্যে ইসারা চলচে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখন বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালার অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, মাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

(৩)

আমি নিজে জমিদার, এই জন্ম হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাচাতে চাই। যদি চাই তাহলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব-স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্যবুদ্ধি নয়, ওকে বিষম-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়ত শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের “নামে রুচি” আছে; কিন্তু কাল যখন “জীবেন্দরয়া”র দিন আসবে, তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাকলা। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তাহলে তা’কে দলে ফেললেও সেই

মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জেঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্যা ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, “রায়তের কথা”র পুরাতন দফতর ঘেঁটে তুমি সেই সুখ-স্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেচ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি, রায়তদের বল্চি “প্রজা”, তারা আমাদের বল্চে “রাজা”;—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যা'কেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জেঁকের চেয়ে ছিনে জেঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত, যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সন্ধ্যাবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাণ্ডার দোকানে বিক্রি

করতে কোনো বাধা না থাকে, তাহলে যার বইয়ের শেল্ফ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কি করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্ফ, বুদ্ধির চেয়ে অনেক মূল্য ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র দেখি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়—ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আমতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

(৪)

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সল্প হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের হস্ত-সমাসে তা আর টেকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম আকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রক্ষা করাতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কিনা, সে কথ এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত, তা হ'লে নীলের বন্ডায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মংলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ের এরা আজ নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অন্তুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন স্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে, তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে সরতানের সকল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-হচ্ছুরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় মিজ জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাতে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অস্ত্র চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত-সীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে

তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোট মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুংসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উন্টিয়ে মারা ওকালতী-কুস্তির মারাঅুক প্যাচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ৎ যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন “উচল” আইনও তার পক্ষে “অগাধ জলে” পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শূন্যতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্কদা মোটর চলাচল হয়, সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই, তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মত রায়ৎদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে? তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

(৫)

আমি জানি জমিদার নির্যোধ নয়। তাই রায়তের বেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও

তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা পাওনায় জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতি স্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা গ্যারান্টি। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতি সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছকাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কংগ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্মে এত জোড়াতাড়া, সে তত কাল পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রায়তের কথা ।

(টীকা)

রবীন্দ্রনাথ যে আমার “রায়তের কথা” দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এ আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা । আমি এ কথাটি তুলি এই আশায় যে বাঙলার বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোকেরা এ কথার বিচার করবেন । কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে মহামতি শিক্ষিত সম্প্রদায় আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি । ফলে এ বিষয়ে তাঁরা হাঁ না কিছুই বলেন নি । সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আমি পূর্বে যেমন সাধুভাষা বনাম বাঙ্গলাভাষার মামলা তুলেছিলুম এ ক্ষেত্রেও তেমনি পলিটিকাল সাধু মনোভাবের বিরুদ্ধে পলিটিকাল বাঙলা মনোভাবের মামলা তুলেছি । অতএব এ ক্ষেত্রে চুপ করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, নচেৎ তর্কের চোটে আমি লোকের কান ঝালা পালা করে দেব । আমি যে একজন নাছোড় তार्কিক তার পরিচয় যারা বাঙ্গলা জানেন তাঁরা পূর্বে যথেষ্ট পেয়েছেন । কিন্তু এ নিরবতার যথার্থ কারণ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন ।

আমারও একটা পলিটিক্‌স্ আছে, যুগধর্মের প্রভাব আমার মনের উপরও পূর্ণ মাত্রায় প্রভূত্ব করে । কিন্তু আমার পলিটিক্‌স্‌র প্রশ্নান ভূমি হচ্ছে বাঙলার জমি, বিলেতের আকাশ নয় । ফলে ও উড়ো পলিটিক্‌স্‌র মত বিচিত্র ও চমকপ্রদ নয় । মহাভারতে পড়েছি যে একটি হংস বলেছিলেন যে :—

“তোমাদের সাক্ষাতেই আমি উর্দ্ধগতি, অধোপতি, বেগ-গতি, সমগতি, ধীর-গতি, সম্যকগতি, বক্রগতি, বিচিত্রগতি, সর্বদিকে গতি, পশ্চাদ্গতি, স্কুসুমারগতি, প্রচণ্ডগতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্বদিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে উর্দ্ধগমন, শোভনগমন, মণ্ডলাকারে অধঃপতন, শোভনভাবে উর্দ্ধগমন, শোভনভাবে অধঃপতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষাসহকারে গমন,

পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতিগত কাক-সমুচিত বহুতর গতিতে বিচরণ করিব।”

আমি দেশের লোকের কাছে উক্তরূপ বিচিত্র শূণ্ণলীলা প্রদর্শন করতে অঙ্গীকার কল্পিনকালেও করিনি, কারণ পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি যে নিজদেহে ধারণ করিনে—এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল, এখনও আছে। আর যে পলিটিক্সের শিকড় দেশের মাটিতে-বন্ধ সে পলিটিক্স যে উঁচু নজরের লোকের চোখে পড়বে না, সে ত ধরা কথা।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার কি এমন কোন মঙ্গদাতা বন্ধু ছিলেন না যিনি আমাকে এই মেঠো পলিটিক্স থেকে বিরত করতে পারতেন? বন্ধু ভাগ্যে আমি একেবারে বঞ্চিত নই। আর সকলেই জানেন, বন্ধুমাতেই বন্ধুর মন্ত্রী যেমন স্ত্রী মাতেই স্বামীর প্রাইভেট টিউটার। তবে যে আমার বন্ধুবর্গ আমাকে পলিটিক্সের বহুজনসেবিত শূণ্ণমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন নি, তার কারণ, তাঁরা জানেন যে আমি পলিটিসিয়ান নই, সাহিত্যিক। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে লোকের মুখে লাগাম দেওয়া চলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। আর সাহিত্যিককে সামাজিক করবার চেষ্টা যেমন বৃথা তেমনি অনর্থক।—দেশের সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিসিয়ান হয়ে ওঠে, তাহলে পাল্টা জবাব দেবার জন্ত সব পলিটিসিয়ান রাতারাতি সাহিত্যিক হয়ে উঠবে। ফলে মনোরাজ্যে কি ভীষণ অরাজকতা ঘটবে তা ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু যদি কাব্য লিখতে শুরু করেন আর মোলানা মহম্মদ আলি দর্শন, আর আমরা তা পড়তে বাধ্য হই, তাহলে কোন সাহিত্যিক না বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার জন্ত ছটফট করবে। এই সব কারণে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আমার মুখে হাত দিতে চেষ্টা করেন নি। “যার কন্ম তারে সাজে”—এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। আসল কথা হচ্ছে সাহিত্যিকের পলিটিক্স একেলেও নয় সেকেলেও নয় তেকেলে’। সুতরাং তা একালের সঙ্গেও খাপে খাপে মিলে যাবে না সেকালের সঙ্গেও নয়, অথচ ও দুকালের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে।

(২)

আজকাল এমন কোনও কথা বলবার যো নেই, আর পাঁচজনে যাকে একটা ism-এর ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা না করবেন। তা যদি না করেন, তাহলে তাঁরা যে শিক্ষিত তা কি করে প্রমাণ হয়? আমি যে ism নাস্তিক তার পরিচয় বোধ হয় আমার রায়তের কথার পত্রে পত্রে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথও সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিনডিকালিজম প্রভৃতি কথায় ভয় পান এবং কেন ভয় পান সে কথা তিনি তাঁর পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। ও সব ধর্ম ভারতবর্ষের নয়। কেন যে নয়, সংক্ষেপে তা বলছি।

কালী, তারা, মহাবিঘ্না প্রভৃতি যেমন একই আত্মশক্তির বিভিন্নমূর্তি—সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতিও Capitalism-এবই বিভিন্ন মূর্তি। এ কথা এতই সত্য যে স্বয়ং লেনিন কমুনিজম ওরফে বলসেভিজমের নাম দিয়েছেন State Capitalism.

এই Capitalism জিনিসটে কি? ওর জন্ম হয়েছে industrialism থেকে। যতদিন ইউরোপে industrialism থাকবে ততদিন Capitalism-ও থাকবে, বদল হবে শুধু ওর নামরূপে।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যেদেশে industrialism নেই সে দেশে সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতি, যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথার সামিল। এ জাতীয় শিরঃপীড়ায় লোক অবশ্য ভীষণ আর্তনাদ করতে পারে যেমন খালিফের অভাবে খিলাফৎ করছে, কিন্তু সে চীৎকার ধ্বনিতে সহজ লোকের কান্না না পেয়ে হাসি পায়।

আমাদের দেশে এই রায়তের সমস্যাটা হচ্ছে non-industrial-সমাজের সমস্যা। এ বিষয়ে Bertrand Russel-এর কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। রাসেলের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইউরোপের পলিটিক্সের ভাব-রাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই, সুতরাং তাঁর কথা শোনা যাক।

“In a non-industrial community, liberal ideals, if they could be carried out, would lead to a division of the national wealth between peasant proprietors, handicraftsmen and merchants. Such a society exists at this day in China, except in so far as it is interfered with by foreign capitalists and native military commanders. The latter revert to the right of the sword, the former introduce fragments of modern industrialism.”

(Prospects of Industrial Civilization, p. 55.)

বলা বাহুল্য যে ইকনমিকালি ভারতবর্ষ ও চীন সমবস্থ। আমি “রায়তের কথায়” বাঙলার রায়তবা বাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে সেই প্রস্তাবই করেছি। এতে শুধু প্রজার নয় সমাজেরও মঙ্গল হবে। আমি রায়তের পক্ষ থেকে যে সব ছোট গাটো অধিকারের দাবী করেছি সে সব অধিকার লাভ করলে বাঙলার রায়তের দল peasant proprietorship-য়ের দিকে আর একটু অগ্রসর হবে। চীনের রায়তের অপেক্ষা বাঙলার রায়তের অবস্থা এক বিষয়ে ভাল। আমাদের দেশে কোনও native military commanders নেই যারা তরবারীর সাহায্যে রায়তের সম্বন্ধ অপহরণ করতে পারে। Foreign Capitalist অবশ্য দুই দেশেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে একদল রায়ত-বন্ধুর সম্মান পেয়েছেন যারা নাকি শুধু দলে ফেলবার পিষে ফেলবার, পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যে মতই প্রচার করা যাক না, লোকে তা নিজের বুদ্ধি ও চরিত্র অনুসারে অস্বীকার করবে। এবং এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীতে বহু নিকোঁধ লোক আছে এবং নিকোঁধিতার সঙ্গে ছুষ্টবুদ্ধির সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে মেলে। সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়ের উপসর্গ ফুড়ে দিতে অনেকে লালায়িত। এর জন্ম মানুষে ছুঃখ করতে পারে, কিন্তু চূপ করে থাকতে পারে না। ধর্মের অর্থ যে অনেকের কাছে বিধেব বুদ্ধি

তার প্রমাণ ত হাতে তাতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য অবশ্য ধর্ম দায়ী নয়। আর যেখানে মামলা হচ্ছে ধর্মের নয় অর্থের—সেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎস্য্য প্রভৃতি রিপূর স্কুর্তি ত হবেই। সে বাই হোক “রায়তের কথা” যে riotএর কথা নয় তা বোঝবার মত ভাষাজ্ঞান আশা করি অধিকাংশ পাঠকেরই আছে।

(৩)

রায়তকে তার দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জোত হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ আছে। তাই তিনি হস্তান্তর করবার পক্ষে আমার কি বলবার আছে তা শুনতে চেয়েছেন। “রায়তের কথায়” এ বিষয়ে আমি কোনও আলোচনা করি নি। এই মাত্র বলেছিলুম যে, এ ব্যাপারের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব কথা বলবার আছে সে সব কথা আর যার মুখেই শোভা পাক্ বাঙলার অধিকাংশ জমিদারের মুখে শোভা পায় না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা যা দেখেন, তা প্রজার হিতাহিত নয়—দেখেন শুধু দাখিল-খারিজের নজরের তারতম্য। যে ব্যাপারে নিজের পকেট ভারি হয় তাতে যে অপরেরও হিত হয় এ রকম মনে করায় বিশেষ আরাম আছে। পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ঐ রকম বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মন সহজেই অনুকুল।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে, মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেন না তাঁর জমিদারী সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলা গিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাঙলার জমিদার মাত্রই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique. আমি সেই সব জমিদারের কথা বলেছি, যারা শতকরা নিরনব্বই।

আমরা হাজার স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও যেমন শিশুকে সকল বিষয়ে সুমান স্বাধীনতা দিতে নারাজ্ তার ভালর জন্য, তেমনি বাঙলার রায়তকে

তার নিজের সর্কনাশ করবার স্বাধীনতা দিতেও নারাজ হতে পারি, রায়ত বেচারায় ভালর জন্ম। এ বিষয়ে সুবীক্রনাথের সঙ্গে আমার মতভেদ নাই। আমি অনেক বিষয়েই liberal অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সকল লোককে, কথায়, কাজে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ যে তাকে অমানুষ করা এ জ্ঞান আমারও আছে। বিলেতে যখন অবাধ মদ্যপানকে আইনত সবাধ করবার প্রস্তাব ওঠে তখন জনৈক liberal বলেছিলেন যে I would rather have England free than England sober. আমার liberalism অবশু অতদূর উচুতে ওঠে না। Drink স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় ত, তা sober স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে। প্রবৃত্তির অধীনতাকে যে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা মনে করেন, তার পরিচয় ত নিতাই পাওয়া যায়।

তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, শিশু ছাড়া আর কারও শৈশব আমার কাছে প্রীতিকর নয়। এক হাত পরিমাণে ছেলেকে কোলে করতে সকলেরই লোভ যায় কিন্তু সেই মাপের প্রাপ্তবয়স্ক লোককে অর্থাৎ বামনকে অঙ্কশু করতে সহজ মানুষে সহজেই নারাজ হয়। অনেক লোক যাদের আমরা শিশু বলি তারা মনোজগতে বামন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনও দেশে বেশির ভাগ লোক এই জাতীয় হয়, তাহলে সেটা অবশু এতটা দুঃখের বিষয় যে, কি করে তাদের আবার মানুষ করা যায় সেইটিই হচ্ছে আসল ভাবনার কথা। এ দেশে রায়তের দল, উক্ত হিসেবে বাস্তবিকই শিশু,—কিন্তু এই শিশুদের কি করে মানুষ করতে হবে সেটা একটা মস্ত সমস্যা, তবে আমি যে সমস্যা কুলেছি তার থেকে পৃথক সমস্যা।

আমি অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতী এই কারণে যে হস্তান্তর করবার অধিকার হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে একটা proprietary right এবং সে right আমার মতে যে জমি চষে তার থাকা উচিত। সে চাষী ক অথবা খ তাতে কিছু যায় আসে না। ক জমিদারের পুত্র-স্বামীও ত নিত্য খ জমিদারের হাতে বাচ্ছে।

এখন যদি কেউ প্রস্তাব করে যে, জমিদারী কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না, তাহলে ক চ ট ত প পঞ্চবর্গ জমিদার পক্ষমুখে তার প্রতিবাদ করবেন। মানব চরিত্র এই বে কোনরূপ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে কোন বিশেষ লোককে চিরকাল বেঁধে রাখা যাবে না। লক্ষ্মীর সঙ্গে মানুষের এমন বিবাহ হতে পারে না যার আর divorce নেই। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষ-নামক ইচ্ছমজীবকে সেকালের ভূম্যাধিকারীরা তাঁদের জমিতে শিকড় গেড়ে গাছের মত স্থাবরজীব হতে বাধ্য করেছিলেন, এ ব্যবস্থার নাম serfdom। একালে আমাদের ও নাম শুনলেই ভয় হয়। অপর পক্ষে ক'র জমি খ'র হাতে যাওয়াটা আমরা বিশেষ দুঃখের কথা মনে করি নে।

তবে কথা হচ্ছে ক'র জোত যদি খ'র হাতে না গিয়ে গ'র হাতে যায়? কও চাষী-প্রজা খও তাই, কিন্তু গ হচ্ছেন তিনি যিনি প্রজা কিন্তু চাষী নয়, তিনি যিনি জমি চষেন না, কিন্তু তার উপর-উপকা ফল ভোগ করেন—অর্থাৎ জোতদার। “গ” যখন জমি চষে না, তখন সে তা অবশ্য ঘ'কে দিয়ে চমাবে। এই ঘ হবে তখন একজন কোর্টা প্রজা অথবা আধিরার। ফলে এই নূতন জাতের প্রজার উপর অবশ্য সে জমির পূর্ব মালিক ক'র কোন অধিকারই বর্তাবে না, তার সকল অধিকারের মালিক হবে গ। ফলে এই হস্তান্তরের বলে, ঘ'র জোতে দখলী স্বত্ত্বও থাকবে না, তার হস্তান্তরের অধিকারও থাকবে না। অর্থাৎ আমি জমিদারের অধীনস্থ রায়তকে যে সব স্বত্ত্ব-স্বামীত্ব দিতে চাই জোতদারের অধীনস্থ রায়তের তা কিছুই থাকবে না। ফলে হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রায়তের সকল স্বত্ত্ব জোতদারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। আর হস্তান্তরের ফলে বহুজোত যে জোতদার আত্মসাৎ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খরিদ বিক্রীর কথা, অবশ্য টাকার কথা। সুতরাং যার টাকা আছে সেই যে জোত খরিদ করবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জমিদার ও রায়তের ভিতর মহাজনের হবে মধ্যস্থত্ব।

কিন্তু এর উপায় কি? ছেলোবেলার কুলে পড়েছি যে land, labour and capital এই তিনের যোগে ধন সৃষ্টি হয়। কবীকর্ণের কথাই গরম থাক।

land বাদ দিলে শূণ্ণে চাষবাস হয় না, labour বাদ দিলে ফসল জন্মায় না, জন্মায় ঘাস, আর সে ঘাসও কাটবার জন্ত labour চাই। আর হালবলদ মই বিদে, নিড়ুনি বীচন capital-এর অভাবে এ সব কিছুই জোটে না, আর জোটে না চাষের গরুর ও চাষীর খোরাক। আজ বীজ বুনে কাল যদি পাকা ধান পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপার হয়ত অগুরূপ হত। বাজীকররা অবশ্য আঁটি পোঁতবার অব্যবহিত পরেই ফজলী আম ফলিয়ে দেয়। এ বিত্তে মূর্থ চাষীদের জানা নেই। আর তা ছাড়া বাজীর আমে শুধু নয়ন তৃপ্ত হয় উদর তৃপ্ত হয় না। Land, labour এবং capital এ তিনের Co-operation যখন চাইই তখন এই তিনের ভিতর যাতে বিরোধ নয় সামঞ্জস্য ঘটে তারই চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য, —অন্তত ততদিনের জন্ত যতদিন সোশ্যালিজমের রূপায় land nationalised এবং কমুনিজমের রূপায় capital inter-nationalised না হয়ে যায়।

এখন এই মহাজনের হাতে জমি যাওয়ার ফলে মহাজনের অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। জমি কেনা বেচার অর্থ এই যে, যে জমি বেচে সে স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে আর যে কেনে সে অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ একই জিনিষ শুধু ভিন্নরূপ ধারণ করে। জমিও capital টাকাও capital, দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে একটি স্থূল ও অচল Capital, আর একটি তরল ও চঞ্চল capital। আর এ পৃথিবীর নিয়মই এই যে স্থূল নিত্য তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে—আর তরল নিত্য স্থূলে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে, চাষী প্রজা যে জোত হস্তান্তর করে সে দেনার দায়ে আর সেই সূত্রে মহাজন জোতদার হয়ে ওঠে, তাহলে বলি জোত খালি মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রী হয় না, জমিদারের বাকী খাজানার দায়েও বিক্রী হয় আর তখন তা হয় সম্পূর্ণ নির্দয়রূপে। সুতরাং জমির কেনা বেচা যেমন চলছে তেমনি চলবেই,—মহাজন নামক Capitalist-এর হাত থেকে রায়তী জোত

আইনত রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও জমিদার নামক Capitalist-এর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা বাবে না।

এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি সেই রকম আইন হওয়া উচিত যাতে জমিদারের হাত থেকে জোতদারের হাতে গেলে রায়তের স্বত্ব-স্বামীত্ব থর্ক না হয়। মধ্য-স্বত্বকে থর্ক করাই তার উপায়। কি করে তা করা বাবে তার সন্ধান উকিল বাবুদের কাছে পাওয়া যাবে।

(৪)

রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হতে পারে কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপদেবতার উপদ্রব থেকে রায়তকে যে কি করে বাঁচানো যায় সে বিষয় আমি রায়তের কথায় আলোচনা করি নি,—তু কারণে।

প্রথমতঃ আমি আলোচনাটিকে সরল করবার জন্ম রাজা প্রজার সম্বন্ধের বিচার করি, তাই যে ব্যক্তি রাজাও নয় প্রজাও নয় অথচ একাধারে ও দুই তার নাম আর উল্লেখ করিনি। দ্বিতীয়তঃ এ জ্ঞান আমার ছিল যে, জাতিভেদের মত মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব হচ্ছে ভারতবর্ষের সমাজ গঠনের বিশেষত্ব। বিলেতে যেমন middle class প্রবল, এদেশে তেমনি middleman-ই প্রবল, সুধু কৃষীকর্মে নয় সিল্প বাণিজ্যেও। যে ধন সৃষ্টি করে ও যে তা ভোগ করে সে দুই ব্যক্তির ভিতর অসংখ্য middleman আছে। কথায় বলে “যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই”। এই বিরাট নেপোর দলের নাম ভদ্রলোক। সমাজের এ ব্যবস্থা আর যে হিসেবেই আমাদের উন্নতির কারণ হোক জাতীয় ধনের হিসেবে আমাদের অবনতির কারণ। আমি নিজে এই ভদ্রশ্রেণীভুক্ত, জাতি হিসেবেও পেশা হিসেবেও, তবুও এ স্পষ্ট সত্যটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সঙ্গে আমার জীবনকে দিব্যি খাপ খাইয়েছি, কিন্তু আমার মনকে তদ্রূপ খাপ খাওয়াতে পারি নি। তাই সমাজ-দেহের রোগের কিসে প্রতিকার হয় সে ভাবনা আমি ভাবতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, আমি এ রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দিয়েছি সে হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে symptomatic treatment। তার ফলে জাতীয় হীনতা দূর হবে না। এ জ্ঞানও আমার ষোল আনা আছে। তবে যে লোকের ছোটখাটো কষ্টের কি করে প্রতিকার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করেছি তার কারণ আয়ুর্বেদে আদেশ আছে, মানুষের গায়ে কাঁটা কুটলেই যদি পারত তা তুলে দিয়ে, দর্শনের সব গভীর তত্ত্বের নীমাংসা না হওয়াতক্ ও কাজ করতে নিরস্ত হয়ো না।

আমাদের সর্ব প্রকার জাতীয় উদ্দেশ্যের কারণ হচ্ছে জাতির প্রাণ শক্তির অভাব। এই জীবনমৃত জাতির অন্তরে আবার কি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় সেইটেই হচ্ছে অবশ্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য। চারদিকে যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে তা হবে না। কারণ অনেকে যা করছেন তা হচ্ছে বিলেত থেকে আমদানী galvanic battery-র shock প্রদান। ও shock-য়ে মরা জানোয়ার হাত পা ছোঁড়ে কিন্তু বাঁচে না। তবে হবে কিসে? এ বিষয়ে মুক্তি কোন দিকে, সে দিক নির্ণয় আমি করতে পারি—কিন্তু সে পথে কাউকে চালাবার শক্তি আমার নেই। তা ছাড়া ধান ভানতে শিবের গীত গাইতেও আমি সঙ্কচিত। রায়তের কথা আগাগোড়া কত ধানে কত চাল হয় তারই কথা।

শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

কাব্য জিজ্ঞাসা ।

(প্রথম প্রস্তাব)

ইলদী ও খৃষ্টানের ধর্মপুঁথিতে বলে বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্ক্ষার বলে ছোঁঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন, এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে সে সৃষ্টি অতি চমৎকার । ঐ পুরাণেই বলে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তৈরী করেছেন তাঁর প্রতিক্রম করে, আর নিজের নিঃশ্বাস বায়ুতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন । অর্থাৎ মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টি রহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া ; অথবা, যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব আরহের আর কোনও চাবী মানুষের হাতে নেই । বাইবেলের বিধাতার মত মানুষ অন্তরাঙ্গার আকাঙ্ক্ষার চালনায় যা সৃষ্টি করে, তার চমৎকারিত্ব তার নিজেকেই বিস্মিত করে দেয় । বাহিরের বিশ্বের স্বরূপ ও সৃষ্টি কৌশল আবিষ্কারে যেমন মানুষের বুদ্ধির দিরাং নেই, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ও কৌশলের জ্ঞানেও তার উৎস্ক্যের সীমা নেই । কেন না সে সৃষ্টিও মানুষের বুদ্ধির কাছে বাহিরের বিশ্বের মতই রম্যময় ।

রামায়ণে কাব্যের জন্ম কথার যে কাব্যোতিহাস আছে তাতে মানুষের সৃষ্টির এই তত্ত্বই কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে । ক্রৌঞ্চ-ছন্দ বিয়োগের শোকে যখন বাল্মীকীর মুখ থেকে “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং” ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল, তখন—

তশ্চোৎখং ক্রবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ ।

শোকাকর্ভেনাস্ত শকুনেঃ কিমিদং বাহুতং ময়া ॥

বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে
এই যে আমি উচ্চারণ করলেম এ কি ! তখন নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে
তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগলেন,

চিন্তয়ন্স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্নাতিম্ ।

এবং শিষ্যকে বললেন—

পাদবন্ধোহক্ষরসমস্তুত্বী লয় সমম্বিতঃ ।

শোকার্তশ্চ প্রবৃত্তো মে শ্লোকো তবতু নান্যথা ॥

এই বাক্য পাদবন্ধ, এর প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তত্ত্বী লয়ে এ
আন্দোলিত ; আমি শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম
শ্লোক হোক ।

রামায়ণকার আদি কবির মুখ দিয়ে যে কোতূহল প্রকাশ করেছেন
সেটি কাব্য রসিক মানব মনের সাধারণ কোতূহল । মহাকবিদের
প্রতিভা এই যে অপূর্ব মনোহর শব্দ গ্রন্থনের সৃষ্টি করে “কিঃ কিঃ”—
এ কি বস্তু ? এর স্বরূপ কি ? তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি
আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলঙ্কার শাস্ত্র । সে
শাস্ত্রের প্রধান কথা কাব্য জিজ্ঞাসা । কাব্যের কাব্যত্ব কোথায় ?
কোন গুণে বাক্য ও সম্ভর্ভ কাব্য হয় ? অলঙ্কারিকদের ভাষায়
কাব্যের আত্মা কি ?

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদ
সমুচ্চয় । সুতরাং কাব্য দর্শনে যারা দেহাত্মবাদী তাঁরা বলেন ঐ
বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই ।
বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপোরে না রেখে, সাজ সজ্জায় সাজিয়ে

দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজ সজ্জার নাম অলঙ্কার। শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলঙ্কারে চারুক দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলঙ্কারের জন্ম। “কাব্যং গ্রাহমহং-কারাৎ” (বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্য জিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্র। এবং যেমন অধিকাংশ লোক মতে না হলেও জীবনে লোকায়ত্ত মতের অনুবর্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু আছে তাদের জীবনযাত্রা তার কোনও প্রমাণ দেয় না, তেমনি মুখের মহামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায় তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্য-পাঠক কাব্য-বিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদের কাব্যের আশ্বাদন শব্দ ও অর্থের অলঙ্কারের আশ্বাদন। এবং সেই জন্ম অনেক লেখক, যাদের রচনা অলঙ্কৃত বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়, তারা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবী লাভ করেছে।

অলঙ্কারবাদীদের সমালোচনায় অন্য অলঙ্কারিকেরা বলেছেন কাব্য যে অলঙ্কৃত বাক্য নয় তার প্রমাণ শব্দ ও অর্থ দু'রকম অলঙ্কারই আছে অথচ বাক্যটি কাব্য নয় এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, আবার সর্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য তার কোনও অলঙ্কার নেই এরও উদাহরণ আছে। অর্থাৎ সমালোচকদের গুণায়ের ভাষায় কাব্যের ওসংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্টি। যেমন “সাহিত্য-দর্পণের” একজন টীকাকার উদাহরণ দিয়েছেন—

ভরঙ্গনিকরোন্নীত তরুণীগণ সংকুলা ।

অরিখহতি করোলবাহব্যাহততীরকুঃ ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলঙ্কার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বলবে না। বাক্য অনলঙ্কৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য এর উদাহরণে 'সাহিত্য দর্পণ'কার কুমার সম্ভবের অকালবসন্তবর্ণনা থেকে তুলেছেন।

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌপ্রিয়াঃ স্বামনুবর্তমানঃ ।

শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমৌলিতাক্ষীঃ মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥

এর এখানে ওখানে যে একটু অনুপ্রাসের আমেজ আছে “তরঙ্গ নিকরোন্নীত তরুণীগণের” কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না, আর এর অর্থ একবারে নিরলঙ্কার। অকাল বসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনশূলীতে রতি দ্বিতীয় মদনের সমাগমে, তির্য্যকপ্রাণিদের হৃদয়গের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনও অলঙ্কারে সাজান নি। অথচ মনোহারিত্বে পাঠকের মনকে এ লুঠ করে নেয়। অলঙ্কারবাদিরা বলবেন এখানেও অলঙ্কার রয়েছে যার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। প্রতিপক্ষ উত্তরে বলবেন ঐ নামেই প্রমাণ অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া ও রূপের অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্য সেখানে নেহাৎ মতের খাতিরে ছাড়া সেই বর্ণনাকেই আবার অলঙ্কার বলা চল না।

অলঙ্কারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর একদল আলঙ্কারিক বলেন অলঙ্কৃত বাক্য মাত্রই যে কাব্য নয়, আর নিরলঙ্কার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে ‘রীতি’। “রীতিরাত্মা কাব্যস্য,” (বামন, ২৬)। “রীতি” হ’ল পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী। “বিশিষ্টা পদ রচনা রীতিঃ,” (বামন ২৭)। অর্থাৎ

কাব্যের আত্মা হ'ল তার 'ফটাইল'। 'ফটাইলের' গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। স্বীকার করতে হবে পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর 'ফটাইল'। ইউরোপের অনেক আধুনিক পद्य ও গদ্য লেখক এই 'ফটাইলের' গুণে বা নবীনত্বে 'আর্টিফট' বা কবি নাম পেয়েছেন। অলঙ্কার হচ্ছে এই 'ফটাইল' বা 'রীতির' আনুসঙ্গিক বস্তু। অঙ্গ অলঙ্কার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব-সংস্থান নির্দোষ হয়। 'ফটাইল' হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়বসংস্থান।

রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে অন্য আলঙ্কারিকেরা বলেন নির্দোষ অবয়বে ভূষণযোগ করলেই মৌন্দর্য্য আসে না, শরীরেও নয়, কাব্যেও নয়।

“প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
যন্তুৎপ্রসিক্কাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাস্তনাসু ॥”
(ধ্বন্যালোক, ১১৪)

“রমণী দেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিষ, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গী এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু।” এই 'অতিরিক্ত বস্তুই' কাব্যের আত্মা।

এ 'বস্তু' কি? উত্তরে বস্তুবাদী আলঙ্কারিকেরা বলেন এ জিনিষটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। “তরঙ্গনিকরোন্নীত” ইত্যাদি যে কাব্য নয় তার কারণ ওর বাচ্য কিছুই নয়, ওর বক্তব্য বিষয় অকিঞ্চিৎকর। অন্য বাক্যের মত কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের

সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে, কোনও বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের বস্তু, ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতই মনোহারী, “চন্দ্রচন্দনকোকিলালাপদ্রমরঝঙ্কারাদয়ঃ”। অনেক ভাব, যেমন প্রেম, করুণা, বীর্য্য, মহত্ব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এই সব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন। এবং তাদের বিশিষ্ট পদ রচনা ভঙ্গী, শব্দ ও অর্থে যথোচিত অলঙ্কারের সমাবেশ, তাদের বাচ্য ভাব ও বস্তুকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তোলে। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ সবায় অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে’ আর ধর্ম্মান্তর নেই। যেমন বাহ-স্পত্যেরা বলেছেন রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার আবির্ভাব হয় ; মন নামে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই।

যে সব আলঙ্কারিক বস্তু-বাদীদের মতে মত দিতে পারেন নাই, তাদেরও স্বীকার করতে হয়েছে অধিকাংশ কবির কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কারের গুণেই কাব্য। এমন কি মহাকবিদের কাব্য প্রবন্ধেরও অনেকাংশে এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে তাঁদের ভাব ও বস্তুর চমৎকারিত্ব হয়তো বেশী, তাঁদের রচনা ও প্রকাশভঙ্গী আরও বিচিত্র, তাঁদের অলঙ্কার অধিকতর সঙ্গত ও শোভন। কিন্তু তবুও যে এই আলঙ্কারিকেরা কাব্য বিচারে এখানেই থামতে পারেন

নি তার কারণ তাঁরা দেখেছেন যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থ মাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয় সেই কথা—বস্তু কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হ'ত তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে তারই কাব্যের আশ্বাদন হ'ত, কিন্তু তা হয় না।

“শব্দার্থ শাসন জ্ঞানমাত্রে নৈব ন বেদ্যতে।

বেদ্যতে স হি কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞেরেব কেমলম্ ॥”

(ধ্বন্যালোক, ১১৭)

“কাব্যের যা সার অর্থ কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জানতে পারেন”। “যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎ প্রতীতিঃ স্যাৎ—কাব্যার্থ যদি কেবল বাচ্যরূপ হ'ত, তবে বাচ্য-বাচকের স্বরূপ জ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত”। “অথচ বাচ্য-বাচক রূপলক্ষণকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাঙ্গি-লক্ষণমিব প্রগীতানাং গাঙ্কর্বলক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ—অথচ দেখা যায় কেবল বাচ্য-বাচক লক্ষণের জ্ঞান লাভেই যারা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের আশ্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচর থাকে ; যেমন গানের লক্ষণমাত্র যারা জানে তাদেরই সঙ্গীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না” (ধ্বন্যালোক, ১১৭, বৃত্তি)। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যা-তিরিক্ত ধর্ম্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন ‘ধ্বনি’।

“যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থে ।

ব্যঙ্গঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিত্তি সূরিভিঃ কথিনঃ” ॥

(ধ্বন্যালোক, ১।১৩)

“যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা তাকেই ‘ধ্বনি’ বলেছেন” । এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলঙ্কারিক পরিভাষা হ’ল ‘ব্যঙ্গ্য’ বা ‘ব্যঙ্গ্যার্থ’ । ধ্বনিবাদীরা বলেন এই ‘ধ্বনি’ বা ‘ব্যঙ্গ্য’ হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু ।

কিন্তু গোড়াতেই তাঁরা সাবধান করেছেন যে কাব্যের ‘ধ্বনি’, উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি যে সব অলঙ্কার তার বাচ্য-বাচকের— অর্থ ও শব্দের—চাকরু সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিষ । “বাচ্য-বাচক চাকরু-হেতুত্ব উপমাদিত্যোহনুপ্রাসাদিত্যশ্চ বিভক্ত এব” (ধ্বন্যালোক, ১।১৩, বৃত্তি) । কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন স্ক্রকৌশলে এ সব অলঙ্কারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ঐ অলঙ্কার বুঝি কবিতাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল । কিন্তু কাব্যরসিকেরা জানেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে ‘ধ্বনি’ তা সেখানে নেই । কারণ সেখানেও বাচ্যই প্রধান ; ধ্বনির আভাষ যেটুকু আছে তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র । কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে ‘ধ্বনি’ তাই তার প্রধান বস্তু ।

“ব্যঙ্গ্যন্ত্ৰং যত্রাপ্রাধান্যং বাচমাত্রানুযায়িনঃ ।

সমাসোস্ক্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥

ব্যঙ্গ্যন্ত্ৰ প্রতিভামাত্রৈ বাচ্যার্থানুগমেহপি বা ।

ন ধ্বনির্ষত্র বা তন্ত্ৰং প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে ॥

তৎপরাবেব শব্দার্থে । যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ ।

ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোক্ষিতঃ ”

(ধ্বন্যালোক, ১১৪, ১৫, ১৬.) ।

‘ব্যঙ্গ্য যেখানে অপ্রধান এবং বাচ্যার্থের অনুযায়ীমাত্র, যেমন সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচ্যালঙ্কার, ধ্বনি নয় । ব্যঙ্গ্য আভাষ মাত্র থাকলে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হ’লে তাকে ধ্বনি বলে না, কারণ ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয় । যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গ্যপর হয়ে ব্যঙ্গ্যতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয় ; সুতরাং সংকরালঙ্কার আর ধ্বনি এক নয়’ ।

এখানে যে দুটি অলঙ্কারের বিশেষ করে’ নামোল্লেখ আছে তার মধ্যে সমাসোক্তি অলঙ্কারে বর্ণিত বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে’ বর্ণনা করা হয় । কিন্তু ঐ ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকে না ; বর্ণিত বস্তুর কার্যবর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত থাকে যা তাদের সূচিত করে । এতে শব্দের প্রয়োগ খুব সংক্ষিপ্ত হয় বলে’ এর নাম সমাসোক্তি । আনন্দবর্দ্ধন খুব একটা জমকালো উদাহরণ তুলেছেন ;—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্ ।

যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোহপি রাগাদগলিতং ন লক্ষিতম্ ॥

‘উপগতসঙ্কারাগে আকাশে যখন তারকা অস্থির দর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হ’ল, অমনি পূর্বদিকের সমস্ত তিমির যবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হ’ল, তা লক্ষ্যই হ’ল না’ । এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে, মায়িকা ও নায়কের ব্যবহার আরোপ করে’ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রচনায় শিল্পকৌশলের চাতুর্য্য যথেষ্ট ।

প্রতি শব্দটি শ্লিষ্ট ; রাত্রি ও চন্দ্রের কথাও বলছে, আবার নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারও ইঙ্গিত করছে। “উপোড় রাগেণ বিলোল তারকং”—সন্ধ্যার অরুণিমায় আকাশের তারা অস্থির দর্শন, আবার উপচিত অনুরাগে চঞ্চল চক্ষু-তারকা। “গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্”—চন্দ্রদেয়ে আভাসিত রাত্রির প্রারম্ভ, আবার ‘মুখ’ অর্থে বদন, “গৃহীত” মানে ধৃত, পরিচুম্বিত। “সমস্তং তিমিরাংশুকং”—এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট ; কিন্তু একটু কারিকুরি আছে। ‘অংশুক’ মানে সূক্ষ্ম কাপড় নয়, সূক্ষ্মবস্ত্র যা নায়িকোচিত, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারও গাঢ় নয়—পাতলা অন্ধকার। “পুবং”—অর্থ পূর্বদিক, আবার সম্মুখে। “রাগাদগলিতং”—আলোকরাগে অপমৃত, আবার অনুরাগের আবেশে স্মলিত। “ন লক্ষিতং”—রাত্রির প্রারম্ভ লক্ষিত হ’ল না, আবার অনুরাগের আবেশে অজ্ঞাতেই নীলাংশুক স্মলিত হ’ল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আনন্দবর্ধন বলছেন এখানে ‘কনি’ নেই, কেননা এখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামীমাত্র (“ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্য-নামুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে ”)। রাত্রি ও চন্দ্রে নায়িকা-নায়কের ব্যবহার সমারোপিত হয়েছে, এই বাক্যার্থ ছাড়িয়ে এ কবিতা আর বেশী দূর যায় নি (“সমারোপিত নায়িকানায়ক ব্যবহার-য়োনিশাশশিনোরের বাক্যার্থত্বাৎ)। নায়ক নায়িকা ব্যবহারের যে ব্যঞ্জনা সেটি বাচ্যার্থেরই বৈচিত্র্য সম্পাদক মাত্র।

দ্বিতীয় অলঙ্কারটি হচ্ছে সংকরালঙ্কার। ওর নাম সংকর, কারণ ওতে একাধিক অলঙ্কার মিশ্রিত থাকে। যেমন এক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেটি আবার অন্য একটি অলঙ্কারকে সূচিত করে।

লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটা বিখ্যাত শ্লোক উদাহরণ দিয়েছেন,—

প্রবাতনীলোৎপল নির্বিশেষমধীর বিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা ।

তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥

‘বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মত সেই আয়ত লোচনার চঞ্চল দৃষ্টি সে কি হরিণীদের কাছে থেকে গ্রহণ করেছে, না হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে তা সংশয়ের কথা’। এখানে বক্তব্য হ’ল—যৌবনারূঢ়া পার্বতীর দৃষ্টি হরিণীর দৃষ্টির মত চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি স্পষ্ট না বলে’, একটি সন্দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ রকম কবি-কল্পিত সংশয়কে আলঙ্কারিকেরা বলেন সন্দেহালঙ্কার। সুতরাং এখানে বাচ্য হ’ল সন্দেহালঙ্কার, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি উপমা। কিন্তু এ ব্যঞ্জনা ‘ধ্বনি’ নয়। কারণ এ কবিতার যেটুকু মাধুর্য্য তা ঐ ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই, ব্যক্ত সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। উপমাটি বরং ঐ সন্দেহের অভ্যুত্থানে সহায়তা করে’, তার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সন্দেহেই পর্য্যবসিত হয়েছে। “অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনে তদবলোকনশ্চোপমা যতপি ব্যঙ্গয়া তথাপি বাচ্যশ্চ সা সন্দেহালংকারশ্চাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদগুণীভূতা। অনুগ্রাহত্বেন হি সন্দেহে পর্য্যবসানম্”। (অভিনবগুপ্ত)। অর্থাৎ অভিনবগুপ্তের মতে মহাকবির এই বিখ্যাত কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, বর্ণনা কৌশলে মনোহারী মাত্র।

সমাসোক্তি ও সন্দেহ অলঙ্কারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা যে কাব্যের আত্মা, ‘ধ্বনি’ নয়, এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে বাক্যে যে কোনও ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয় না। বিশ্বনাথ

অবশ্য সোজাসুজি বলেছেন তা হ'লে প্রহেলিকাও কাব্য হ'ত। কিন্তু এই সব অলঙ্কার সুপ্রযুক্ত হ'লে, তাদের কৌশল ও মাধুর্য তাদের ব্যঞ্জনা'কে 'ধ্বনি' বলে' ভ্রম জন্মাতে পারে, এইজন্য এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে' সাবধান করা প্রয়োজন। সমাসোক্তিতে যে ব্যঞ্জনা তা হচ্ছে এক বস্তুর বর্ণনা দিয়ে অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা। সংকরালঙ্কারের ব্যঞ্জনা এক অলঙ্কার দিয়ে অন্য অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা। সূত্রাং যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা নয়। যে 'ধ্বনি' কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলঙ্কারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়।

কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, মহাকাব্যের কথা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়—এ সব উক্তি যেমন একালের তেমনি সেকালের বস্তুতান্ত্রিক লোকের কাছে হেঁয়ালী বলেই মনে হয়েছে। প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকেরা বলেছেন—কাব্যের বাচ্যও নয়, তার গুণ, অলঙ্কারও নয়, অথচ 'ধ্বনি' বলে' অপূর্ব এক বস্তু, এ আবার কি ? ও জিনিষ হয় কাব্যের শোভা, তার গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যেই আছে, নয়ত ও কিছুই নয়, একটা প্রবাদ মাত্র। খুব সম্ভব শব্দ ও অর্থের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকেরা বর্ণনা করেন নি, এমন একটি বৈচিত্র্যকে একজন বলেছে 'ধ্বনি', আর অমনি একদল লোক অলীক* সহৃদয়ত্বভাবনায় মুকুলিত চক্ষু হয়ে 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলে' নৃত্য আরম্ভ করেছে। (“কিং চ বাগ্নিকল্পানামানন্ত্যাৎসংভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণবিধায়িত্তিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনি ধ্বনি রিত্তি তদলীকসহৃদয়ত্বভাবনা মুকুলিত্ লোচনৈনু'ত্যতে ।... ”

...তস্ম্যাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনি”। ধ্বন্যালোক। ১১১, বৃত্তি)। ধ্বনিবাদের মুখ্যচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তাঁর ‘ধ্বন্যালোক’ গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বাক্য তুলেছেন যা নিশ্চয়ই একালের বস্তুতাত্ত্বিকদের মনোরথ পূর্ণ করবে।

“যস্মিন্নাস্তি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি

ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।

কাব্যং তদ্ধিনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রংশংসঞ্জডো

নো বিদ্বোহভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্ঠঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ” ॥

“যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচন বিম্বাসে যা রচিত নয় এবং অর্থ যার অলঙ্কারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের প্রীতিতে (অর্থাৎ ‘ফ্যাশনের’ খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে’ প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে ‘ধ্বনির’ স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করছে এ ত জানা যায় না!”

এ সমালোচনায় ধ্বনিবাদীরা বিচলিত হন নি। তাঁরা স্বীকার করেছেন কাব্যের ‘ধ্বনি’ তার বাচ্যার্থের মত এত স্পষ্ট জিনিষ নয় যে ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি থাকলেই তার প্রতীতি হবে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন যার কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে তাকেই হাতে কলমে প্রমাণ করে’ দেখান যায় যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে ‘ধ্বনি’, বাচ্যাতিরিক্ত এক বিশেষ বস্তুর ব্যঞ্জনা। কারণ বাচ্য বা বক্তব্য এক হলেও এই ‘ধ্বনির’ অভাবে এক বাক্য কাব্য নয়, আর ‘ধ্বনি’ আছে বলে’ অন্য বাক্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, এ সহজেই দেখান যায়। ধ্বনিবাদীদের অনুসরণে দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

‘বিবাহপ্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানতমুখী হলেও পুলকোদগমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়’—এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে :—

কৃতে বরকথালোপে কুমার্যঃ পুলকোদগমৈঃ ।

সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তুলজ্জয়াবনতাননাঃ ॥

কোনও কাব্যরসিক এ শ্লোককে কাব্য বলবে না। ঠিক ঐ কথাই কালিদাস পার্বতী সম্বন্ধে কুমারসম্ভবে বলেছেন, যেখানে নারদ মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে হিমালয়ের কাছে এসেছেন,—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী ।

লীলাকমল পত্রানি গণয়ামাস পার্বতী ॥

এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু কেন? কোথায় এর কাব্যত্ব? এর যা বাচ্যার্থ তা ত পূর্বের শ্লোকের সঙ্গে এক। কোনও অলঙ্কারের সুসমায় এ কাব্য নয়, কারণ কোনও অলঙ্কারই এতে নেই। ধ্বনিবাদিরা বলেন স্পর্শই দেখা যাচ্ছে এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্র গণনা—তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থাস্তরের,—পূর্বরাগের লজ্জাকে—ব্যঞ্জনা করছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। (“অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং... অর্থাস্তরং ব্যভিচারিতাবলক্ষণং প্রকাশয়তি” । ধ্বন্যালোক, ২।২৩, বৃত্তি) । . .

নারীর সৌন্দর্যের উপমান যে জলস্থল আকাশের সর্বত্র খুঁজতে হয় এ একটি অতি সাধারণ কবিপ্রসিদ্ধি। নিম্নের শ্লোকে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে ।

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্ ।
গগনজলস্থলসংভবহৃদাকারা কৃতা বিধিনা ॥

‘আকাশের চন্দ্রের মত মুখ, নীল পদ্মের মত চক্ষু, শুভ্র কুন্দ ফুলের মত দশনপংক্তি—গগনে, জলে, স্থলে হৃদা যা কিছু আছে তার আকার দিয়ে বিধাতা তাকে নিৰ্ম্মাণ করেছেন।’ এ কবিতাকে কাব্য বলা চলে কিনা সে সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ কবিপ্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় করে কালিদাস যখন প্রবাসী যক্ষকে দিয়ে বলিয়েছেন—

শ্যামাস্বসং চকিতহারিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্ ।
উৎপশ্যামি প্রতমুয নদীবীচিষু জ্রাবিলাসান্
হস্তৈকস্থং কচিদপি ন তে ভীকু সাদৃশ্যমস্তু ॥

তখন তাতে কাব্যত্ব এল কোথা থেকে? ধ্বনিবাদিরা বলেন এখানে অলঙ্কারগুলি তাদের অলঙ্কারত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রবাসীর বিরহব্যথাকে ব্যঞ্জনা করছে বলেই এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর বাচ্য কতকগুলি উপমা, কিন্তু এর ‘ধ্বনি’ প্রিয়াবিরহীর অন্তর বাথা। এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমস্ত বিশ্বময়—এই ভাব নিম্নের কবিতা দুটিতে বলা হয়েছে।

স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ । . .
হরতাপি তমুং যস্য শংভুনা ন হতং বলম্ ॥

‘সেই এক কুসুমায়ুধ তিন লোক জয় করে। শস্ত্র তার দেহ হরণ করেছে, কিন্তু বল হরণ করতে পারেননি।’

কর্পূর ইব দন্ধোহপি শক্তিমান্যো জনে জনে ।

নমোহস্ববার্ষ্যবীর্ষ্যায় তস্মৈ কুসুমধ্বনে ॥

‘দন্ধ হ’লেও কর্পূরের মত প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে ; আবার্ষ্য-বীর্ষ্য সেই কুসুমধ্বনু মদনকে নমস্কার ।’

অভিনবগুপ্ত বলেছেন (১.১৩) এ কবিতা দুটিতে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এরা কাব্য নয়। প্রথম কবিতাটি এই ভাব মাত্র প্রকাশ করেই শেষ হয়েছে যে মদনের শক্তির কারণ অচিন্ত্য (“ইয়ং চাচিন্ত্য নিমিত্তেতি নাস্মাং বাঙ্গ্যস্য সন্দাবঃ”)। দ্বিতীয়টি কর্পূরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনাতেই পর্যাবসিত হয়েছে (“বস্তুস্বভাবমাত্রে তু পমাবসানমিতি তত্রাপি ন বাঙ্গ্যসন্দাব-শঙ্কা”)। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের ‘মদনভস্মের পরে’ কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে।

পঞ্চশরে দন্ধ করে’ করেছ এ কি সন্ন্যাসী !

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়িয়ে.

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে উচ্ছসি,

অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়িয়ে ।

অভিনবগুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানবমনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে। এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনবগুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ঐ একই কথা তিনি তার আলঙ্কারিকের ভাষায় বলতেন যে এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর ‘করণ বিপ্রলম্বের’ ‘ধ্বনি’।

এই যে তিনটি উদাহরণে দেখা গেল কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার

বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জনা', কথা নয় 'ধ্বনি'—এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি? ধ্বনিবাদীদের উত্তর, 'রসের'। তাঁরা দেখিয়েছেন বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি। তিনটি উদাহরণেই কবিতার বাচ্য রসের ব্যঞ্জনা করছে বলেই তা কাব্য। এই 'রসের' যোগেই পরিচিত সাধারণ কথা নবীনত্ব লাভ করে' কাব্যে পরিণত হয়েছে।

“দৃষ্টপূর্ব্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রস পরিগ্রহাৎ ।

সর্ব্বে নবা ইবাভাস্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥”

(শব্দালােক, ৪১৪ ।)

‘পূর্ব্বপরিচিত অর্থও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ করে’ বসন্তের নব কিশলয় খচিত বৃক্ষের মত নূতন বলে’ প্রতীয়মান হয়’। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা ‘ধ্বনি’ বলে’ যারা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা ‘রস’ বলে তারা উপসংহার করেছেন। “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং” (সাহিত্যদর্পণ)। কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য ‘রস’ যার আত্মা।

‘কোহয়ং রসঃ’, এ ‘রস’ জিনিষটি আবার কি ?

পাঠকেরা যদি ইতিমধ্যেই নিতান্ত বিরস না হয়ে থাকেন, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের রস বিচারের পরিচয় দেওয়া যাবে। লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনও দেশে, কোনও কালে, আর কেউ বলে নি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ।

চিত্রা ও চৈতালি ।



চিত্রা কাব্যগ্রন্থখানি কবির বত্রিশ হইতে তেত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা । ইহার পদ্মাও বর্ষার, তবে তাহার উন্মাদনা খানিকটা পড়িয়া আসিয়াছে—ইতস্তত ভাঙার চিহ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে । এখনো কবি আসল পদ্মার উপরেই আছেন—কোনো শাখানদী বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পড়েন নাই—তবে তাঁহার নৌকা যে সেই দিকেই চলিয়াছে, তাহা বেশ মনে হইতেছে । বড় নদী লোকালয়কে বিচ্ছিন্ন করে—এপারে ওপারে নূতন মানুষ, নূতন ভাষা ; শাখানদী অত্মীয়তার সম্বন্ধ দ্বারা লোকালয়কে আকর্ষণ করে । ঠিক যেন রাজপথ ও গলির প্রভেদ । গলি পারিবারিকতার সূত্র,—এই জন্মেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে গলি এত আনাগোনা আর এত আদরের স্থান ।

সোনার তরীতে দেখিয়াছিলাম কবি নিজের অন্তঃপুরে মানস-সুন্দরীর সহিত আলাপনে নিরত ; বাহিরের জগতে বাহির হইবার তাঁহার কোনো ব্যস্ততা ছিল না । শুধু নিজের অন্তরকে নহে, বহির্জগৎকে উপভোগ করিবার একটা অসহ্য আকুতি চোখে পড়ে চিত্রাতে । নিম্নে আলোচিত কয়েকটি কবিতাতে দেখিব, বর্ষার সেই নীরের প্রাধান্য কাটিয়া তীরের প্রাধান্য ধরা পড়িতেছে । ইহার ‘সুখ’ নামক কবিতাটিতে দেখিব, পদ্মাতীরের লোকালয়ের বর্ণনা কেমন করিয়া কবিকে অধিকার করিতেছে । শুধু তাই নহে, এই ‘সুখ’ কবিতাটিতে এমন একটা সহজ সরলতা আছে যে, ইহাকে ক্ষণিকার দলভূক্ত বলিয়া মনে হয় । সোনার তরীর ‘আকাশের চাঁদ’ নামক

কবিতায় অবাস্তব এক সুখের জন্ম সমস্ত জীবনটাকে কবি ব্যর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু 'সুখ' কবিতাটিতে বুঝিলেন "সুখ অতি সহজ সরল।" সোনার তরীতে ইহা ছিল না বলিলেই হয় : চিত্রাতে ইহার সাক্ষাৎ পাইলাম; পরবর্তী কাব্যগুলি এই রসেই আচ্ছন্ন।

নিজ হৃদয়ের কল্পনা-বিলাস হইতে সংসারের তীরে ফিরিবার প্রচণ্ড আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। এই আকুলতা তাঁহার চৈতালি ও কণিকায় সফল হইয়াছে। পূর্বেবক্ত 'সুখ' কবিতায় যে সহজ সরল আনন্দের প্রতি কবির আগ্রহ দেখিয়াছি, 'আবেদন' কবিতাটিতে তাহারই রূপান্তর। যে স্বর্গ হইতে তিনি বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তাঁহার বিশ্ব-বিহীন অপরের সহিত সমবেদনহীন কল্পনারই স্বর্গ। এই স্বর্গের আতি-পাতি ঘুরিয়া তিনি দেখিয়াছেন, সেখানে স্বস্তি নাই। তাই তাঁহার অশ্রু-জলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই ভূতলের স্বর্গের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় সাধনা হইয়াছিল পদ্মা তীরের নগণ্য পল্লীগুলিতে।

চিত্রা কাব্যটিতে কবির ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার ইতিহাস আছে। নানা রূপ, রূপক ও ছন্দের বিভিন্নতার মধ্যে এই সুরটিই আনাগোনা করিতেছে, সেইজন্য ইহাকে আমি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি না বলিয়া অখণ্ড কাব্য বলিতে ইচ্ছা করি।

চৈতালি।

কবির চৌত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চৈতালি রচিত। এই কাব্যখানিতে আমরা এক নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সোনার তরীতে যাহার আভাস : চিত্রায় যাহার আকাঙ্ক্ষা :

চৈতালিতে তাহার সূচনা : ঋণিকাতে তাহার পরিণাম । ইহার পদ্মা বর্ষার নহে, শীতশেষের ; এখানে বর্ষার উদ্বেলতা স্তিমিত হইয়া শীতের শান্তি ও চৈত্রের শ্রান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে ।

শুধু তাহাই ত নহে ; কবি এখন আসল-পদ্মা ত্যাগ করিয়া তাহার শাখা বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । চৈতালিতে ছোট নদীর সুর—যাহার কলগর্জন তীরভূমির লোকালয়ের কণ্ঠধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না ; যাহার এপার-ওপারের তরু-পল্লব ছুঁই ছুঁই করে ; যাহার উভয় কূলের প্রতিবেশিদের মধ্যে ঘাটে আসিয়া অনায়াসে কথাবার্তা চলে ;—ইহা আত্মীয়তার তরল সূত্রবিশেষ । অর্থাৎ ইহাতে নীর হইতে তীরের প্রাধান্য বেশি ; লোকালয় এখানে লক্ষ্য—জলাশয় নহে । কবি নিজের অন্তর হইতে বাহির হইয়া এখানে লোকসমাজের সহিত প্রেম ও জ্ঞানের সূত্রে মিলিত হইতেছেন । জ্ঞান ও প্রেম—এই দুই অংশে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা । মানুষের প্রতি প্রেমের পরিচয় তাঁহার কাব্যে ইতিপূর্বে পাইয়াছি, কিন্তু এই জ্ঞান-যোগের অভাবে সে প্রেম অসম্পূর্ণ ছিল ; এইবার তাহার আভাস দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইতেছে কবির প্রতিভা সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে । মেঘদূতের আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, এবার তাহা মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিব । মেঘদূত যেমন বিশ্বের, তেমনি আবার সামান্য একটি বিরহী যক্ষেরও । ইতিপূর্বে যে প্রতিভাকে মানস-সুন্দরী, বসুন্ধরা ও উর্বশী লিখিতে দেখিয়াছিলাম ; এখানে তাহাকে দেখিতেছি পল্লীগ্রামের সামান্য লোক—দিদি, পুঁটু, সঙ্গী প্রভৃতি অতি সামান্য চোখ-এড়ানো তুচ্ছতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে । ইহারই নাম, প্রতিভার বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনা ।

চৈতালিতে কবি যে শুধু লোকালয়ের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে; এতদিন তিনি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে নিকটতম ভাবে পান নাই—তাহাকে তিনি যথার্থ করিয়া লাভ করিলেন এখানে। বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্যের — তাহাকে আয়ত্ত্ব করা যায় না; শাখানদী যেন একখানা লিরিক কবিতা—দুইবার আনাগোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়। কবির কথাই শোনা যাক।—“পদ্মার মত বড় নদী এতই বড় যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায় না—আর এই কেবল ক’টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষের নদী; তার শাস্ত্র জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী।” (ছিন্ন-পত্র)। শুধু তাই নয়, একান্ত আপনভাবে ভালবাসিবার নদীও ইহাই। ফরাসী লেখক জুবেরার একটি বচন আছে যে, ভগবান এত বিরাট যে তাঁহাকে খণ্ড করিয়া না লইলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। নদী সম্বন্ধেও একই কথা। কবি এই শাখানদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেমসীরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী, উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।

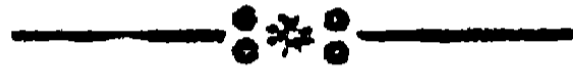
সম্পূর্ণতা লাভের জন্য গদ্য ও পদ্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। অনেক সময় দেখা যায়—পদ্যে যাহার অভাব, গদ্যে তাহারই প্রকাশ; কখনো বা পদ্যে যাহার আভাস, গদ্যে তাহার ভাষ্য। গদ্য স্বভাবতই পদ্যের বিস্তৃত টীকা; আর গদ্যপদ্য উভয় মিলিয়া রচয়িতার

জীবনের ঢীকা। পূর্ববর্তী কাব্য দুইটিতে কবির যে ইচ্ছাটি দেখি-
লাম—নিজের অন্তর হইতে বাহিরে আসিবার, এবং বিশ্বের সহিত
জ্ঞানের আলোকে পরিচিত হইবার—তাহারই পরিপূর্ণতা আছে ঐ
কাব্য দুইটির সমসাময়িক গদ্য নিবন্ধগুলিতে। “এবার ফিরাও
মোরে” কবিতাটিতে কবির অন্তরলোক হইতে বাহির হইবার যে
আকুল ক্রন্দন, তাহা কেবল কাব্যেই পরিসমাপ্ত নহে। কবি
মুঢ়া মুক মুখে ভাষা দিবার এবং ভগ্ন শুষ্ক বুকে আশার সঙ্গীত
বাজাইয়া তুলিবার অনেক পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। দেশকে
জানিতে হইলে পুথানুপুথ্যরূপে তাহার সব অক্ষিসন্ধির খবর লইতে
হয়। জ্ঞানের ভিত্তি ইমারতের মত মাটির দিক হইতেই পাকা
করিয়া তোলা আবশ্যিক। তিনি দেশকে জানিবার জন্য যে সব
উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ অস্তুদৃষ্টির পরিচয় বহন
করে। এই সময়ে দেশের নানাবিধ তথ্যসংগ্রহের দিকে মন
দিলেন। ছেলে-ভুলানো ছড়া, কবিসঙ্গীত, গ্রাম্য সাহিত্য—ইহাদের
মধ্যে যে দেশের অসংস্কৃত এবং কিস্বদন্তিমূলক একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস
আছে, এবং তাহা যে দেশের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনের পক্ষে পরম
প্রয়োজনীয়—এ কথা তিনি ভালোরূপেই বুঝিয়াছিলেন। সাধনা পত্র-
খানি তখন তাঁহার মুখপত্ররূপে দেশকে নানা দিক দিয়া জাগাইবার
চেষ্টা করিতেছিল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নাম দেখিলেই বোঝা
যাইবে, কত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল। “ইংরাজ ও
ভারতবাসী” (১৩০০ সাল), “রাজনীতির দ্বিধা” (১৩০০), “অপ-
মানের প্রতিকার”, “সুবিচার” (১৩০১), “সমুদ্র যাত্রা” (১২৯৯),
“শকুন্তলা”, “মেঘদূত”, “প্রাচ্য ও প্রতীচ্য” (১২৯৮), “বিদ্যাসাগর

চরিত” (১৩০২)। এই প্রবন্ধগুলিতে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। একদিকে যেমন বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি তাহার দৃষ্টি ও চিন্তা আকর্ষণ করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতের একটি আদর্শ রূপ তাহার মনে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কবির পরবর্তী কালের গড়েপড়ে দেখিতে পাইব ভারতের এই আদর্শ রূপটি ক্রমে কি মূর্তি ধারণ করিল, এবং কোন্ কন্ঠে ও চিন্তায় তাহার পরিণতি হইল। চৈতালিতে কালিদাসের উপরে যে কবিতাগুলি আছে, তাহার সহিত কালিদাসের গদ্য সমালোচনা কয়টি মিলাইয়া পড়িলে কালিদাস সম্বন্ধে কবির সম্পূর্ণ ধারণাটি জানা যাইবে। উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশ” পুস্তকের তুলনামূলক একটা সমালোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রী প্রমথনাথ বিন্দী ।

রবীন্দ্রনাথ ।



আমি ত' ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে'

গুঞ্জরিলে কি উদাস্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে ;
'চলরে অলস কবি,
ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !'
চমকি' উঠিনু জাগি ;
ওগো মৃত্যুঅনুরাগী,

উন্মুক্ত ডানায় কোন্‌ অভিসারে দূরপানে ধাও ?
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে,

ঝড়ের ঝাপট লাগি' হয়েছে যে উদাসী উধাও !
দেখি, চন্দ্র সূর্য্য তারা
মত্ত, নৃত্যাদিশাহারা,

দামালংঘে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাসী ;
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে,

অনির্গত, অনিশ্চিত, অসীমের, অপেষের লাগি' ।

আমারে আগায়ে দিলে ;

চেয়ে দেখি এ নিখিলে

সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী ;

জলে স্থলে নভতলে

গতির আগুন জ্বলে,

কূল হতে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী !

তুমি ছাড়া কে পারিত

নিয়ে যেতে অবারিত

মরণের মহাকাশে, মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধ্যানে ?

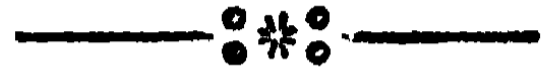
তুমি ছাড়া আর কার

এ উদাস্ত হাহাকার—

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে !'

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।

বিধিনিষেধ ও মানবপ্রকৃতি ।



কোনরকম বিধিবিধান বা ধর্মশাসন মেনে চলা যে মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম নয়, তা' তার কর্ম-প্রকৃতি দেখেই বুঝতে পারা যায় ; এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাকে প্রবৃত্ত করলে যে বিকৃত ফল হয়, মানুষের আবহমানকালের ইতিহাসই তার সাক্ষী । মানুষ যে পদে পদে বিধিনিষেধ ও নীতিনিয়ম লঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে এবং অধর্মাচারী হ'য়ে উঠছে, তার কারণ প্রতিমূহূর্তে প্রাণপণে চেষ্টা হচ্ছে তাকে ধার্মিক ও নীতি-পরায়ণ করে' তুলতে । কথাটা শ্রুতিকটু হলেও যে সত্যি, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই । অতি তুচ্ছ জীবনঘটনা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে । সমস্ত নীতিনিয়মের মূলে আছে একটা 'জেনারেলিজেশন' এবং বাধ্যতার দাবী ; আর মানুষের প্রকৃতিতে রয়েছে একটা উৎকট স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বেচ্ছাচার-প্রিয়তা । কাজেই নীতিনিয়মের যা' মূলবস্তু, মনুষ্যপ্রকৃতিতে তার অভাব হেতুই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি ।

আমাদের রাষ্ট্রিক, ধার্মিক বা সামাজিক জীবন থেকেও আমরা এইটে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি যে, আমরা মানুষকে দিন দিন যতই মানুষ করে' তোলবার চেষ্টা করছি, সে ততই অমানুষ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে । নিতাস্ত্র দৈহিক প্রয়োজন বা সুখসাধনের জন্ত যতটুকু দ্বন্দ্বকলহ আবশ্যিক, মানুষের তা' ছাড়া হনন পীড়ন করবার কারণই হয়ত ঘটত না, যদি তার মাথায় নীতিধর্ম, বিধিনিষেধ ও নিত্য

পরিবর্তনশীল আদর্শের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হ'ত। যেদিন তার মাথায় প্রথম ঢুকিয়ে দেওয়া হল 'স্বধর্মনিধনশ্রেয়ঃ', সেই দিন হ'তেই সে ধর্মের সমস্ত শ্রেয়ঃকে নিধন করে' 'নিধনং শ্রেয়ঃ' ব্রত গ্রহণ করলে। যেদিন তাকে প্রথম 'অহিংসা পরমো ধর্ম' মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হল, বোধ করি সেই দিন হতেই সে শুরু করলে প্রাণপণে অপরকে হিংসা করতে। প্রতিবেশীকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে না পারলেও হয়ত কারণে অকারণে এমন নির্ভরভাবে তাকে পীড়ন মানুষ করত না, যদি না তাকে দীর্ঘকাল ধরে' তোতাপাখীর মত পড়ান হ'ত 'Love thy neighbour'। ধর্মের পর ধর্ম সৃষ্টি করে', নীতিনিয়মের পর নীতিনিয়ম গড়ে' মানুষকে আমরা এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছি যে, তাকে সেখান থেকে ফেরাতে হলে এমন সব অবতার ও মহাপুরুষদের আসতে হবে যাঁরা এই সব আবার টেলে সাজতে পারবেন, এবং ধর্ম ও সমাজ-নীতির মহাভূক্ত ছাড়িয়ে মানুষকে রক্ষা করতে পারবেন। পুণ্যের ভারে এবং বিধিনিষেধের চাপে মানুষের এমন ত্রাহি-মধুসূদন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ধরিত্রী পর্যন্ত অধীর হ'য়ে উঠেছেন।

ধর্মামুশীলনের যে পুণ্যালীলা এবং মিলন-পূর্ণিমার যে হোলি খেলা সেদিন আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখেছি, তা'তে প্রাণপণে কেবলি জপেছি—হে যুগপ্রবর্তক ধর্মপ্রচারকগণ! আপনাদের নাম জয়যুক্ত হোক।

কোন স্মরণাতীত যুগে কোন এক সম্প্রদায়বিশেষ পেটের' দায়ে দস্যুরূপে ক'রে খেত বলে', তাদের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলবার শুভ-ইচ্ছায় যে মহাপুরুষ এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তাঁরই নামে পৃথিবীর বুকে যে অমানুষিক ঘটনাসকল ঘটছে, তা'

দেখলে হয়ত [স্বষ্টিকর্তাও আজ চমকে উঠতেন। সুদ্ধ পেটের দায়ে এত হত্যা, এত নিষ্ঠুর নির্যাতন যে তারা নিশ্চয়ই করত না, তা' বনের পাশু হিংস্র বাঘভালুককে দেখেও আমরা বুঝতে পারি। কারণ এক ক্ষুধার তাড়নায় ছাড়া প্রাণীহত্যার প্রবৃত্তি সাধারণত তাদের মনে জাগে না, এবং কোনরূপে উদরপূর্তি হয়ে গেলে সে প্রবৃত্তিও আর তাদের থাকে না। কিন্তু এ যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, এ যে অতৃপ্ত জিঘাংসা;—এর যে কোনকালে নিবৃত্তি আছে তা'ত মনে হয় না। কারণ পেটের দায়েই হোক আর স্বার্থের তাড়নাতেই হোক, মানুষ অসত্য ও হত্যাশ্রয়ী হলেও তার এক ভরসা থাকে যে, এমন একদিন আসতে পারে যখন তার অন্তরে সত্যধর্মের মঙ্গল শব্দ বেজে উঠবে, এবং অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপরাশি ধুয়ে ফেলবার জন্য তার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠবে; কিন্তু এ যে ধর্ম্যাশ্রয়ী-হত্যালীলা! যুগ যুগ ধরে এমনি বেপরোয়া হয়ে মানুষকে মানুষ খুন করে গেলেও, ধর্মসংস্কারের কঠিন বর্ষে আচ্ছাদিত তার হৃদয়ে এতটুকু অনুতাপ কোনদিন আসবে না।

একই দেশের অন্নজলে পরিপুষ্ট হ'য়ে, একই গৃহে বাস করে, একই স্নেহসিক্তনয়নের তলে লালিত হয়েও আজ যে হিন্দু মুসলমান পৈশাচিক উল্লাসে পরস্পরের টুটি কামড়ে ধরচে, অগ্নানব্দনে পরস্পরের বুকে ছুরি বসাচ্ছে—এর কারণও ত, যে যাই বলুক, সেই এক! যেদিন • তাদের কপালে ধর্মমতের ছাপ এঁটে তাদেরকে বলে' দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর তাদের একরকম করে' গড়বার যতরকম চেষ্টাই করুন না কেন, তারা কোনরূপেই এক নয়,—সেই দিন হ'তেই এ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। এবং যতদিন এই দুই ধর্মের ধ্বজা

সগর্বে উড্ডীন থাকবে, ততদিন যে এ নিষ্ঠুরলীলার অবসান হবে না—
এ কথা নিশ্চয় করে' বলা যায়।

এই যে দ্বাবিংশ কোটি হিন্দু আজ এই দুর্দিনে সজ্জবদ্ধ হওয়ার
জন্ম চেষ্টিয়ে মরচে, হয়ত সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তাকে এতটুকু কষ্ট
করতে হত না, যদি সহস্র বিধিনিষেধের নিগড় কানে দিয়ে তাকে সহস্র
স্তরে কীলকবদ্ধ করে' রাখা না হ'ত। পাপকে পাপ বলে' সত্যি সত্যি
বোধ করে', এবং গুণ ও কর্মের চুলচেরা বিচার করে' হীনকে ঘৃণা
করবার মত মানসিক অবস্থা বোধ করি আমাদের লক্ষ জনের মধ্যে
একজনেরও হ'ত কিনা সন্দেহ; কিন্তু যেদিন আমরা পাপপুণ্য আর
উচ্চনীচ-বিচারকে জন্ম ও বংশগত ক'রে নির্বিচারে মানুষকে জন্মের
হীনতা বা উচ্চতার কোটায় আবদ্ধ করেচি, সেই দিনই আমরা পর-
স্পরকে প্রাণপণে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেচি, এবং আমাদের জাতীয়
শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেচি। এখন যতই আমাদের সমাজকে
বিধিনিষেধের বাঁধনে শক্ত করে' বাঁধবার চেষ্টা করচি, সে ততই ক্ষেপে
উঠচে; ফলে জাতি ও সমাজের বনিয়াদ পর্যাস্ত নড়তে শুরু করেছে।
তাই চারিদিক দেখে শুনে' সম্প্রতি আমরা বুঝতে বাধ্য হয়েচি যে,
এ জাতিকে অন্তর্বিপ্লব তথা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে
সামাজিক বিধিনিষেধের অনেক ভূত এদের ঘাড় থেকে নামাতে
হবে—অন্যথা মঙ্গল নেই।

কি রাষ্ট্রিক, কি সামাজিক, কি ধার্মিক, যে কোন বিষয়েই, আমরা
বিধিবিধান সৃষ্টি করতে গিয়েচি, কিছুদিন পরেই দেখেচি তার ফল
উল্টো হতে আরম্ভ হয়েছে। তার একমাত্র কারণ, নীতিনিয়ম করতে
গিয়ে যখনই আমরা কোন 'জেনারলিজেসনে' পৌঁছেচি, তখনই আমরা

মানুষের স্বাভাব্যবোধ, এবং স্থান কাল পাত্রভেদে তার প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিনি; কাজেই সর্বত্রই একটা বিরোধের সৃষ্টি করেছি। কোন কালে কি পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষে কোন এক সম্প্রদায়বিশেষের জন্য সাময়িক ভাবে হয়ত একটা নিয়ম প্রণয়নের আবশ্যক হয়েছিল, পরবর্তী কালে কালের এবং মানবমনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটারও যে পরিবর্তন আবশ্যক, সে চিন্তা আমরা করিনে; উপরন্তু সেইটিকেই বিশগুণ জোরে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিই, ফলে তারা জগৎজুড়ে প্রতিনিয়ত অঘটন ঘটতে থাকে। কাজেই এ কথা নিশ্চয় করে' বলা যায় যে, যতদিন মানুষের প্রকৃতি এবং তার পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে তাদের যথাযোগ্য মাণ্য করে আমরা নীতি নিয়ম প্রণয়ন বা পরিবর্তনের আবশ্যকতা বোধ না করি, ততদিন মানুষের এ বিদ্রোহী ভাব ঘুচবে না, এবং মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষেরও অবসান হবে না।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।



ফুলের বিয়ে ।

—:*ও*—

ফুলের কেশরের রেণু যদি সেই জাতের ফুলের গর্ভের মুখে পড়ে, তাহলেই ফুলের বিয়ে হয় । কেশর আর গর্ভ যদি একই জাতের ফুলের না হয়—অস্তুত কাছাকাছি জাতেরও না হয়, তাহলে একটার রেণু অন্যটার মুখে পড়লেও বিয়ে হবে না—কেননা সে রেণু গর্ভের ভিতর গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে মিশবে না । একটা দিশী আঁবের ফুলের সঙ্গে একটা দিশি আঁবের ফুলের বিয়ে ত হয়ই, ন্যাংড়া আঁবের ফুলেরও বিয়ে হয়—এমন কি কখনো কখনো আমড়াফুলেরও বিয়ে হতে পারে, কেননা আঁব আর আমড়া একজাতের না হলেও অনেকটা কাছাকাছি জাতের ; কিন্তু আঁবের ফুলের সঙ্গে কাঁঠালের ফুলের বিয়ে কোনকালেই হয় না । তোমরা হয়ত এমন টোকো আঁঠিসার ছোট্ট ছোট্ট আঁব খেয়েছ, যার গন্ধও অনেকটা আমড়ার মত ; কিন্তু এমন আঁব নিশ্চয়ই খাওনি, যার স্বাদ কি গন্ধ কাঁঠালের মত ।

ফুলের বিয়ে হয়ে গেলেই তার পাপড়ী কেশর বারে পড়ে, কিন্তু গর্ভটী গুটী বেঁধে ফল হয়—আর দিন দিন বাড়তে থাকে । * ফুলের

* পেয়ারা, কমলা লেবু, পেঁপে, কলা এইরকম গোটা গুচ্চার গাছ আছে, যাদের কখনো কখনো শুধু মেয়ে-ফুল থেকেই ফল হয় ; পুরুষ-ফুলের সঙ্গে বিয়ে না হলেও চলে । কিন্তু সে সব ফল হয় অনেকটা হাঁসের বাওরা ডিমের মত । তাদের মধ্যে বাঁচিও হয় কম—সে সব বাঁচি থেকে গাছও হয় না ।

ভিতরে যে বীচি থাকে—সেই বীচিই হচ্ছে 'গাছের বাচ্ছা'। সেই বীচিই গাছের বংশ রাখে।

তাহলেই বুঝতে পারচ ফুলের বিয়ে হওয়া কত দরকার। কিন্তু ফুলেরা ত নিজেরা নিজেরা বিয়ে ঘটাতে পারে না, তাই তারা ঘটককে দিয়ে সে কাজটা সেরে নেয়। ফুলেদের ঘটক হচ্ছে মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, পাখী, বাতাস, জল—এই সব। তারাই এক ফুলের রেণু নিয়ে আর এক ফুলের গর্ভের মধ্যে ছেড়ে দেয়। ঘটকদের মধ্যে মৌমাছি আর প্রজাপতিই হচ্ছে সকলের সেরা— কেননা তারা ধাঁ ধাঁ করে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যায়। তাদের গায়ে যে আঁশ আছে আর পায়ে যে বুরুষের কুচির মত রোঁয়া আছে, তাতে চট করে রেণু লেগে যায়। তা ছাড়া তারা রেণু নষ্টও করে কম। তাদের যে ফুল কাজে লাগাতে পারে, তারা অন্য ঘটক চায় না।

ফুলেদের মধ্যে নিজের বিয়ে নিজে ঘটাতে পারে এক যমক ফুল—কেননা তার কেশর গর্ভ দুইই আছে; নিজের কেশরের রেণু নিজের গর্ভের মুখে ফেললেই হল। তবু সে ঘটক দিয়ে ঘটাতে চায়, কেননা গুরুকম ঘরোয়া বিয়ে সে পছন্দ করে না। ঘরোয়া বিয়ের দোষ এই যে, তা থেকে যে ফল হয়, তাতে হয় বীচি থাকে না, নাহয় কম বীচি থাকে; আর থাকলেও সে বীচি তেমন জোরালো হয় না—কাজেই তা থেকে ভাল গাছ হয় না। যদিই বা ভাল গাছ হলো, তাহলেও সে গাছের বীচি থেকে আর ভাল গাছ হবে না। কিন্তু এক ফুলের সঙ্গে যদি আর এক ফুলের বিয়ে হয়, তা সে ফুল দুটো একই গাছের হোক কি আলাদা গাছেরই হোক— তাহলে সে

বিয়ের ফল ভাল হবেই। এরকম বিয়ে এক ঘটকেরাই ঘটাতে পারে; তাই যমক ফুলেরাও হাপিত্যেশ করে বসে থাকে—কখন ঘটকরা এসে পায়ের ধুলো দেবে।

কিন্তু ঘটকরা কি জন্ম ফুলের কাছে আসবে, কি বক্‌সিসের লোভে মেহনৎ করে বিয়ে ঘটাবে?—ঘটকদের বক্‌সিস হচ্ছে মধু। ঘটকদের খাইয়ে খুসী করবার জন্মই ফুল তার পাপড়ীর তলায় বোঁটার কাছবরাবর একটি ছোট থলিতে মধু তৈরী করে রাখে। যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুলের সেই ঘটকের কাছেই মধু'র ঘরের চাবিটি আছে। সে চাবি আর কিছুই নয়,—হয় জিভ, নাহয় শুঁড়, নাহয় ঠোঁট। তাই দিয়েই সে মধু'র ঘরে ঢুকে মধু লুটে খায়।

ঘটকেরা যে শুধু মধুই খায় তা নয়, রেণুও খায়। কল্‌কে, বক, তরুলতার মত যে সব ফুলে মধু বেশী, তারা রেণু বেশী করে রাখেনা; কিন্তু গোলাপ, পোস্ত, শিয়ালকাঁটার মত যে সব ফুলের মোটেই মধু নেই, তারা রেণুর বরাদ্দটা বেশী করে রাখে। যে সব ফুলের মধু নেই, আছে শুধু রেণু, সে রেণুটুকুও যদি ঝরে মাটিতে পড়ে, তাহলে ঘটকরা আসবে কিসের লোভে? তাই তারা পাপড়ীগুলোকে এমন ভাবে সাজায়, যাতে ফুলের মাঝখানটা বাটার খোলের মত হয়। রেণু যা ঝরে পড়ে, তা ঐ খোলের মধ্যেই মজুত থাকে।

পাখীরা বড় মধু'র ভক্ত নয়, তারা রেণু পেলেই খুসী। তাই পাখীতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তাদের রেণু হয় খুব বেশী,—যেমন শিমূল, পালতে মাদার, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া। আবার হাওয়াতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, যেমন ঘাস, বাঁশ, সরল, দেওদার, তুঁত, পিটুলি, ভ্যারেণ্ডা—তাদের রেণু তৈরী করতে হয় আরো বেশী; কেননা

হাওয়ায় যে রেণু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে যায়—হয় মাটিতে পড়ে, নাহয় পাতায় বেধে। এ সব ফুলের রেণু হয় শুকনো হালকা ধুলোর মত, যাতে ছ ছ করে উড়ে যেতে পারে—আর গর্ভের মুখটা হয় পালক কি চামরের মত, যাতে উড়ন্ত রেণুগুলোকে চট করে ধরে নিতে পারে। জাফরাণ ফুল আর পাহাড়ে জায়গায় পাইন, ফার, সাইপ্রেস বলে সে সব বিলাতী ঝাউ জাতের গাছ হয়, তাদের ফুল যখন ফুটে আরম্ভ করে, তখন এত রেণু বাতাসে ওড়ে যে, গাছগুলো দিয়ে হেঁটে গেলে চোখে মুখে দেখতে পাওয়া যায় না। চারদিক হলুদে রঙে ছেয়ে যায়—আর গাছের তলায় একহাঁটু করে হলুদে রেণু জড় হয়। সে সময় যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে গাছের তলা দিয়ে সোণালি রঙের ঝরণা বয়ে যায়। সেই জল পাহাড়ের গা বেয়ে যখন নীচে নাবে, তখন লোকে বলে পাহাড়ের উপর গন্ধক বৃষ্টি হয়েছে।

মৌমাছি, প্রজাপতির মত মধুখোর ঘটকরা যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তাদের বেশীর ভাগেরই রেণু কম—কেননা ও সব ঘটকরা, যা ছুঁচারটে রেণু গায়ে লাগে, তা ঠিক অন্য ফুলের গর্ভে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। এই জন্য এ সব ফুলের রেণুও চট্চটে, যাতে চট করে ঘটকদের গায়ে লেগে যায়। আবার গর্ভমুখও হয় চট্চটে, যাতে ঘটকদের গায়ের রেণু চট করে তুলে নিতে পারে।

কিন্তু মধু আর রেণু ভাঁড়ারে থাকলেই ত হবে না, ঘটকদের টেনে আনা চাই। কি দিয়ে ফুলেরা ঘটকদের টেনে আনে? রং আর গন্ধ* দিয়ে। যে সব ফুল দিনে ফোটে, তারা প্রায়ই হয়

* ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসে?—ফুলের পাপড়ীর মধ্যে একরকম

রংচঙে—কিন্তু যে সব ফুল রাত্রে ফোটে,—যেমন ঘুঁই, মল্লিকা, মালতী—তারা প্রায়ই হয় ধপ্পে সাদা, কেননা রাত্রে সাদা রং ছাড়া অন্য রং চোখেই ঠেকেনা। আর সে সব ফুল গন্ধেও হয় ভুরভুরে। চোখে না দেখতে পেলেও গন্ধ ধবেই পোকামাছির ছুটে আসে—কেননা চোখের চেয়ে পোকামাছির নাকটাই বেশী ধারালো।

আগেই বলেছি সব ঘটক দিয়ে সব ফুলের বিয়ে হয় না। তার মানে, ফুল কত বড়, তার কি রকম গড়ন, কত ভিতরে তার মধুর থলি—সেই হিসাবে এক এক ফুল জুতসই। কুঁদফুল কি কামিনী ফুলের মত ছোট্ট নরম ফুলে ভোমরা, ভীমরুল, গুব্বরে পোকামাছির মধু খাবার সুবিধা হয় না, কেননা তারা সে ফুলের মধ্যে ঢুকতেই পারে না, উপরে বসতে গেলেও পাপড়ীগুলো ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ে। মাখনসীম, ছোলা, পলাশ, তুলসী, পুদিনার মত যে সব ফুলে মধুর থলি একেবারে ভিতরে লুকানো, তাতে মাছি, বোলতা, ডাঁশের মত ছোট জিভওয়ালো ঘটকরা পাত্তাই পায় না; আবার ধনে, মৌরি, রাংচিতে, ভারেশ্বার মত যে সব ফুলে মধুর থলি উপরে বসানো,

গন্ধতেল পোরা আছে। একটা ফুলের পাপড়ীকে যদি আলোর দিকে রেখে অনুবর্ণ দিয়ে দেখ, তাহলে তার মধ্যে অনেকগুলো কালো কালো দানা দেখতে পাবে। ঐ কালো কালো দানাই গন্ধতেলের দানা। পাপড়ীর গায়ে কতকগুলো খুব সুরু সুরু ছেঁদা আছে—ঐ ছেঁদার ভিতর দিয়ে গন্ধতেলের গন্ধ বেরিয়ে আসে।

ঘাঁটকোল, কুচলে, গুয়ে বাবলা, র্যাফ্লেসিয়া ফুল হতে সুগন্ধের বদলে দুর্গন্ধ বেরায়, তার মানে তাদের গন্ধতেলটাই দুর্গন্ধ। তারা যে সবুজ মাছির টেনে আনে, তাদের নাকে বোধহয় বদগন্ধই মিষ্টগন্ধ বলে লাগে!

তাতে মৌমাছি, প্রজাপতির মত লম্বা জিভওয়ালী ঘটকরা বেকায়দায় পড়ে। আবার মটর, ভুঁই, তুলসী, বকের মত যে সব ফুলের তলার দিকফার একটা কি ছোটো পাপড়ী লক্লে জিভের মত বেরিয়ে থাকে ; কি পোস্তফুলের মত যে সব ফুলের গর্ভমুখটা চ্যাপ্টা ; কি পদ্মফুলের মত সে সব ফুলের চাকটাই আসনের মত চওড়া ; কি সূর্যামুখী, কদমের মত যে সব ফুলের সমস্ত গা-টাই ঢালা বিছানার মত পাতা ;—সে সব ফুল সব উড়ো পোকাদেরই পছন্দ—বসবার সুবিধার জগু। কল্কে, ধূতরো, ঈশেরমুলের মত সে সব ফুলের খোলাটা বাঁশীর মত লম্বা তাতে কুঁড়ে হামাটানা পোকা আর রাতকানা গুঁড়ে পোকাদের আড্ডা ; কেননা বৃষ্টি এলে, কি রাত হয়ে গেলে, তারা ফুলের খোলাকেই ঘরবাড়ী করে নেয়। বাকস ফুলের মত যে সব ফুলে বাঁক আছে, সে সব ফুল আর যে পছন্দ করে করুক—ভ্রমর মৌমাছিরে করে না।

যে-কোন ঘটক যে-কোন ফুলের বিয়ে দিতে পারবে—এটা ভাবাই মস্ত ভুল। বসন্তকালে একটা বাগানে যদি অনেক রকমের ফুল ফোটে, তাহলে সেইখানে গিয়ে একটু নজর করে দাঁড়িয়ে দেখো—দেখবে যে ফুলে প্রজাপতি ঢুকচে, সে ফুলে হয়ত মাছি ঢুকচেনা ; যে ফুলে মাছি ঢুকচে, সে ফুলে হয়ত পিঁপড়ে ঢুকচেনা। বিলাত থেকে বীচি নিয়ে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় একবার ক্লোভার নামে একরকম গাছের চাষ করা হয়। ফসলে ফুল হল, কিন্তু ফল হল না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, বিলাতে একরকম কালো ভোমরা আছে, যা অষ্ট্রেলিয়াতে নেই—আর ঐ কালো ভোমরা ছাড়া অন্য কোন ঘটকই ক্লোভার ফুলের বিয়ে দিতে পারে না। তখন বিলাত থেকে

গোটাকয়েক কালো ভোমরা নিয়ে অষ্টেলিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হল—
বাস, তারপর থেকেই ক্লোভার গাছের ফল হতে লাগল।
আমেরিকার কোন কোন দেশে বড় ঠাণ্ডা বলে কাঁচের ঘরের ভিতরে
শাঁসার চাষ করা হয়। আগে আগে তার ফুল হত, কিন্তু ফল হত না।
কেন ফল হয় না তাই খুঁজতে খুঁজতে পণ্ডিতরা বের করলেন যে,
কাঁচের ঘরের ভিতর মৌমাছি ঢুকতে পারে না বলেই ফুলের বিয়েও
হয় না, ফলও হয় না। তখন ফুল ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচের ঘরের
মধ্যে মৌমাছি ছেড়ে দেওয়া হল, শাঁসাও ফলতে লাগল।

যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সেই ঘটকের মন জুগিয়ে চলে।
গুরুর পোকা আর ভুঁড়ো প্রজাপতি* সন্ধ্যার সময় বেরোয়,
কাজেই তারা যে ফুলের বিয়ে দেয়,—যেমন বেল, শিউলী, রজনীগন্ধা,—
তারা সন্ধ্যাবেলাতেই ফোটে। উইচিংড়ে, ফড়িং, বিঁবিঁপোকা
অনেক রাত না হলে বেরোয় না, তাই লবঙ্গলতা, মালতীর মত যে সব
ফুলের ঐ সব ঘটক না হলে চলে না, তারা অনেক রাতেই ফোটে।
মৌমাছি, প্রজাপতি, ভোমরা ভোরবেলাতেই বেড়াতে বেরোয়—তাই
তাদের ঘটকালির ফুল—পদ্ম, জবা, কল্কে—সকালেই ফোটে।

যে সব ফুলের গন্ধ আছে, তারা নিজের নিজের ঘটকের আসবার
সময় বুকে গন্ধ ছড়ায়। পদ্ম, গোলাপ, মটর ফুলের মত যাদের ঘটক
হচ্ছে প্রজাপতি তার মৌমাছি—তারা সূর্য্য ওঠা থেকে আরম্ভ করে
সূর্য্য ডোবা পর্য্যন্ত গন্ধ ছড়ায়। সূর্য্য ডুবে গেলে ঘটকেরাও বাড়ী

* ভুঁড়ো প্রজাপতির ইংরাজী নাম 'মথ'। এ প্রজাপতির পেটটা অল্প
প্রজাপতির চেয়ে মোটা, তা ছাড়া এর ডানার বাহার অল্প প্রজাপতির চেয়ে কম।

ফেরে, তাদেরও গন্ধ মরে আসে—তখন আর কার জন্য গন্ধ খরচ করবে? হাসুনাহানা, চীনে লতা আর ধূতরো ফুলের ঘটক সন্ধ্যার সময় বেরোয়; তাই দিনের বেলায় তাদের গন্ধ একরকম থাকেই না—সন্ধ্যা হলেই গন্ধ উথলে ওঠে। যুঁই, বেল, রজনীগন্ধারও ঠিক তাই।

যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সেই ঘটকের মনের মত রং পরে সেজেগুজে বসে থাকে। ছোট ছোট পোকামাছিরে যে ফুলের ঘটক, সে ফুলের রং সাদা কি হলদে, কিম্বা সাদার উপর অন্য রঙের ছিট। প্রজাপতির সব চেয়ে পছন্দ করে লাল রং, যদি সে লাল রং টকটকে না হয়ে একটু ম্যাডমেডে হয়; আর পছন্দ করে নিজের ডানার মত পাঁচরঙা রং। তাই প্রজাপতির যে সব ফুলের ঘটক, তারা হয় গোলাপ জ্বার মত লাল, নাহয় ঋতুফুলের মত পাঁচরঙা। ভুঁড়ো প্রজাপতি সাদা রংটাই বেশী পছন্দ করে, তবে খুব ফিকে হলে কোন রঙেই তার আপত্তি নেই। বোলতা, ভীমরুল কমলালেবুর মত রং পছন্দ করে। গৌমাছিরে অপরাঞ্জিতার মত ঘোর নীল রং সব চেয়ে পছন্দ করে, তারপরই বুম্‌কো ফুলের মত বেগুনী রং, তারপর ফিকে নীল, তারপর মেটে লাল, তারপর সাদা, তারপর ফিকে হলদে, তারপর সব্জে। জল্জলে হলদে আর টকটকে লাল তাদের দুচক্ষের বিষ। সবুজ মাছিরে কাঁচা মাংসের মত লালচে রং পছন্দ করে। তাই ঘাঁটকোল আর র্যাঁক্সিয়া ফুলের রং কাঁচা মাংসের মত। হামাটানা পোকায় নিজের নিজের গায়ের রং পছন্দ করে, তাই কুমড়ো ফুলের মধ্যে হলদে হামাটানা পোকা, আর লাউ ফুলের মধ্যে সাদাটে সব্জে রঙের হামাটানা পোকা দেখা যায়।

ঘটকদের গায়ে রেণু লাগিয়ে দেবার জন্য, আর ঘটকদের গায়ের রেণু গভর্মুখে লাগিয়ে নেবার জন্য ফুলেরা যে কত ফন্দি বের করেছে, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঘটকরা যে ফাঁকি দিয়ে মধু আর রেণু খেয়ে যাবেন, তার কৌ-টি নেই।

পোকামাছিতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তারা রেণুগুলোকে করেছে চট্‌চটে, যাতে সেগুলো চট করে পোকামাছিদের গায়ে লেগে যায়, এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যাবার সময় গা থেকে না ঝরে পড়ে; এ ছাড়া তারা গভর্মুখকেও চট্‌চটে করেছে, যাতে পোকামাছিদের গায়ের রেণু তুলে নিতে পারে।

যি ফুলেই মধুর খলি এমনভাবে বসানো থাকে যে, তা থেকে মধু খেতে গেলে রেণু টোপ আর গভর্মুখের সঙ্গে ঘটকদের গায়ের ঘসা লাগবেই।

ভুঁই তুলসী, বাকস, মটরের মত কতকগুলো ফুলে ঘটকরা গিয়ে ফুলের উপর বসবামাত্রই সেই চাপে কেশরগুলো বেঁকে তাদের পিঠের উপর লাগে—আর পিঠে ডানায় রেণু জড়িয়ে যায়। অনেক ফুলে আবার ঘটকরা বসবামাত্রই কেশর গভর্মুখের দুইই ঠেলে ওঠে—গভর্মুখ লাগে ঘটকের পেটে আর কেশরগুলো লাগে পিঠে; তাতে এই হয় যে, ঘটকের পেটে অল্প ফুলের যে রেণু লেগেছিল তা জড়িয়ে যায় এই সব ফুলের গভর্মুখে, আর পিঠে লেগে যায় এই সব ফুলের রেণু।

টাঁড়স, লুপিনের মত কতকগুলো ফুলে ঘটকের গায়ে রেণু লাগবার চমৎকার কায়দা দেখতে পাওয়া যায়। রেণুগুলো কেশর থেকে ঝরে তলার পাপড়ীতে জমা হয়। ঘটক পাপড়ীর উপর

বসলেই সেই চাপে কেশরের ডাঁটি গিয়ে ব্যাটের মত রেণুর গায়ে ঘামারে, রেণুগুলো ছিটকে ঘটকের গায়ে লাগে।

ঈশেরমূল ফুলের সরু চোঙার ভিতর গুঁড়ো পোকারা দিবিয় ফুঁটির সঙ্গে মধু খেতে ঢুকে পড়ে, বেচারীরা তখন স্বপ্নেও জানে না যে তাদের দিয়ে ফুল ঘটকালি করিয়ে নেবে—মধু খাবার মজা স্তূদে আসলে আদায় করে ছাড়বে। ফুলের চোঙের ভিতরটা সরু সরু শোঁয়ায় ভরা, শোঁয়াগুলোর মুখ সব নীচের দিকে। ঢোকবার সময় খুব সহজেই ঢোকা যায়, কিন্তু ধেরোনই মুশ্কিল—শোঁয়ার মুখ গুলোতে পথ আটকে রেখেচে। পোকা বেচারীরা সেই ফাঁদের মধ্যে পড়ে যতই বেরবার চেষ্টা করে, ততই কেশরের রেণু মেখে ভূত হয়—ঠিক যেন হোলির দিনে কাউকে জোর করে আবীর মাথিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইরকম অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর শোঁয়াগুলো আপনা-আপনি ঝরে পড়ে—তখন পোকারা বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ে; কিন্তু একটু পরেই যখন আবার ভুলে অন্য ঈশেরমূল ফুলে ঢোকে, তখন তাদের গায়ে-জড়ানো রেণু সেই ফুলের গর্ভমুখে লেগে যায়।

এক একটা ফুল আছে, যারা আর এক ফন্দীতে ঘটকদের গায়ে রেণু মাথিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে সাঁড়াসীর মত কল আছে। মৌমাছি, প্রজাপতি তাদের উপর বসলেই তারা সাঁড়াসী দিয়ে পচিমটে ধরে—এমন শক্ত করে ধরে যে, অনেকক্ষণ ধরে না টানাটানি করলে বিছুতেই খোলেনা—সেই ধস্তাধস্তির সময় ঘটকদের গায়ে রেণু লেগে যায়।

কচু ফুলের বিয়ে দিতে কোন ঘটকই বড় একটা যায় না। একে ত গন্ধ খারাপ, তাতে মধু নেই বলেই হয়। তা ছাড়া এ ফুলের

পাপড়ীও নেই যে, রঙের চটকে পাখীরাও এনে ঘটকালি করবে। এ ফুলের মাত্র একটি পেন্সিলের মত ডাঁটি, যার উপরদিকে কতকগুলো কেশর আর নীচের দিকে কতকগুলো গর্ভ বসানো আছে। ঠিক যেন বেয়ে-ওঠা ঘটকদের জন্মই তৈরী—কিন্তু তারা আসবে কি লোভে? হাওয়াতে এ ফুলের বিয়ে দিতে পারে না, কেন না যদিও রেণু খুব বেশী হয়, তবু তা উড়ে যেতে পারে না; যে সবুজ রঙের ঠোঙার মত ফুল পাতা-ডাঁটিটাকে ঘিরে থাকে, তারই ভিতরে পড়ে। তার ঘরোয়া বিয়ে ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু তাই বা ঘটায় কে?—ঘটায় গেঁড়ি আর গুগুলি। কি করে ঘটায় বল্চি। বৃষ্টির দিনে মাথা বাঁচাবার জন্ম তারা হয় ত গুটীগুটী করে ফুলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে গিয়েই দেখে দিব্যি মখমলের মত নরম বিছানা; তখন তারা সরাসর নীচে নেমে গিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমোয়, আর রোদ ফুটলে আশ্বে আশ্বে বেরিয়ে আসে। ফুলের ভিতরকার ডাঁটি ধরে ওঠা-নাকা করবার সময় ফুলের বিয়ে হয়ে যায়।

ডুমুর ফুল আর কাঁটাল ফুল ভারি মজা করে তাদের বিয়ে ঘটায়। তোমরা হয় ত জান ডুমুরের ফুল হয় না—যে ডুমুর ফুল দেখে সে রাজা হয়ে যায়; তাহলে তোমরা সকলেই রাজা হতে পারবে। আসলে ডুমুরের ফুল খুব ছোট ছোট হয় বলে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীণ কি আতঙ্গী কাঁচ দিয়ে দেখতে হয়। ডুমুর ফুলের বোঁটার মাথা, যাকে চাক বলে, সেটা দেখতে ঠিক, তুবড়ীর খোলের মত। তারই মধ্যে একরাশ কুচি কুচি ফুল গাদা থাকে। একে ত তাদের ফুল খালি-চোখে দেখা যায় না, তাতে না আছে সে সব ফুলে গন্ধ, না আছে মধু; কাজেই তারা ঘটক ধরবার জন্ম-অমন

ভুবড়ীর খেলের মত চাক করেছে। পিঁপড়ে কি ছোট ছোট বোল্তারা খেলের ছেঁদা দিয়ে ভিতরে ঢুক যায় ডিম পাড়তে— কেন না বেশ কুঠরীর মত নিরিবিলি জায়গা। ঢোকবার সময় তারা অশ্রু ফুলের রেণু মেখে আসে; তাইতেই এ ফুলের বিয়ে হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের ডিমগুলো যখন পিঁপড়ে কি বোল্তা হয়ে ফুটে বেরায়, তখন তারা এই ফুলের রেণু মেখে বেরায়; তারপর যখন অশ্রু ফুলে গিয়ে ঢোকে, তখন সে ফুলের বিয়ে হয়ে যায়।

যে ভাবে ডুমুরের ফুলের বিয়ে হয়, কাঁটাল ফুলের বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়। সেই জন্যে মাটির নীচেও কাঁটাল ফলতে দেখা যায়—কেন না পিঁপড়ে, বোল্তা মাটি ফুটো করে মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে।

জলের ফুল জলকে দিয়েই ঘটকালি করিয়ে নেয়। জলের মধ্যে একরকম গাছ হয়, যার কোন ফুলটা হয় মেয়ে, কোনটা পুরুষ। ফুলগুলো জলের মধ্যে ডুবে থাকে, কিন্তু এমনি মজা যে পুরুষ ফুলটার কেশর যেই পেকে পুরুষ হয়ে ওঠে, অমনি তা বোঁটা থেকে আলাদা হয়ে কাগজের নৌকার মত ভেসে ওঠে, আর কেশরগুলো দাঁড়ের মত চারপাশে ঝুলতে থাকে। মেয়ে ফুলটার গর্ভ যেই পুরুষ হয়, সেও অমনি ভেসে ওঠে, কিন্তু বোঁটা থেকে খসে যায় না। পুরুষ ফুলটা স্রোতে ভাসতে ভাসতে মেয়ে ফুলটার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে, আর অমনি তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এ ফুলের গাছ তোমরা বোধহয় দেখে থাকবে। এরই নাম পাটাসেওলা বা গঞ্জ।

তোমরা দেখেছ কোন কোন গাছের একটা বোঁটায় একটাই ফুল হয়,—যেমন গোলাপ, ঘুঁই, টাঁপা—আবার কোন কোন গাছের একটা

বৌটায় অনেকগুলো করে ফুল হয়,—যেমন আঁব, নারকোল, সৌদাল, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, মোরগফুল, ফুলকপি। একটা বৌটায় একটা ফুল হলে তাকে বলে একানে ফুল, আর অনেকগুলো ফুল হলে তাকে বলে ঝাড়ফুল। যে সব গাছের ঝাড়ফুল হয়, তারা একানে ফুলের বদলে ঝাড় ফুল তৈরী করে কেন জান? আঁবের বাসন্তী রঙের ছড়া—যাকে বোল্ বলে,—সে হচ্ছে ঝাড়ফুল। ঝাড়ফুলটা দেখতে খুবই বড়, কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে যখন তার এক একটা কুচো ফুল তলায় ঝরে পড়ে, তখন দেখো তারা কত ছোট। সব ঝাড়ফুলেরই কুচো ফুলগুলো এইরকম ছোট। এক বৌটায় একটা ছোট ফুল থাকলে তা পাছে পোকামাছদের নজর এড়িয়ে যায়, তাই তারা এক বৌটায় এক গাদা ফুল জড় করে রাখে।

রং আর গন্ধ দিয়ে ফুল যে কেবল তার মনের মত ঘটককেই টেনে আনে তা নয়, বাজে ঘটকদেরও টেনে আনে। তারা মধু খাবার রান্ধস, অথচ ঘটকালি করবার মুরদ তাদের এক কাণাকড়িও নেই। তাদের ভাগিয়ে দেবার জন্তু গাছ কত ফিকিরই না বের করেছে। মৌমাছি প্রজাপতি কি হমিং বার্ড * যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তারা অল্প ঘটক মোটেই পছন্দ করে না—কেন না তাদের রেণু

* হমিং বার্ড একরকম আমেরিকার পাখী। এত ছোট পাখী আর পৃথিবীতে নেই। এরা দেখতে বোল্‌তার চেয়ে একটু বড়—আমাদের দেশের ছর্গাটুন্টুনির অর্ধেক। এদের রঙান পাখা আর লম্বা লম্বা ঠোঁট। এরা মৌমাছি, ভোম্বার মত ফুলের মধু চুষে খায়। এরা যখন ফুলের সামনে ওড়ে, তখন এত জোরে পাখা নাড়ে যে, ভোম্বা ওড়বার মত গুন্‌গুন্ শব্দ হয়। এই জন্তুই এদের নাম হমিং বার্ড, কিনা গুন্‌গুনে পাখী।

কম, কিন্তু তাদের ঘটকরা তা ঠিক অন্য ফুলে পৌঁছে দেয়; এক দানা রেণুও পথে পড়ে নষ্ট হয় না। তা ছাড়া তারা এত চটপট্ এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যায় যে, বিয়ে হতে গোটেই দেবী হয় না। পিঁপড়ে, গঁড়ি, আর হামাটানা পোকারা মধুর লোভে কাতারে কাতারে গাছ বেয়ে ওঠে, কিন্তু তারা কুঁড়ে ঘটক—আস্তে আস্তে গাছ বেয়ে উঠবে, আস্তে আস্তে গাছ বেয়ে নামবে, তারপর তেমনি আস্তে আস্তে অন্য গাছে গিয়ে উঠবে। কাজেই যতক্ষণে তারা একবার বিয়ে দেবে, ততক্ষণ মৌমাছি প্রজাপতির হাতে পঞ্চাশবার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ঐ কুঁড়ে ঘটকদের এমন তেলচুক্চুকে পিছল গা যে, সমস্ত দিন ফুলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও বেশী রেণু গায়ে লাগবে না। আর যদি তারা রেণু মেখে ভুঁও হয়ে যায়, তবু অন্য ফুলে যেতে যেতে পথেই সমস্ত রেণু গা থেকে ঝরে পড়বে—বিয়েও হবে না, এক গাদা রেণুও নষ্ট হবে। এই সব ঘটকরা যদি মধু খেয়ে যায়, তাহলে মৌমাছি প্রজাপতির মত কাজের ঘটকরা কিসের লোভে আসবে?—তাই তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য গাছেরা নানান ফিকির বের করেছে।

তুলসী গাছের গুঁড়ি শোঁয়ায় ভরা, হামাটানা পোকারা উঠতে গেলেই গায়ে শোঁয়া ফুটে যায়। শিয়ালকাঁটার গুঁড়ি থেকে লম্বা লম্বা কাঁটা বেরিয়েচে—যেই ফুলখেকো গঁড়িরা উঠতে যায়, অমনি নরম মুখে কাঁটার খোঁচা লাগে। বাঁশের গুঁড়ি কাঁচের মত তেলা; অনেক হামাটানা পোকা উঠতে যায়, আর হড়কে পড়ে যায়। তামাকের গুঁড়ি এমন চট্‌চটে যে, ছোট ছোট উড়ো পোকারা আঠায় জড়িয়ে মরে যায়। অনেক আমগাছের গুঁড়িতে কাঁঠ পিঁপড়েরা

পালে পালে পাহারা দেয়—অন্য পোকা, পিঁপড়ের সাধা কি যে উপরে ওঠে। কোন কোন গাছ আবার তার গুঁড়ির এক একটা গাঁটের কাছে গুঁড়িটাকে ঘিরে পাতার বাটি তৈরী করে রেখেছে। সেই বাটিতে শিশিরবৃষ্টির জল জমে থাকে। হামাটানা পোকারা সেই পর্যন্ত উঠে ফিরে যায়। অনেক পিঁপড়ে আছে যারা এন্নি নাছোড়বান্দা যে, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু মধু না খেয়ে ছাড়বে না। তাদের তাড়িয়ে দিতে না পেরে কোন কোন গাছ ভুলিয়ে রাখার ফিকির করেছে। তারা যে মধু খাবে আর কুটকুট করে ফুলের নরম পাপড়ী কাটবে, তার জো নেই। কি পাতার গোড়া দিয়ে একরকম মিষ্টি রস বেরোয়, যা ডেঁয়ে পিঁপড়েরা মধু মনে করে, তাতেই মজে থাকে, আর কষ্ট করে উপরে ওঠে না। কিন্তু সে নকল মধু। ওদিকে আসল মধু যে মনের মত পাখা-ওয়ালী ঘটকরা লুটে খাচ্ছে, তার খোঁজও এরা পায় না।

ঘরোয়া বিয়ে আটকাবার জন্য গাছেরা কম ফন্দী বের করে নি। বেশীর ভাগ সমক ফুলের গর্ভ আর কেশর দুই-ই এক সঙ্গে পাকে না। শিমূল, ট্যাডস, জবা, সূর্যামুখীর কেশর পাকে আগে; তারপর কেশরের রেণু সব ঝরে গেলে গর্ভ পাকে। চাঁপা, রাংচিতে ঈশেরমূলের গর্ভ পাকে আগে, তারপর গর্ভ গুটি বাঁধলে কেশর পাকে। মসনে ফুলের কেশর গর্ভ দুই-ই একসঙ্গে পাকে, কিন্তু তার গর্ভটী কেশরের চেয়ে উঁচুতে বসানো, কাজেই গর্ভমুখে রেণু পড়তে পারে না। ঘেঁটু ফুলের কেশর গর্ভ দুই-ই এক সময়ে পাকে, আর দুই-ই মাথায় সমান। কিন্তু তার মজা এই যে, টাটকা ফোটা ফুলে কেশর-গুলো লম্বা হয়ে বেরিয়ে থাকে, আর গর্ভনলীটা উল্টো দিকে বেঁকে

থাকে। যেই কেশরের রেণু ফুরিয়ে যায়, অম্নি কেশরগুলো যায় গুটিয়ে, আর গর্ভনলীটা ওঠে খাড়া হয়ে। টাটকা-ফোটা ঘেঁটুফুলের সামনে ভুঁড়ো প্রজাপতি যখন মধু খাবার জন্য উড়তে থাকে, তখন তার ডানায় কেশরের রেণু লেগে যায়—তারপর যখন সে আর একটা ঘেঁটুফুলে উড়ে যায়,—যা হয় ত আগের রাত্রে ফুটেচে,—তখন গর্ভ-মুখেই তার ডানা লাগে; অম্নি বিয়ে হয়ে যায়।

অর্কিড ফুলের* কেশর গর্ভ দুই-তিন এক সময়ে পাকে, আর কেশর গর্ভের উপরে বসানো। কাজেই উপর থেকে রেণু ঝরে পড়ে সহজেই ধরোয়া বিয়ে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। অর্কিডের গর্ভমুখটা একটা ঢাকনীর মত ছোট পর্দা দিয়ে ঢাকা। উপর থেকে রেণু ঝরে পড়লে, তা ঐ ঢাকনীর উপর পড়ে, গর্ভমুখে পড়তে পারে না। মৌমাছির মত ফুলের মধ্যে মাথা চালিয়ে দিয়ে ঢাকনী ফুঁড়ে মধু খায়, তখন তাদের মাথায় জড়ানো রেণু গর্ভমুখে লেগে যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

ও

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি।

* অর্কিড ফুলের মত দেখতে সুন্দর ফুল আর নেই। এক একটা অর্কিড ফুল গোলাপ পদ্মকেও হার মানিয়ে দেয়—কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্কিড ফুলে গন্ধ নেই। অনেক বড়লোকের বাগানে অর্কিডের বাগান-ঘর (অর্কিড হাউস) দেখতে পাবে।

সাধুমা'র কথা ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

যাহোক আমরা মামার বাড়ীর বাগানে খুব আমোদে ছিলাম বটে, কিন্তু আমার এক এক দিন কলকাতায় মন ছুটে আসত, সেদিন আমি যেন স্থির হতুম ও একটু ভাবতুম। আমার বেশ মনে আছে মা বার বার কপালে হাত দিয়ে দেখতেন ও বলতেন—আজ যে বড় চুপচাপ, অস্থখ করেছে নাকি? এত ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছ যে? দিদিমা বলতেন ওর আপন দিদিমার জন্মে মন কেমন করছে, তাই ভাবছে। যদিও কথা সত্য, তবু দিদিমা এমন ভাবে বলতেন যে আমার শুনে রাগ হত। এইরকম ক'রে প্রায় ৫৬ মাস কেটে গেল। তারপর পূজার আগে চিঠি গেল আমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। আমার খুব আহ্লাদ হ'ল। সবাই বলতে লাগল—আহা, এতদিন ছিল, সব চলে যাবে, এই বলে সকলে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে দিন দেখে চিঠি পাঠালেন। বোট ও গাড়ীভাড়া ঠিক হ'য়ে গেল। তখন কোম্পানিতে এত গাড়ী পাওয়া যেত না। আগে ঠিক করতে হত। এক টাকা বায়না দিয়ে রাখতে হ'ত।

আমরা আশ্বিন মাসের ২রা সেখান থেকে রওনা হলাম। তিন দিনে কলকাতায় পৌঁছলাম। কলকাতায় এসে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কত দৃশ্য—কত জাহাজ, নৌকা, পানুসি, কত

লোক স্নান করছে, কেউবা আবার জপ করছে; আবার পটলের নৌকা হ'তে পটলের ঝোড়া আঁজাড় করে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছে, কেউ মুটের মাথায় তুলছে। আবার কোন নৌকায় লাল লাল হাঁড়ি থাক্ থাক্ করে' সাজান হচ্ছে। এইরকম খুব গোলমালে সহরটি গম্গম্ করছে। এদিকে ভাড়া গাড়ীগুলি সারবন্দি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রামু দাদা পান্সি করে ধারে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল কখন তীরে নামতে পাব; কতদিন কর্তামণি, দিদিমা ও দাদাকে দেখিনি; বড়দি, ছোটদির সঙ্গে কতদিন খেলি নি। কত কথা পেটে জমে রয়েছে। সে সব আর পেটে ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবুও আমি জলটা দেখতে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতুম, সেজন্য বোটের একটা জানলা খুলে রেখেছি। আমরা বিস্কুট খেতুম, তার বাক্সের সঙ্গে দড়ি বেঁধে, জলে যে সমস্ত পেঁয়াজ ভেসে যেত সেগুলি তুলতুম, মাঝিদের দেবার জন্যে। মা কেবল বলছেন ঐরকম করে করে শেষে হাতে ব্যথা হবে।

আমরা বসে আছি, হঠাৎ দেখি দাদা গাড়ি করে এলেন। দাদার সঙ্গে বাবার মাসতুতো ভাইও এসেছিলেন। কাকা দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দেখেই আমি একেবারে নেচে উঠেছি—ওগো মাগো! দাদা এসেছেন, বড় মজা হবে। তারপর দাদা আমাদের সঙ্গে দেখা করে কত খুসীই হলেন। আমার পেটে যত গল্প জমা ছিল, ইচ্ছা যে দাদাকে একেবারে সব বলে ফেলি। একমুখে পেরে উঠছি নে। দাদাও কত জায়গায় বেড়িয়েছেন—দুবার আলিপুর গেছেন। নতুন বাঁদর এসেছে, বাঁদরকে কলা পাইয়েছেন।

যে যে গল্প জমা ছিল বলা হচ্ছে, ও ভাইবোনে খুব গুলজার হচ্ছে। এইরকম গল্প হ'তে হ'তে জোয়ার এল। আমাদের রামুদাদা পাল্কি ও দরোয়ান, আর একজন দিদিমার পুরাণো ঝি পাল্কির ঘেরাটোপ হাতে ক'রে উপস্থিত। তখন ঘাটে একটা সোরগোল পড়ে গেল। সব লোক হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর এক এক করে বাসু, বিছানা, ব্যাগ ইত্যাদি নামতে লাগল। কাকা মাঝিদের বকশিষ্ দিলেন। তারপর মা পাল্কিতে উঠলেন ও পাল্কির চারপাশে ঘেরাটাকা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা ভাইবোনে সবাই মিলে গাড়ীতে উঠলুম। একটু পবেই ঠাকুরবাড়ীতে পৌঁছলুম। মা একেখানে মন্দিরে নেবে দর্শন করে বাড়ী যাবেন বলে গিয়ে দেখেন, তখনও গা তোলানো হয় নি। কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর ব্রজঠাকুর এলেন, ঠাকুরের ভোগ অর্পিত হ'ল। মা দর্শন করে হরির লুট, সন্দেশ ও বাতাসা আনবার টাকা দিয়ে এলেন। প্রণামীও দেওয়া হল। পরে মা বাড়ী এসে দিদিমার সঙ্গে দেখা করে, প্রণাম করে ঘরে গিয়ে সব গোছাতে লাগলেন। আমি আবদার ধরলুম—বেড়'তে যাব, ভাল পোষাক চাই ও এফুনি চাই, আমি কর্তামণির সঙ্গে যাব। মা রাগ করে বকতে লাগলেন যে—মেয়ের কি আবদার! এই এলুম, এখন সব গোছাব, না ওর কাপড় দেও, চুল বাঁধ! মেয়ে কি দুর্ঘটুই না হয়েছে। আমি এরকম অন্যায় আবদারে মাকে কত জ্বালাতনই না করেছি। মূ'র আবার এর জন্মে বকুনি শুন্তেও হ'ত দিদিমার কাছে। দিদিমার কানে উঠলেই তিনি বলতেন—কাপড় বের করতে আর কতক্ষণ লাগে? ও কতদিন বেড়াতে যায় নি। সব তাতেই আজকাল মেয়ে ও বোদের কুঁড়েমি! আমি

এক এক দিন আবার দিদিমাকে গিয়ে বলে দিতুম। সেদিন মা আমার উপর বড় রেগে যেতেন। কিন্তু তিনি কখনও গালাগালি, কি বেশী মারপিট, এ সব জানতেন না। তাঁর বড় বড় পদ্যের মত চোখ ছিল, সেগুলি একটু কুঁচকে চেয়ে থাকতেন। এইটি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। আমাদের উপর, এমন কি ঝিদের উপর রাগলেও তাঁর ঐ একইরকম ভাব হত। যাহোক, সেদিন বেড়াতে গিয়ে নতুন আনন্দ লাভ কবলুম। কতদিন বাদে কেল্লার ব্যাণ্ড শুনে আনন্দে প্রাণ নৃত্য করতে লাগল। সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে, কাপড় ছেড়ে, দুধ খেয়ে ও-বাড়ীর সবার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা আমায় আশ্চর্যিক ভালবাসতেন। আমাকে আদর করে কত কথাই না জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আবার কচুরি, মিষ্টি ইত্যাদি খেতে দিলেন। পরে মার্টারমশায়কে খবর দেওয়া হ'ল যে আমি এসেছি, পড়াবার জন্য যেন কাল থেকে তিনি আসেন। পরদিন তিনি এসে পড়াতে বসলেন। পড়া মোটেই হয়নি, তবে যতটুকু পড়েছিলুম ভুলে যাইনি। ঠিক ঠিক বানান, নাম্তা সব মুখস্থ বলে গেলুম। সেদিন থেকে গুরুমশায় আর দুখানা বই বাড়িয়ে দিলেন—বাল্যাশিক্ষা আর পঞ্চপাঠ। এইরকম লেখাপড়া চলতে লাগল। আমি আদরে বড় হতে লাগলুম। আমি আগে লিখেছি যে বাড়ীতে দুর্গোৎসব আছে বলে আমরা বাগান থেকে চলে আসি। তখন মা দুর্গার সঙ্গে খড়ি হয়েছে, আর চালচিত্র হচ্ছে। আমি চুপ করে বসে বসে ঠাকুর গড়া দেখি—শুধু দেখিনে, আমার মনে মনে সাধ হয় যে আমিও বড় হয়ে এইরকম গড়ব। কেন, কুমররাও মানুষ, আমিও মানুষ। বিজয় মামাও ত কুমোরদের কাছে বসে বসে শিখে নিয়েছেন। আমার

বাল্যজীবনের কথা ষতদিন থেকে স্মরণ হয়, ততদিন আমার মনের এই অহংকারটুকুর উদ্দীপনা মাঝে মাঝে উঠত। অথচ আমার ক্ষমতা কিছুই ছিল না, বা নেই। সেদিন একটু মাটি কুমোরদের কাঁছ থেকে সংগ্রহ করে প্রথম একটা পুতুল গড়লুম। সেটি ভাল হ'ল না। আমার নিজেরই পছন্দ হ'ল না। পরে একটা শিল নোড়া করি, বেশ হ'ল; তারপর একটা মূনের পিরিচে মাটি চেপে চেপে দিয়ে ঠুক ঠুক করে ছাড়িয়ে নিয়ে শুকাতে দিলুম। বেশ মাটির পিরিচ তৈরি হ'ল। আবার তার ধার মায়ের পেনসিল-কাটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বেশ বাহারি করে দিলুম। পরদিন ঘি়ের বাটির ছাঁচে বাটি গড়লুম। মা ও দিদিমা দেখে বললেন—“বাঃ! বেশতো হয়েছে, ছেলেমানুষ বেশ গড়েছে।” আমার আর আনন্দের সীমা নেই! একে নিজের মনে আহ্লাদ হয়েছিলই—আবার নতুন মতলব বের করলুম। আজ ছোট করে একটা উনুন গড়ব। এক টুকরো ভাঙা শ্লেট জোগাড় করেছি, তারই এক পাশে এক কাঠের উনুন করেছি; আর এক পাশে এক কয়লার উনুন করব ভাবছি। কিন্তু কয়লার উনুনে শিক্ দিতে হয়—শিক্ আমি কোথায় পাব? তোষা-খানায় গেলুম। একটা ভাঙ্গা ছাতা পড়ে আছে, কিন্তু সে মস্ত মস্ত শিক্—কি করে ছোট হবে? সে হ'ল না, তখন মাথায় আর এক বুদ্ধি জেগেছে; সেটা দুর্মু বুদ্ধিই বলতে হবে, কিন্তু যখন উনুন হয়েছে, তখন শিক্ না দিলে ত চলবে না। তখন কি করি, মাথায় মস্ত খোঁপা আছে; তার তিনটি কাঁটা ভেঙ্গে ৬টা শিক্ করে, উনুন গড়া সাঙ্গ করে ফেললুম। এখন আর মনের শাস্তি নেই, কবে আমার উনুন শুকবে? আমার পিতলের ছোট ছোট হাঁড়ি, কড়া, হাতা,

খুস্তি ইত্যাদি বাসন আছে। তা ছাড়া আমার পূজার বাসন, পাথরের শিলনোড়াও ছিল। আবার সাহেব বাড়ীর কলের পুতুল, ভাল ভাল বিলাতী খেলনাও ছিল। আমার ও দাদার যে খেলনা কিন্তে ইচ্ছা হত, তার কোন বাধা কখনও পাই নি; কে বাধা দেবে? কর্তামণির কড়া হুকুমই আছে যে, ছেলেরা যখন যে খেলনা চায়, খাজাঞ্চিদাদা এনে দেবে। আমাদের আর পায় কে? বেড়াতে গিয়ে যা পছন্দ হত দোকানদারের কাছে চাইতুম। সেও তাড়াতাড়ি অমনি প্যাক করছে, দাদাও সঙ্গে সঙ্গে দাম টুকে নিচ্ছেন। মহিষের গাড়ী করে খেলনা বাড়ীতে আসত। এতে কখনও কর্তামণি বলেন নি যে, কেন এত কিনেছ? বাল্যকাল হতে এখন পর্য্যন্ত কখনও কোন ইচ্ছায় বাধা পড়েনি, পরে কি হয় জানি নে। যখন লিখতে আরম্ভ করেছি, তখন সঠিক লিখে যাব।

আমার সাত বছর থেকেই বিয়ের কথা হতে লাগল। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার বিয়ের কথা হয়। তাঁরা আমাকে আদর ও আচ্ছাদ করে দুই একদিন নিয়েও যান। কিন্তু তখন এ প্রথা ছিল না যে, পাত্রপাত্রীর দেখাদেখি হবে। মেয়েরা নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন, ও পুতুল দিয়ে নানান গল্প করতেন। আমিও আমার দিদিমার সঙ্গে যেতুম।

কিছুদিন পর শুভদিন দেখে আমার আশীর্বাদ হয়ে যায়। পাত্র পক্ষ হতে পাত্রের বড় ভাই এসে দেখে যান, ও আমাকে একটা মোহর দেন। আমার দিদিমাও আশীর্বাদ করে আসেন একটা মোহর দিয়ে। কিছুদিন পরে—বেশ মনে আছে ৮৯ মাস বাদে—সে পাত্রের নানারকম দুর্গাম রটে। সে কথা দিদিমার কানেও ওঠে। তিনি মা বাবা সকলকে বলেন ও স্থির করেন যে, ও পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে না।

তা ছাড়া কর্তামণির কথাই ছিল, ও কেঁদে দিদিমাকে বলতেন যে—ওকে কোথায় দেবে, কে অযত্ন করবে। এই সকল কথা আমিও একটু একটু শুনি, তবে আমার সদানন্দ মন ওসব কিছুই বোঝে না। পরে নাকি দিদিমা ওদের বাড়ী গিয়ে বা যা শুনেছেন সব খোলাখুলি বলে আসেন। তাঁরা আর কি বলবেন? যার মেয়ে সে যদি না দেয়, তবে ত কোন জোর নেই। এইরূপে আমার প্রথম সম্বন্ধ ভঙ্গ হয়। ওঁদের ভিতরে ভিতরে মনও ভেঙেছিল। যাহোক আমাদের বাড়ীতে ও সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল। আমিও দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠলুম। আমি প্রায়ই ঠাকুর বাড়ী যেতুম। ওখানে রোজ তিনবার কীর্তন হত,—ভোরে, পূজার পর, আর সন্ধ্যাকালে। আমার শুনতে বেশ ভাল লাগত। আমার শোন্বার বেশি অবকাশ হত না। তবে কোন পালপরব উপলক্ষ্যে যেতুম ও শুনতুম। এ ছাড়া দিদিমার কাছেও অনেক মেয়ে-কীর্তনী আসত। শুনতে চমৎকার লাগত। বৈঠকী গান রোজ হত। আবার কখনও কখনও বাইনাচও হত। তাদের কাছ থেকে অনেক গান শিখ ফেলতুম। আবার গানের বই পেলেই গান করবার সখ হত। আমার প্রাণটা খুব সখের বটে। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনাই কমতে লাগল। আমি একদিন গড়ের মঠে বেড়াচ্ছি, দেখি কর্তামণি একটা বেঞ্চে বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন। আমার কর্তামণির পাশে কে বসেছেন, দেখবার বড়ই ইচ্ছা হল। তখনি ছুটে গিয়ে, দেখি অতি সুশ্রী দেবতার মত দেখতে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, আর তাঁর কথাগুলি যেন মধুমাখা। আস্তে আস্তে, খুব মাথোর সঙ্গে, ভক্তিভাবে কথা বলছেন—আপনার কোন চিন্তা নেই; আমার এক ছেলে, আপনার

পৌত্রী ঘরে নিয়ে যাব, এটা আমি বহু ভাগ্য মনে করি। এই সময় আমি দৌড়ছি, খাজাঞ্চিদাদাও আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। অমনি কর্তামণি চোখ ছল্ ছল্ করে তাঁকে বললেন যে—এই শোন, তোমরা কি বলবে বল। আমি অসুস্থ, আমি জানি নে। বাড়ীর ভিতরকে বল ইনি এঁর ছেলের সঙ্গে (আমাকে দেখিয়ে বললেন) এর বিবাহের প্রস্তাব করছেন। দেখ বাপু তোমরা বোক, আমার ত অসুখ। তখন সেই দেবোপম মূর্তিটা একটু হাসি হাসি মুখে বললেন—আমি নিজে একদিন কাকিমার কাছে যাব'খন। এই কথা বলবার পর তিনি আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তখন কর্তামণির মন ভাল নেই, তাঁর অসুখ; সদাই মন উৎকণ্ঠায় ভরা। তাতে আবার আমার বিয়ের প্রস্তাবে মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খাজাঞ্চিদাদা বললেন—মশায়, সে ত অতি সৌভাগ্যের কথা। তিনি আমায় শিখিয়ে দিলেন প্রণাম করতে, আমিও প্রণাম করলুম।

সন্ধ্যার পর খাজাঞ্চিদাদা দিদিমার কাছে এসে মাঠে আমার বিয়ের সম্বন্ধে যে যে কথা শুনেছিলেন, সব বললেন। আমাদের বাড়ীতে এ কথা নিয়ে খুব আন্দোলন চলতে লাগল। এইরকমে দশ দিন কেটে গেল। দুর্গাপূজা এসে গড়ল। আমাদেরও নতুন পোষাক ও জরির জুতা পাবার আহ্লাদ শুরু হ'ল। আমার আরও আহ্লাদ হয়েছিল যে, দাদা একলা পূজার নিমন্ত্রণ সারতে বেরতেন, এবার আমার উপর অর্ধেক ভার হ'ল। দাদার হঠাৎ একটু অসুখ হ'ল। অত বাড়ী বাড়ী ঘোরালে তাঁর কষ্ট হবে বলে কর্তামণি বললেন—খুকিকেও খোকার আর একটা পোষাক দিয়ে নিয়ে যাও। সবাই শুনে হাসতে লাগল। দিদিমা বললেন যে—পোষাক না হয় দিলুম,

কিন্তু চুল কিসে ঢাকা যাবে? কর্তামণি বললেন—আমি নিজেকে বেনারসী পাগড়ী বেঁধে দেব, দেখো দেখি কেমন দেখাবে। এই সব মন্ত্রণা হয়ে আমার পোষাক পরিবর্তন হ'ল। দাদার ছুরকম পোষাক হয়েছিল। লাল মখমলের ওপর চুমকি কল্কার কাজ, আর কালো রংয়ের একটা। কর্তামণি বললেন—লালটা একে দাও, বেশ মানাবে। সে কাপড়টা আমাকেও বেশ মানাল; তবে তাতে জরি ছিল না, বড় বড় লেস্ দেওয়া ছিল। আমার রোজ রোজ গাউন পরে আর ভাল লাগত না। আমার এক একবার মনে হত—আচ্ছা, আমি দাদার মত যদি খোকা হতুম, তাহলে জরির পোষাক পরে কেমন রাজপুত্র সাজতুম। রোজ রোজ কি মেম সাজা ভাল লাগে। ঠাকুর আমার বাল্য জীবনের এই সাধ পূর্ণ করবার জন্যই বুঝি কর্তামণিকে মনে করিয়ে দিলেন। আমি পাগড়ি বেঁধে খোকা সঙ্গে অনেক বাড়ী নিমন্ত্রণ সারলুম। কোন কোন বাড়ীতে দালানে প্রতিমার সামনে টাকা দিয়ে প্রণাম করিয়ে আমাদের খাজাঞ্চিদাদা তাদের সরকারের খাতায় নামটি লিখিয়ে দিলেন। আমরাও প্রতিমা দর্শন করে গাড়ীতে উঠলুম। আবার কোন বাড়ীতে বাবুরা চণ্ডিমণ্ডপে বসে আছেন। তাঁরা ভাল করে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখনি আমার লজ্জা ও ভয় হত। বড় মুস্কিল ত! খাজাঞ্চিদাদা পৌত্র বলেই সারছেন; কর্তামণির নামটি লেখানো হচ্ছে। আবার কোন কোন বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানায় উঠতে হত। আর এক এক জায়গায় রূপার থালায় মিষ্টি ও রূপার গ্লাসে জল, দুটি মিঠা পানের খিলিও পাওয়া যেত। কোথাও আবার চণ্ডির গান হচ্ছে। উঠানে লোক জমেছে বিস্তর। আবার এক এক বাড়ীতে দোতলার হলে বাই

নাচ হচ্ছে। এইরকম ঘুরে ঘুরে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বাড়ী যাবার জন্তু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। খাজাখিঁদাদাকে বলছি—চল, আর কত ঘোরাবে। তিনি তবুও যতদূর পারেন সেরে যেতে চান। কিন্তু সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরা চাই, নইলে কর্তামণি রাগ করবেন। বাড়ীতে আরতির সময় উপস্থিত থাকা চাই। আমি ও দাদা দুজনেই নিমন্ত্রণ সেরে এসেই দালানে দাঁড়ালুম। পরে আরতি দর্শন করে উপরে উঠলুম। ষষ্ঠির দিন বেলবরণ থেকে আনন্দ চলেছে প্রায় কোজাগর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। বিজয়া দশমীর দিন আমাদের ঠাকুরের সঙ্গে সবাই হেঁটে যেত। আসাসোটা, বল্লম, রূপার ছাতা ইত্যাদি বেরত। আমাদের ঠাকুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত, দুখানি নৌকা বেঁধে তার উপর প্রতিমাখানি বেঁধে দিত। আমরা সব ঘাটের উপর ছোট ছোট ছাতা মাথায় দিয়ে বসে দেখতুম। কেন না যে সময় আমাদের প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত, তখন বেশ কড়া রোদ থাকত। আমাদের সব বাড়ীর ঠাকুর এক ঘাটেই ভাসান হ'ত। তারপর আমরা গাড়ী করে সব ঘাটে ঘাটে ভাসান দেখতুম। পরে বাড়ী গিয়ে শান্তিফল নেওয়া, প্রণাম ও কোলাকুলির ধুম পড়ে যেত। দুর্গা-পূজার এক মাস আগে থেকে আর দশদিন পূজার পর পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী সরগরম থাকত। আগেই পূজার ধূপ তৈরী, হরেকরকম বড়ি দেওয়া—এ সব কাজ দিদিমা নিজে তদারক করে করাতেন। দিদিমার একজন বিধবা ভাঙ্গ ছিলেন। তিনি প্রায় ঐখানেই থাকতেন। আর আমাদের একজন পিসিমা ছিলেন। এই পিসিমা পূজার তাঁড়ারের কর্তা ছিলেন। লোকজন ঘরামীদের খাটামো, জলখাবার দেওয়া, দেখাশোনা সব করতেন। পূজার তিন দিন খুব আমোদ হ'ত।

আমাদের পাশের বাড়ীর পিসিমা, বৌঠাকুরগণ আর বড়'মা, মেজমা এঁরা সব আসতেন। সবাই মার ঘরে জমা হতেন। সেখানে গল্প, হাসি ও ভাস খেলা হত। তখন এ চাল ছিল না যে, বৌরা 'সব কাজ করবে। আজকাল এ হাওয়াটা হয়েছে। আর সে হয়েও গেল বহুদিন। আমার বয়স ছিল তখন ৮; এখন আমার বয়স ৪৪ বছর। এতদিনে চালচলন পরিবর্তন হবার কথাই ত। আমার দিদিমার কাছে গল্প শুনেছি যে, তাঁরা ষশোর থেকে ৮৯ বছর বয়সে এসেছিলেন। তাঁরা শ্বশুরশাশুড়ীকে ঠাকুর ঠাকুরগণ বলতেন। স্মৃখে যেতেন না, কিন্তু দাদাশ্বশুর ও শাশুড়ী যাঁরা থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে খুব খেলা, ঠাট্টা, হাসি, গল্প, ফুলের মালা পরানো; এই সব চলত। হোলির সময় মন্দিরে খুব আনন্দ ও উৎসব হত। দাদাশ্বশুররা দিদিমাদের সাদা মলমলের একটি করে পেশওয়াজ দিতেন; আর একখানা করে' ওড়না তৈরী হত, তাতে চওড়া চওড়া গোটা বসানো থাকত। আবার আবীর নেবার জন্তু একটি করে কোলা তৈরী হত। রূপার বড় গামলায় আবীর গোলা উঠানের মাঝখানে থাকত; আর দিদিমাদের একটি করে রূপার পিচকারী হাতে থাকত। তারপর রং খেলা হত। কিন্তু মা'দের এটা আর ঘটে নি। কারণ তাঁদের ভাগ্যে দাদা দিদি কেউ ছিলেন না যে, নাতবৌ ও নাতীদের নিয়ে আমোদ করবেন। পূজার সময় দেখতুম একবার বেনারসী চেলি প'রে প'ইচে, বাউটি, নখ, মল, এ সব অফালঙ্কারে ভূষিত হ'রে পুষ্পাঞ্জলী দিতে সকালে বাড়ীতে যে কটি ছোট বৌ থাকত, তাঁরা সবাই মিলে নামতেন। একটি পুরাণো বি' সঙ্গে করে নিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলত যে, বৌঠাকুরগণরা এসেছেন—

তাঁদের অঞ্জলী দেওয়াতে হবে। পরে অঞ্জলী দিয়ে এসে পরস্পর সিঁদূর পরানো হ'ত। দিদিমার কাছে সিঁদূর এনে দাঁড়াতেন কিন্তু যতক্ষণ তিনি দিতে না বলবেন, ততক্ষণ দেবার নিয়ম নেই। তারপর যখন তিনি বলতেন দাও, তখন দেওয়া হ'ত। পরে দিদিমা আবার সবাইকে পরাতেন। তারপর যার সিঁদূর তার হাতের সোঁনা ঝাঁখানো লোহায় মুছে দিতেন। তখন মা'রা সবাই এক এক করে দিদিমাকে প্রণাম করতেন। তারপর তাঁরা যে যার ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্তন করে নতুন দেশী কাপড় পরতেন। তখন ঘরামীরা মা'দের জন্য মস্ত বড় বারকোষে জলপান দিয়ে যেত ; মা'রা সব কলাপাতায় আজড়ে, বারকোষ ঘরামীদের ফিরিয়ে দিতেন। পরে তার সঙ্গে কচুরী, নিমকি ও সিঙাড়া নিয়ে খুব জলযোগ হয়ে যেত। আমরাও সেই সঙ্গে চলত। পরে খিচুড়ি ভোগ হ'য়ে গেলে আমরা এক দফা খেতুম। আমরা কিন্তু পাশের বাড়ী থেকে পূজার তিন দিন মাগুর মাছের ঝোল, লেবু ও গলা ভাত খাবই। আমার মেজমা আমাদের এটি না খাইয়ে আর পূজাবাড়ীতে যেতে পারতেন না। পরে ভোগ হ'য়ে গেল, আবার মা'দের সব প্রসাদ পাওয়া হ'ল ; আমরাও একটু আধটু পেলুম।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে ।

(সিংহল হতে নেপাল)

২।

আমতলায় বিশ্ববিদ্যালয় ।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্বানুবৃত্তি]

১১ই নবেম্বর ।—আমাদের জীবনযাত্রা ধীরে স্বস্তে গড়ে' উঠছে : বাঙ্গলা পড়াটাই সব চেয়ে নিয়মিত হচ্ছে, আমরা একটি পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি, এবং আমাদের ক্ষুদ্র জগতে গুছিয়ে বসে' নিয়েছি । সূর্যাস্তের পর (দিনেব বেলা দারুণ গ্রীষ্ম এবং বর্ষার জলে গহ্বরাক্তিত এ সব জায়গায় ছায়া দুর্লভ) আমরা ব—র সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে যাই ।

* * * * * পাশের গ্রাম গোয়ালপাড়ায় গেলুম : মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাড়ীগুলি বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা, ঝাংটা 'ছেলের কিলিবিলি, ঢোলের আওয়াজ, হাউই বাজি । আমরা দুর্গা প্রতিমার পূজা ও বিসর্জনের ঠিক সময়ে এসে পড়েছি । দুই মোটা বাঁশের উপর ভয়ঙ্করী দেবীমাতার মূর্তি চড়ানো হয়েছে ; ডাইনে মহাদেব, তাঁর স্বামী ; বাঁয়ে নারদ, দেবতাদের দূত, কিন্তু Iris*-এর চেয়ে ঢের খারাপ দেখতে ; এ সমস্তই রঙলেপা, সোনার পাতমোড়া, মামুলী,—হয়ত St. Sulpice গির্জার সাজসজ্জায় নীরসতার তুলনায় কিছু কম কুশ্রী । চারিদিকে যে সব ভক্ত ঠেলাঠেলি করছে, তাদের ব—

* গ্রীকদের দেবদূত । এমন সময় মাদাম লেভি গ্রামে কোন্ পূজা দেখলেন তা' বর্ণনা থেকে বোঝা শক্ত ।

বলে' দিলেন সাহেবটি কে ; তারা আমাদের জন্ম জায়গা ছেড়ে দিলে, আমাদের মিষ্টারি খেতে বলে, দেবীর স্নান দেখবার নিমন্ত্রণ করলে,— কাছেই যে ছোট নদী এরই মধ্যে কতকটা শুকিয়ে এসেছে, সেখানে তাঁকে নাওয়ানো ধোওয়ানো হবে। কিন্তু বাড়ী ফিরতে হবে, রাত হয়েছে, আর আকাশে চাঁদ এমন অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করেছে যে তারার আলো হার মেনেছে। এ আলোয় পড়া যায়।

রবিবার, ১৩ই।—অন্য দিনেরই মত কাজের দিন। এখানে বিশ্রামের দিন হচ্ছে বুধবার, কারণ শুনতে পাই ঠাকুরবাড়ী ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বুধবার দিনের কি একটা যোগ আছে। ব্রাহ্মসমাজ হচ্ছে এক ধর্ম-সম্প্রদায় ; ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে রিফর্মের যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ। সনাতন শাস্ত্রবচনে, বিশেষতঃ উপনিষদে ধর্মের আদি অকলুষ স্বরূপের অনুশীলনই তার লক্ষ্য।

১৪ই নবেম্বর।—পূর্ণিমার উৎসবের দিন এখানকার অপর যুরোপীয়ের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হল। ঘটনাক্রমে তিনি হচ্ছেন একজন পোলজাতীয় বা লিথুয়ানিয়াদেশীয় ইহুদী, রসায়নবিৎ, এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের পাস্ত্যর ইন্স্টিটিউটের ছাত্র ; তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, আমেরিকা যুরোপ ঘুরে অবশেষে ভারত-বর্ষে এসে আটকা পড়েছেন। তিনি ছ'মাস হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন, তারপরে এখানে এসে ছেলেদের রসায়নবিদ্যা শেখাচ্ছেন। এখানে তিনি হিন্দু মতই থাকেন। বেশভূষা নিতান্তই সাদাসিধে ; তাঁর পেটলুনের উপর তাঁর খাকী কামিজ উড়ে বেড়াচ্ছে ; যখন দেশে ফিরবেন—যদি কখনও ফেরেন—তাহলে ওটার মধ্যে ফের এটা গুঁজে দেবেন, তারপর চল ভিল্‌নায়ে।

ঠাকুরমশায় আমাদের সঙ্গে এসে খেলেন, আমরা অনেকক্ষণ ধরে' গল্পগুজব করলুম, তাঁর কথা শুনলুম। তিনি আমাদের, বলেন তাঁর দুই ইংরাজ অধ্যাপকের কথা,—যে ইংরাজদের ভারতবর্ষ জয় করেছে :—ভারতবর্ষ করেছে, না এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুটি? তারপর জাতীয় প্রসঙ্গ উঠে পড়ল; অমৃতসরের সেই ভীষণ অধ্যায়ের কথা তিনি স্মরণ করলেন, যার পরে দেশের সরকারবাহাদুরকে তিনি নিজের উপাধি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন; একজন ইংরাজ-মহিলার উপর রাস্তায় অত্যাচারের ফলে কিরূপ দমন-নীতি চলেছিল। সে বৃত্তান্ত কেবলমাত্র স্মরণ করেই তাঁর গলা কাঁপছিল আর চোখ জ্বলছিল, যদিও ইংরাজরাজ খুব সম্ভব ঘটনাগুলি অস্বীকার করেন।

১৬ই তারিখে আমার নিজস্ব এক ক্ষুদ্র নিমন্ত্রণসভার আয়োজন হল। এখানকার মেয়েরা 'আলাপিনী' নামে এক সমিতি স্থাপন করেছেন; তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন যুদ্ধের সময় আমাদের মেয়েরা কি কাজ করেছে, সে বিষয় তাঁদের কিছু বলতে। আমি মিনিট বারো ধরে' আমার কাঁচা ইংরাজীতে বাধো বাধো কথা বললুম, তাঁরা আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, তারপর নিস্তক্ৰতা ঘনিয়ে এল। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্কোচ অসাধারণ; অথচ এঁদের মধ্যে অনেকে কোনকালে 'পর্দা' 'ন'ন—যে রহস্যময় আড়ালের পিছনে ভারতবর্ষের এত স্ত্রীলোক লোকচক্ষুর অগোচরে জীবনযাপন করেন, এঁরা সে ভাবে কখনো বাস করেন নি। কিন্তু খুব শিক্ষিতাদের কাছ থেকেও নত চক্ষু, দু' একটি ছ' হাঁ এবং মুচুকি হাসি ছাড়া কিছু আদায় করতে পারা যায় না।

আমার একটি ছাত্র বেড়েছে, এবং ম—র ক্লাসে ক্রমশঃ লোক

ভক্তি হচ্ছে। এই ম—ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পড়ার আড্ডা বসাই; এমনি করে' সমস্ত মোলিয়ার আমাদের পড়তে হবে। * * * সমালোচনার বই তার ষথেষ্ট পড়া আছে * * * * কিন্তু আসল বই কখনো পড়েনি। বেচারার বইয়ের অভাব এবং জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। তার উপর সে নিতান্ত লাজুক, এবং কতকগুলি কথা মনে করতেও তার কানের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। আমরা Sganarelle পড়ব কেমন করে ?

১৭ই নবেম্বর।—বৈলাতিক যুবরাজ বোম্বায়ে নেবেছেন, এবং আমাদের জোসেফ মহাত্মা বাজার থেকে ফিরে এসে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। হরতাল এমন সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, আমরা ফলও পাব না, তরকারিও পাব না, এবং কালকের আগে আমাদের কয়লা দেবে না! গান্ধির আদেশ পালন হয়েছে; ভারতবর্ষে সব দোকান, সব আফিস ও সব ইন্সকুল বন্ধ হয়েছে। পরে কি কিছু গোলমাল বাধবে? বত্রিশ কোটি লোককে কি অহিংস অসহযোগ ব্রতে বেঁধে রাখা সম্ভব?—তবে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শাস্তুশিক্ষিত এই জাতির অভ্যাস ও মনোভাবের পক্ষে এই বাবস্থা অনুকূল বটে।

সওয়া তিনটের সময় সি—তার প্রথম বক্তৃতা দিলেন, সেই জায়গায়, সেই আমগাছের ছায়ায়, যেখানে আমাদের প্রথম আগমনে সমস্ত শান্তিনিকেতন আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল। গাল্চের উপর বেয়াল্লিশ জন শ্রোতা আসন হয়ে বসলে, তার মধ্যে ছিলেন সিংহলের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, তাঁর সুন্দর হলুদে রংয়ের কাপড় এমন ভাবে পরা যাতে ডানদিকের কাঁধ খোলা থাকে, (দেখো যেন দিক

ভ্রম না হয় ! এই ডাইনে বাঁয়ে নিয়ে ব্রহ্মদেশে মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে ; এর উপর শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নির্ভর করছে) । চার জন মেয়ে সেই ভানেই পিছনে বসেছেন, একটু তফাতে, যেমন প্রধানকার দস্তুর । নীচু বেদীতে বসে ঠাকুরমশায় নোট লিখছেন ; যে পাঠ শেখাবার জন্যে এই ভদ্রলোকটি সোজা প্যারিস্ থেকে এসেছেন, তিনি পরক্ষণেই সেটির সারমর্ম্য বাঙ্গলায় বলবেন । ভদ্রলোকের ইংরাজি ভাষা খুব সড়গড়ও নয়, খুব চোস্তও নয়, কিন্তু সকলেই মন দিয়ে শুনছে । সে ছবি মন থেকে কখনো মুছে যাবার নয় । “বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ” বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার এই সূত্রপাত হল । প্রতি রবিবারে কলকাতাগত শ্রোতার জন্যে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তৃতাবলী ।

১৮ই ।—বক্তৃতার পর আমরা পাশের একটি সাওঁতাল গ্রামে গিয়েছিলুম । এই সাওঁতালদের সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, এরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীর বংশধর । তারা নিজস্ব বিশেষ অভ্যাস, ভাষা, আচার, ধর্ম্ম সবই বজায় রেখেছে । তারা বেশ কাজ করে, কিন্তু একটা হিসেব রাখতে পারে না ; রোজকার কাজের পাওনা তাদের সেইদিনই চুকিয়ে দিতে হয়, নইলে পরদিন আর আসবে না ; তারা খুব আমুদে, খুব কারিগর ; আমরা দেখলুম তারা দলে দলে তাদের ঝক্ঝকে পরিষ্কার গ্রামগুলিতে ফিরছে ; তাদের মধ্যে একজন বাজনদার বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে,—মনে হয় যেন আদি যুগে ফিরে গেছি ।

এখানে বেশি দীর্ঘ ভ্রমণ সম্ভবে না ; সূর্য্য ওঠবামাত্র তারই জয় । চারটে বেলায় আগে আমরা কখনোই বেরই নে; রাস্তাগুলি ঘোর

লাল রঙের, গরুর গাড়ির চাকায় গভীর খাঁজকাটা, সংখ্যায় বড় বেশি নয়,—কিন্তু আমরা পায়ের দাগ ধরে' চলে' যাই, সেগুলি কখনো মিলিয়ে যায়, কখনো শুকনো নদীর খাতে পৌঁছে দেয়, যেগুলি বর্ষাকালে সত্যিকার নদীর জলে ভরপুর হয়ে উঠবে; বড় বড় ঘাস ও ছুঁচলো কাঁটার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, এত ছুঁচলো যে কাপড়ের মধ্যে, মোজার মধ্যে বিঁধে যায়, ও পদে পদে থেমে পায়ের কাঁটা কাছতে হয়। বাড়ী করে এসে দেখি আমার ছাত্র ও সি—রয়েছেন, সেই সঙ্গে সুন্দর গেরুয়া বস্ত্রধারী সিংহলের সেই ভিক্ষু, এবং একটি বাচ্ছা ভিক্ষু, যার এখনো দীক্ষা হয় নি।

কবি আমাদের সঙ্গে খেলেন, এবং খবর দিলেন যে শীঘ্রই একজন গালিসিয়াদেশীয় ইহুদী যুবতী আসছে, তাকে তিনি যুরোপে দেখেছিলেন। সে খুব বুদ্ধিমতী ও বিদূষী, এবং কারু-শিল্পের ইতিহাস শেখাবার জন্য শাস্ত্রনিকেতনে আসতে চেয়েছে। সে একাধারে দার্শনিক, লেখিকা ও নৃত্যকুশলা।

(ক্রমশঃ)

নবম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

[শিবপুর সাহিত্য-সংসদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩]

আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুস্কিলেও ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই—ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়,—আমার মাস্টারী ব্যবসায়ের পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টি আমার নিজের কাছে প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে অন্যের কাছে এটা তত আনন্দজনক হবে না—এ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার কিছু ব'লতে হবে অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে উপস্থিত হবো ঠিক ক'রতে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের এই বাঙালীজা'তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ আপনাদের সমুখে নিবেদন ক'র্বো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের আস্থা আর অনুরাগ আছে,—আর নিজের জা'তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী-রকমে সাত্মাভিমান; অতএব খালি বিষয়ের গৌরবের জন্যেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ক'রতে সাহস ক'রছি।

পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, তার সংখ্যা হবে আট শ' থেকে ন' শ'র মধ্যে। এর ভিতর নাকি দু' শ' কুড়িটা বর্ষা-সমেত ভারতবর্ষে বলা হয়; বর্ষাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা নাকি দাঁড়ায় এক শ' ছেচল্লিশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার সময় মোটামুটি ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির একটি হিসাব নেওয়া হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী করে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিয়ে' কোনও কথা ব'লতে গেলে বর্ষাকে বাদ দেওয়া উচিত; কারণ যদিও বর্ষা এখন ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি-নীতি সব বিষয়েই বর্ষা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং সিংহলকে ভারতের অংশ ব'লে ধরা উচিত, যদিও সিংহল তিন সরকার দ্বারা শাসিত। এখন ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হ'য়েছে—একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক-বশত—ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী দাঁড়িয়েছে। যত সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে আলাদা ধ'রে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের (প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহির্ভূত) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে' পড়ায়, সংখ্যাটা এত ফেঁপে বেড়ে উঠেছে। ভারতের ভাষাগুলি চারটা মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে :— [১] আর্য গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] কোল গোষ্ঠী, [৪] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আসাম আর বর্ষার সীমান্ত, তিব্বত আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে' শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এরা অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিব্বতী (আর. বর্ষায় বর্ষা) ছাড়া

অন্যগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর অতি অল্প সংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এই সব ভাষা বলে। কোল গোষ্ঠীর ভাষা হচ্ছে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরু, শবর, প্রভৃতি : কোল ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও নয়,—সব-শুদ্ধ ত্রিশ লাখ-এর বেশী হবে না। কোল ভাষা হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোঙ্গোল জাতির লোক ভারতে আ'স্বার আগেও কোল ভাষার (অর্থাৎ কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী আর্য্য-ভাষীদের প্রভাবে প'ড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই কোল-ভাষী লোকেরা আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আসছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তার জায়গায় বাঙলা, হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্যভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা ১৫০ বছর লাগবে—অবশ্য কোল-ভাষীরা আর্য্য-ভাষা এখন যে অনুপাতে গ্রহণ ক'রছে সেটা যদি বজায় থাকে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে চলে, আর তা'-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অনুন্নত জা'ত আর বেলুচীস্থানে ব্রাহ্মী-জা'তও দ্রাবিড় ভাষা বলে : দক্ষিণ-ভারতে তামিল, মালয়ালী, কানাড়ী ও তেলুগু—এই চারটে হচ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন দ্রাবিড় ভাষা। বিশেষতো প্রাচীন তামিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়-ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে ছ' কোটির

কাছাকাছি—আর সুসভ্য দ্রাবিড়গণের আর্য্যধর্ম্ম আর সভ্যতা বাহ্যতো মেনে-নেওয়ার ফলে দ্রাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে (ব্রাহ্মই আর মধ্য-ভারতের অর্দ্ধসভ্য দ্রাবিড় জা'তের ভাষাগুলি ছাড়া)।

তারপরে বাকী থাকে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-সীমান্ত পর্য্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটি বড়ো শাখা। পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখলে, এই ক'টা শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেলতে পারা যায় :—

[১] পূবে' বা পূর্ব্বী শাখা : এর ভিতর বিহারের মৈথিল, মগহী আর ভোজপুরে' যথাক্রমে এক কোটি, ষাট লাখ আর এক কোটি আশী লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে', যথাক্রমে চার কোটি নব্বুই লাখ, পনেরো লাখ আর নব্বুই লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত।

[২] মধ্য-পূর্ব্বী শাখা. বা পূর্ব্বী-হিন্দী : এর তিন প্রকার রূপভেদ আছে,—অযোধ্যা প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষা ছত্রিশগড়ী; সব-শুদ্ধ দু' কোটি সাতাশ লাখ লোকে এই পূর্ব্বী-হিন্দী ব্যবহার করে।

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী : চার কোটি দশ লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাষা, কনোজ-অঞ্চলের কনোজী, বৃন্দেলখণ্ডের বৃন্দেলী, অম্বালা-অঞ্চলের আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঞ্জাব অঞ্চলের মৌখিক

৯ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার ক

ভাষা, আর দিল্লী, মীরাট অঞ্চলের হিন্দুস্থানী। এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দুটি,—এক উর্দু, আর দুই, হিন্দী; এই হিন্দুস্থানী বা উর্দু বা হিন্দী ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে' প'ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

[৪] দক্ষিণ-পশ্চিমা শাখা বা রাজস্থানী-গুজরাটী : এর মধ্যে পড়ে মাড়োয়ারী, মালবী, জয়পুরী, হারোতী প্রভৃতি রাজপুতানার নানা ভাষা, যা এক কোটি চল্লিশ লাখ আন্দাজ লোকে বলে; আর পড়ে গুজরাটী ভাষা, যা আনুমানিক এক কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে।

[৫] উত্তর-পশ্চিমা শাখা : এর মধ্যে আসে পূর্বী-পাঞ্জাবী (এক কোটি আটান্ন লাখ), লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী (আটচল্লিশ লাখ), আর সিন্ধী (ছত্রিশ লাখ)।

[৬] দক্ষিণী বা মারহাটী শাখা : এক কোটি নব্বুট লাখ লোক এই ভাষা বলে।

[৭] উত্তরে' বা হিমালয় শাখা : কাশ্মীর আর পাঞ্জাবের পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ভূটান পর্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে নাম ক'রতে পারা যায় এই তিনটির—(১) গুর্খালী বা নেপালী বা পর্বতীয়া বা খাস্কুরা,— গুর্খাদের ভাষা; (২) কুমাউনী, (৩) গাড়োয়ালী। সবশুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ।

[৮] সিংহল দ্বীপের আধা-ভাষা সিংহলী—ত্রিশ লাখ।

এ ছাড়া অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপে ছড়িয়ে' পড়ে। সেই সব দেশে তারা যাবাবর-বৃত্তি বা ভব-ঘুরে' বেদের জীবন অবলম্বন

করে। ইংরিজীতে এদের Gipsy (জিপ্সি) বলে; ইওরোপে বহু স্থলে এই জিপ্সিরা এখনও আমাদের ভারতীয় আৰ্য্য-ভাষাই বলে।

কাশ্মীরে কাশ্মীরী আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,— যেমন, শীনা, চিত্রালী প্রভৃতি; এগুলিও আৰ্য্য ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আৰ্য্য ভাষাগুলি থেকে একটু তফাৎ; আধুনিক ভারতীয় আৰ্য্য ভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টা পরস্পর কৃষ্ণ-সম্পর্কে প্রাথিত।

(২)

ইংরিজী ১৯২১ সালের লোক গণনার হিসেবে বাঙলা ভাষা চার কোটি নব্বুই লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতুন ঠেকবে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হচ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে ভারতের আর কোনও ভাষা এত বিস্তৃত নয়। আমাদের বেশে অবশ্য হিন্দুস্থানী বা হিন্দীভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দীভাষার স্থান আর গৌরব বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক অধিকসংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা হিসেবে। সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে বাদ দিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক,—পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতে, মধ্য-প্রদেশের অনেকখানিতে, আর বিহারে—হিন্দুস্থানী ভাষাকে (তার হিন্দী রূপেই হোক আর উর্দু

রূপেই হোক) তাদের সাহিত্যের ভাষা ব'লে, বাইরেরকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় ১৩ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে ঘরে বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষা; আর এই ১ কোটি ৬০ লাখ ছাড়া আরও আড়াই কোটি আন্দাজ লোকে ব্রজভাষা, কনোজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যে-গুলিকে হিন্দুস্থানীরই রূপভেদ ব'লতে পারা যায়। এদেরও মাতৃভাষাকে হিন্দুস্থানী ব'লে ধ'রলে খুব বেশী ভুল হয় না। কাজেই যে ১৩ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১০ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জাতি হিন্দুস্থানী ক'ইয়ে,— হিন্দুস্থানী এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্সী মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা ভাষা নয়। বাকি ৮ কোটি ৯০ লাখ ঘরে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, মালবী, গাড়োয়ালী, আউধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরে', মৈথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; কিন্তু বাইরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, ইস্কুলে তারা মাতৃভাষাকে বর্জন ক'রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। এই জগেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর প্রভাপ ভারতে এত বেশী, এই জগেই হিন্দুস্থানী ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই জগেই ভারতের লোক-সমাজে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা বেশী জায়গা জুড়ে' রয়েছে।

কিন্তু তাই ব'লে বাঙলার স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের এক-

যষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধরে বিচার করলে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হচ্ছে সপ্তম;—বাঙলার আগে নাম করতে হয় [১] উত্তর চীনা (২০ কোটির উপর), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৫ কোটি), [৩] রুশ (প্রায় ৮ কোটি), [৪] জার্মান (৭।১০ কোটি), [৫] স্পেনীয় ভাষা (৭।১০ কোটি), [৬] জাপানী (৫ কোটি ২০ লাখের উপর), আর [৭] বাঙলা (৪ কোটি ৯০ লক্ষ)। Culture language বা মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসেবে, বিদেশী ইংরিজীর পথেই, এদেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলারই আদর বাঙলার বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখতে পাওয়া যায়,—বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারহাট্টী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালীভাষী বহু ইংরিজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙলা পড়ছেন দেখা যায়, আর বাঙলা থেকে নিজেদের ভাষায় বই অনুবাদ করছেন। হিন্দী বা উর্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচার হ'য়েছিল উত্তর ভারতের মোগল যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসকসম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যারা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষ-ময় ছ'ড়িয়ে-পড়ার ফলে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত লোকের নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহুল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে-যাবার সুযোগ ঘটে নি। দু'চার জন শিক্ষিত বাঙালী যারা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার দিক থেকে ধ'রলে তাঁরা ত'লিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু বাঙলাদেশে থেকেই, তার সাহিত্যের জোরে বাঙলা ভাষার প্রভাব ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে আর

ভারতের অগাণ্ড ভাষার উপর বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে দেখতে পাওয়া যায় ।

শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তার ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ একটা মমতা-বোধ হ'য়েছে । তার সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী তার জাতীয় culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্ সম্বন্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে না । মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বাঙলার ষাঁরা যথার্থ লোকনেতা হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই তার সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে সাহায্য ক'রেছেন । বাঙলা তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলাদেশ আর বাঙালীজা'ত সম্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন—

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা,
বাঙালীর প্রাণে যত ভালোবাসা,—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্ !

আর এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত বাঙলা-ভাষীরই আকাঙ্ক্ষা ।

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যারা বলে সেই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি আর অভ্যুত্থানের দিগ্‌দর্শন ক'র'বো । যা নিয়ে' আমরা গর্বব করি, সেই জিনিষটী আমরা যেন সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনাব ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্বব যেন জ্ঞানের অবলম্বনে সুদৃঢ় হয় । আত্মবোধ বা যে কোনও বোধ জ্ঞান-প্রসূত না হ'লে অন্ধ-বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস আত্মঘাতী হয় ।

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলাদেশ জুড়ে' বিচ্যমান র'য়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্তা কইছি, লিখছি, এর জীবন্ত মূর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার মূর্তি কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ং নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায় ; কাজেই যত মানুষ, তত বিচিত্ররূপে একই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষাই একটা বহুরূপী বস্তু—সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদলায়, আবার কাল-ভেদেও তেমনি বদলায়। আবার অবস্থাগতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীরের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চলতি ভাষা,—যেটা হ'চ্ছে শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্র-সমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন ক'রছি, যে ভাষা এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা-সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; আর (যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'লছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চ'লতে থাকলে) যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে, এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হ'ঠিয়ে দিয়ে'। বাঙলার এই দুই সর্বজন-পরিচিত মূর্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই-সব

মূর্ত্তিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা ত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে, অথচ এরা স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই সকল শাখাই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারু চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার ক'রলে বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূল্য। তবে একটা বিশেষ শাখা অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত-সমাজের আদরের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়; কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়স্থান হ'য়ে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়,—তখন স্বভাবতো অন্য শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টি-পাত করে না। যে ভাষা একদিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়স্থল, আর অন্যদিকে জীবনের রসের দিক থেকে সব চেয়ে সুমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, তার জড় কোথায়, কতদিনে কি ভাবে এই তরু এত বড়ো হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতূহল হওয়া উচিত—অন্ততো শিক্ষার স্পর্শে আমাদের এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত।

ভাষার static অর্থাৎ কোনও এক নির্দিষ্ট কালে তার স্থর বা নিশ্চল অবস্থা মনে ক'রে তার আমি গাছের সঙ্গে এই উপমা দিলুম। আবার তার dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো তার উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই নদীর উপমাটা বড় চমৎকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে কোনও জা'তকে

অবলম্বন ক'রে একটা ভাষার গতি এক দিকে, আর দেশ থেকে দেশান্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে—এ দুইয়ের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, এক বংশ-পীঠিকা থেকে আর এক বংশ-পীঠিকায় পারম্পর্যক্রমে বহমান হ'য়ে আমাদের ভাষা-স্রোত চ'লে আ'সছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—৫ কোড় নরনারীর জিহ্বা আর মস্তিষ্ক জুড়ে' এর বিস্তার; এর নিজস্ব, আর তা ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট শব্দসম্ভারে এর কূল ছাপিয়ে' উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দ্বারা ফলবান্ হ'চ্ছে; দূর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ঐশ্বর্য এর স্রোত বেয়ে' এ দেশে আ'সছে। কত শতাব্দী ধ'রে, কেমন সরলভাবে বা একে-বেঁকে এই নদীর গতি চ'লে এসেছে, কোন্ কোন্ উপনদী এতে এসে প'ড়ে তার কর-সম্ভার দিয়ে' একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন্ কোন্ নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন্ মরা গাঙের খাত দিয়ে' বা এর জল বান উজিয়েছে, কোন্‌খানে বা এর জল শুখিয়ে' চড়া প'ড়ে গিয়েছে—অর্থাৎ কিনা কি-রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ থেকে কোন্ ভাষা কি পদ্ধতিতে বদলে' বদলে' কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে ব'সেছে, কোন্-কোন্ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি ক'রেছে; কোন্ সময় আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার প্রাচীনরূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ সৃষ্টি ক'রেছে—তা ধ্বনিতেই হোক, বা প্রত্যয়েতেই হোক, বা বাক্য-রীতিতেই হোক; বা কোথায়, কি ক'রে কবে, কোন্ অনার্য বা অন্ত ভাষাকে তাড়িয়ে দিয়ে' বাঙলা তার স্থান অধিকার ক'রেছে আর সেই লুপ্ত ভাষা

ম'রে গিয়েও তার ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা ভাষায় দিয়ে' গিয়েছে; —কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে জা'তের মধ্যে অন্ত-নিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফূর্তি পেয়েছে; কি-রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে' ফেলেছে, কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে নি;—এই সবের ফলে কি ক'রে বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে;—এর আলোচনা একটু পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ আর অনেকটা এই বিচার শাস্ত্র অনুসারী বিচার-সাপেক্ষ হ'লেও, আমার মনে হয় মানসিক-উৎকর্ষ-কামী ইতিহাসপ্রিয় শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে এটা একটা সার্থক আলোচনা;—কেবল-মাত্র ঐতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে পর্যবেক্ষণশক্তি আর বিচারশক্তিকে জাগিয়ে তোলবার যোগ্যতা ধরে ব'লে, এই আলোচনার বিশেষ একটু মূল্য আছে।

(৩)

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আৰ্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখলে দু'দিকে দু'টা অবধি পাই—একদিকে হচ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, এই ১৩৩৩ সাল, আর এখনকার চলতি বাঙলা ভাষা, যে জীবন্ত ভাষা আমরা কথাবার্তায় ব্যবহার করি; অপর দিকে হচ্ছে ঋগ্বেদের কাল, আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগ্বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাঙলা কি মূর্তি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা করার কোন সার্থকতা নেই। ঋগ্বেদের পূর্বের আৰ্য্যভাষার কি রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি নি; কিন্তু

তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব নামে যে আধুনিক বিদ্যা আছে, তার অনুমোদিত অনুশীলন-রীতি ধরে এ বিষয়ে আলোচনা করে তার অনেকখানি আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু ঋগ্বেদের পূর্বেবর কোন বই বা লেখা আমরা পাই নে, এখানে তাই বস্তুর অভাব। সেইজন্য কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না; আমাদের অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাকলেও, সেটা প্রমাণিত হয় না। ঋগ্বেদের পূর্বেবর যুগের আর্যভাষার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর তাকে তার দুহিতৃস্থানীয় বৈদিক, প্রাচীন ইরানীয়, গ্রীক, লাতিন, কেল্টিক, জার্মানিক, স্লাভ প্রভৃতির পরস্পরে তুলনা দ্বারা নোতুন করে গড়ে তোলবার প্রয়াস বেশ একটা কৌতুকপ্রদ বিদ্যা। কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তার যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত; এ যেন কোনও মানুষের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহ থেকে আরম্ভ করে ক' পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করা। আমাদের এখন অত দূরের কথা ভাববার দরকার নেই। ঋগ্বেদের ভাষা ভারতের আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ঋগ্বেদের ভাষায় এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়; আর যেখানে আধুনিক আর্যভাষাগুলির জন্ম গিয়ে পৌঁছেছে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝতে বাকি থাকে না। সকলেই জানেন যে, ঋগ্বেদ দেবতাদের আরাধনাবিষয়ক কবিতা বা স্তোত্রের একটি সংগ্রহ—এতে ১০২৮টা স্তোত্র আছে। এই সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা কবিরা রচনা করেছেন। এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ করে একখানি বইএ সঙ্কলন করা হয়। এই সঙ্কলনটি কবে যে করা হয়েছিল, তা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না; তবে কেউ কেউ মনে করেন সেটি আনুমানিক

১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বের দিকে হ'য়েছিল, আরও বা মতে আরও ২৩ শ' বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ বা ২০০০, বা ২৫০০ বা ৩০০০, বা ৪০০০ বছর পূর্ব, এমন কি তারও আগে, এই সঙ্কলন হ'য়েছিল। আমি প্রথম মতটাকেই, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বকেই সমীচীন ব'লে মনে করি—তার পরে হ'তেও পারে তা স্বীকার করি, কিন্তু তার পূর্ব আর যেতে চাইনে। কিন্তু অন্য সব মতের কথা এখন আলোচনা ক'র্বো না। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব সঙ্কলিত হ'লে, ঋগ্বেদের সূক্ত বা স্তোত্রগুলির রচনাকাল তার ৩৪ ৫৬ শ' কি আরও বেশী বছর আগে ব'লে অক্লেশে ধরা যেতে পারে। ঋগ্বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্টী পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে আদি আর্য্যভাষার নদী ব'য়ে এসেছে। ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব থেকে আজকালকার দিন পর্যন্ত—ধরা যাক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই প্রায় ৩৫০০ বছর ধ'রে আর্য্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটি একরকম বেশ পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে—বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখ, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে—ইতিহাসে, পুরাণে—কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত চ'লে এসেছে,—পর পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি হ'চ্ছে এই শিকলটির এক একটা কড়া বা আংটা। কিন্তু কালের

মহিমায় তার ভাগ্যবিপর্যয়ে এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটি বা আংটাটি এখন আর যথাযথ একটীর পর একটী ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ পর-পর প্রত্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আ'সেনি। যেখানে যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাঁক র'য়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে' ভাষার গতি হ'য়েছিল, সেটা অনুমান ক'রে নিতে হয়। ভাষা-স্রোতস্বিনী ব'য়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে তার ধারার রেখাটি অস্পষ্ট, আর এই অভাব তাকে বহু স্থানে আমাদের চোখের আড়ালে অন্তঃনলিলা ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে' বইয়ে' এনেছে।

এখন আমরা মন দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে' রেখে যাচ্ছি, আমাদের বিরাট আর প্রবর্তমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে থাকছে; আর তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদ গ্রামোফোনের রেকর্ডে গানে আবৃত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের ভাষার ছায়া ধরা থাকছে—ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ভাষাচর্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা ক'রবে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য হবে। সুতরাং আমাদের এই কালের ভাষার আলোচনার জন্য আজ থেকে দু'তিন শ' বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক পরিশ্রম ক'রবেন, তাঁদের জন্য অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভাল ক'রেই প্রস্তুত হ'য়ে থাকছে। সন ১৫৩৩ বা ১৭৩৩ সালে ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই গলায় রেকর্ডে শুন্তে পাবেন—ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে' ইত্বরাপের কোথাও

কোথাও ভাষাতত্ত্ব সংগ্রহাগারে এইরকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'চ্ছে। আমরা যদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম, যদি বুদ্ধদেবের সময়ে গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাকত, আর যদি তাঁর দু' একটা উপদেশ তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কণ্ঠে শুন্তে পেতুম! বৈদিক ঋষিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি শোনার উপায় থাকত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী চণ্ডে অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহস্যের ভাবে ব'ল্ছি না—আমি খালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্যই ব'ল্ছিলুম যে, অল্পস্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যুগের ভাষা আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটি কত-টুকুই বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আৰ্যভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে' এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা দুপ্রাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গেলে বস্তুর অভাবজনিত এই অসুবিধাটুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়।

বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। এক শ' বছর আগে এই ভাষার কি অবস্থা ছিল তা আমরা তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝতে পারি। তখন দু' এক খানা ব্যাকরণও লেখা হ'য়েছে, তা থেকে আমরা কিছু কিছু খবর পাই, আর বুঝতে পারি যে সাধু-ভাষা, চল্ভি-ভাষা, প্রাদেশিক-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলাভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যেই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তখন লেখা হয় নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল

পেরিয়ে তবে ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। আঠারো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোলো থেকে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তর বাঙলা পুঁথি পাওয়া যায়, তার থেকে ওই দু' শ' বছরের বাঙলা ভাষার সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পারা যায়। আর ওই দু' শ' বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ কিনা ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে কতকটা অনুমান এই সব পুঁথি থেকেই ক'রতে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে রচা অনেক বই ষোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে; এই সব নকলে একটু আধটু (কোথাও বা অনেকখানি) মূল থেকে ব'দলে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২১৩ শ' বছর পরে নকল-করা তার যে পুঁথি পাওয়া যায়, সে পুঁথি থেকে মূল রচনার কালের ভাষার ষথার্থ অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'রত তারা তো আর ভাষাতাত্ত্বিক ছিল না, যে অবিকল নকল করবার চেষ্টা ক'রবে; আর সে ইচ্ছে থাকলেও তারা মানুষ ছিল, কল ছিল না—তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকত না, ব'দলে যেত; ফলে অবশ্য ভাষা নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে যেত। কাজেই যে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক। জলের দেশ বাঙলা, কাগজ সহজেই প'চে যায়, তালপাতার কালির দাগ ধুয়ে' মুছে-যায়; তা'ছাড়া উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর পোড়া আছে, বন্যা আছে, আর আছে অশ্র বা অক্ষম লোকের যত্নের অভাব। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা দুর্ঘট। ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া

যায়। যে দু'চার খানি পাওয়া যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী। পনেরো শ' খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ল্লেই হয়। সুতরাং পনেরো শ' সালের আগের বাঙলার স্বরূপ জানবার জন্মে পরবর্ত্তী কালের, অর্থাৎ ১৬।১৭ বা ১৮ শ' সালের দিকে নকল করা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর দু' এক শ' বছর পূর্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পরে হ'চ্ছেন কৃষ্ণিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০-এর আগেকার লোক। কিন্তু এঁদের সময়ের পুঁথি নেই—পরবর্ত্তী বিকৃত পুঁথিই এঁদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক'রতে গেলে এই কথাটাই সব প্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্বেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন ক'রেই ইতিহাস গড়ে' ওঠে। এখানে এই বস্তুর দৈন্যটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনার প্রশয় দেয়, অবস্থাটা সত্য-সত্য কি ছিল তা জানতে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্য বা ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ১৩ শ' বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ' সালের আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার অবিসম্বাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয়-গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা খুব আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়।

(৪)

তারপর, বাঙলা-সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে

হ'য়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্বে, সবই অক্ষতমিস্রাচ্ছন্ন। তার পূর্বে অবশ্য বাঙালী গান বাঁধত, কাব্য লিখত, কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে' গিয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে দু' একটা নাম পাওয়া যায় মাত্র—যেমন ময়ূরভট্ট, কানা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এঁরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এঁদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এঁরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমন্তের কথা;—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মত এগুলি সুপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে পৈতৃক রিক্ত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ নয়। দেখছি যে চণ্ডীদাসের পরে এই সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ'য়েছে। এই কাব্যগুলির আদিরূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্বে বিদ্যমান ছিল;—কিন্তু এটা একটা প্রমাণসাপেক্ষ অনুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে, চণ্ডীদাসের পূর্বে-কার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশ্যস্তাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক বাঙলা গান আর ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে' গিয়ে' একটা কাল্পনিক বৌদ্ধ-যুগ খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ'ড়তে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু এই কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন তারিখ, এমন কি 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি ক'টিও নিতাস্তই কাল্পনিক।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা—অর্থাৎ ১৬শ'

বা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের পুঁথির অভাব,—বাধ্য হ'য়ে বহুদিন ধ'রে আমাদের এই অবস্থাতেই আটকে থাকতে হ'য়েছিল ; অথবা কল্পনা দিয়ে তার আগেকার ফাঁক পুরিয়ে' নেবার 'ঐতিহাসিক' আর 'সাহিত্যিক' অনুসন্ধান চ'লছিল । কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর দশেক হ'ল দু' খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যার দ্বারা আমরা ১৫শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেরকার বাঙলার খুব মূল্যবান নিদর্শন পেয়েছি । এই বই দু'খানি হ'চ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চর্যাপদ । প্রথম খানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন ; বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে, গোয়ালঘরের মাচার উপরে এক ধামার ভিতরে আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটা ছিল । বসন্তবাবুকে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ঘুণ বলা হ'য়েছে, এটা তাঁর যথাযথ বর্ণনা ; এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানিনে । তিনি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার কর্তা ছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশ করা হ'য়েছে । পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লেখ-বিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছেন যে, এখানি ১৩১০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা । বাঙলা ভাষায় এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই । দু' একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন ; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয় । বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের

কিছুতেই হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মাত্র দু' একটীর সঙ্গে এর পদের মিল পাওয়া যায়। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর সাধারণতো অর্ধশিক্ষিত আঁখরিয়া বা নকল-নবীশের হাতে প'ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪।৫ শ' বছরের মধ্যে যে ব'দলে যাবে তা নিঃসংশয়। কেউ কেউ বলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন; আবার কারো মতে দুইএর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন। কিন্তু সে কথায় আমাদের এখন কাজ নেই— কারণ আমরা ভাষা আলোচনা ক'রছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা ১৪ শতকের লেখা মূল পুঁথি পাচ্ছি, এতে ঐ যুগের ভাষা—সাহিত্য বা গানের ভাষা—পাওয়া যাচ্ছে; যারই লেখা হোক না কেন, ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০। ২০০ বছরের আগেকার দলিল মিলল, তার ইতিহাসের বনিয়াদ আরও পাকা হ'ল।

তারপর চর্যাপদের কথা ধরা যাক। ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা 'চর্য্যার্চ্য্যাবিশিষ্ট' নাম দেওয়া একখানা পুঁথি অশ্রু তিনখানা পুঁথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারখানি পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যার্চ্য্যাবিশিষ্ট' বিশেষ স্থান আছে—অশ্রু তিন

খানির ভাষা বাঙলা নয়, সূতরাং সেগুলির বিষয় এখানে এখন কিছু ব'ল্বে না। চর্য্যাচর্য্যাবিশিষ্ট গোট পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে চর্যা বা চর্যাপদ বা পদ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্বে হয় ; আর এই গানগুলির উপর একটা সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে একরকম মানে, তার কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না ; ভিতরে দার্শনিক বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক—যারা ঐ সাধন-পথের গুহ্যতত্ত্ব জানে না—তাদের পাওয়া কঠিন। যে পুঁথিতে চর্য্যাপদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির চেয়ে বেশী নয় ; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হয়েছে যে, এই গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়ে অন্ততঃ দেড় শ' বছর আগেকার ;—দু চারটা বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, যারা এই গান লিখেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব চেয়ে প্রাচীন বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক উঠেছে, এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা সত্যি-সত্যি বাঙলা কি না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন তুলেছেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে পক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না ; তবে চর্য্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত এই দাঁড়িয়েছে যে এর ভাষা বাঙলাই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে

এতে পশ্চিমা-অপভ্রংশের দু'চারটে রূপ এসে গিয়েছে, তাতে এর ভাষার 'বাঙলাত্ব' যায় না। চর্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলাভাষার আর একটি মূল্যবান দলিল বা'র হ'ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার করবার উপযুক্ত বস্তু মিলল—মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল।

(৫)

এর পূর্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই নে। খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্বের বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তখন অবশ্য বাঙলা ভাষা বা তার আদিম রূপ হিসেবে একটা কিছু বিদ্যমান ছিল,—কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা পাচ্ছি নে। আগে হিন্দু আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ক'রতেন। এই-সব দান, দলিল ক'রে দানপত্র ক'রে দেওয়া হ'ত। দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুঁদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্জন বা চিহ্ন থাকত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলা দেশে যা এ পর্যন্ত বেরিয়েছে সেটা হ'চ্ছে উত্তরবঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের সময়ের ; এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩ ; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান যুগ পর্যন্ত, আর তার পরবর্তী কালেরও অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে ; মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্র-শাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে দানের ভূমির পরিমাণ, গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর

বর্ণনা করবার সময় মাঝে মাঝে দু' চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার—অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার— নামও র'য়ে গিয়েছে। সেগুলিকে কোথাও কোথাও একটু মোজ-ঘ'ষে দুই একটি উপসর্গ বা প্রত্যয় তাদের পিছনে জুড়ে দিয়ে' বাহুল্যে একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে; কিন্তু এই সাজের মধ্যেও তাদের প্রাকৃত রূপটিকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বকালের বাঙলাদেশের ভাষা আলোচনা করবার একটা সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। “কণামোটিকা” অর্থাৎ কিনা কানামুড়ী, “রোহিতবাড়ী” অর্থাৎ রুইবাড়ী, “নড়জোলী” অর্থাৎ নাড়াজোল, “চবটীগাম” অর্থাৎ চটীগাঁ, “সাতকোপা” অর্থাৎ সাতকুপী, “হড়ীগাঙ্গ” অর্থাৎ হাড়ীগাং প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্ত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাকৃতশ্রেণীর একটি ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষায় এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা (অবশ্য একটু পরিবর্তিত রূপে) আজকালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে একটি বিষয় চোখে পড়ে : অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোনও আর্যভাষা ধ'রে হয় না,—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। “অঝড়াচৌবোল, দিঙ্গমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডার-বীটিজোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী” প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্যভাষার নয়; আর “পোল বা বোল”, “জোটা, জোড়ী

বা জোলী”, “হিট বা ভিট্টা”, “গড্ড বা গড্ডী”, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এই গুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য্য শব্দ দেখে দেশে অনার্য্যদের বাস অনুমান ক’রলে কেউ ব’লবে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।

কিন্তু এই সব নাম তো ভাষার পুরো পরিচয় দেয় না ; কাজেই বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেকেতে হয় একেবারে মাগধী প্রাকৃতে। সংস্কৃত নাটকে ছোটো-লোকের মুখের কথা এই ভাষায় বলানো হত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী প্রাকৃত বা অন্যান্য প্রাকৃতির তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী প্রাকৃত সম্বন্ধে দুটো কথা ব’লে গিয়েছেন। বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন ; খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় স্থিতিমান ছিলেন মনে হয়। বররুচি যে মাগধী প্রাকৃত আলোচনা ক’রেছেন, সেটা হ’চ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা,—যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে কথাবার্তা ব’লত, সে ভাষা নয় ; বরং তারই কাঠামোর উপর গ’ড়ে তোলা, ব্যাকরণবিদ্যার নিয়ম দিয়ে অষ্ট-পৃষ্ঠে বাঁধা একটা ভাষা। যাই হোক, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী অন্ততো কতকটা কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী ভাষা, বররুচির আগে আর বররুচির পরেও, পূর্ব-ভারতে মগধে কাশী বিহার অঞ্চলে বলা হ’ত। আর খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা

দেশে তখন যে আৰ্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধীই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয় নি। এই মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণগত একটা বিশেষত্ব ছিল, যা এর পৌত্রীস্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'রছে—সেটা হ'চ্ছে ভাষার 'শ ষ স' স্থানে কেবল 'শ'। মাগধী প্রাকৃতের পূর্বে এই দেশের আৰ্য্য ভাষা যে অবস্থায় ছিল, তার পরিচয় পাই অশোক অনুশাসনে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। স্থানভেদে অশোকের অনুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহবাজগড়ী আর মানসেহরার পাহাড়ের অনুশাসনের ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গির্ণার অনুশাসনে আর একরকম, আবার পূর্ব ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্যরকমের প্রাকৃতে লেখা। অশোকের পূর্ব-ভারতীয় অনুশাসনাবলীর ভাষা—দু' একটা খুঁটিনাটি বিষয়ে ছাড়া—পরবর্তী-কালের বরকচি কর্তৃক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পূর্বী-প্রাকৃতকে মাগধী প্রাকৃতের একটা পুরাতন রূপ ব'লে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, বাঙলা ভাষার মূল, মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পূর্বী অশোক-অনুশাসনের ভাষায় গেলে পাওয়া যায়। এই অশোকের পূর্বী-প্রাকৃতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে ভবিষ্যৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, অপরিষ্ফুট মাত্র। বাঙলা ভাষা এই পূর্বী-প্রাকৃতের বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের

উপর লেগেছিল। অশোক-যুগের আগে পূর্ব-ভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার আর নিদর্শন মেলে না; তবে তার সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য থেকে আর সংস্কৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে একটু একটু আন্দাজ ক'রতে পারি। অশোক বা মৌর্যবংশের পূর্বের খুব সম্ভব বাঙলা দেশে আর্য ভাষার বিস্তার হয় নি। বুদ্ধদেবের সময়েও বোধহয় মগধ আর চম্পার পূর্বদিকে আর্য ভাষা আসে নি। বুদ্ধদেবের সময় হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ যুগের অবসান কাল। এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫০০-র দিকে, ভারতে কথিত আর্য ভাষা দেশ-ভেদে তিনটা ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছিল—[১] উদীচা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এখনকার যুক্ত প্রদেশের পশ্চিম অংশে) বলা হ'ত; আর [৩] প্রাচ্য—কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। এই প্রাচ্য-আর্যাই কালে অশোক যুগের পূর্বী-প্রাকৃতে মধ্য দিয়ে মাগধী প্রাকৃতে পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তার আগেকার এই প্রাচ্য ভাষা বৈদিক ভাষার একটা অর্বাচীন রূপ মাত্র।

বৈদিক সময় থেকে আর্য ভাষা তাহ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা ঐ পথের সম্বন্ধে পর পর এই নির্দেশ পাচ্ছি :—

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ঋগ্বেদের যুগের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর আগেকার কালের বৈদিক সূক্তে এই ভাষার মার্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্বেদে, আর পরবর্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

[২] তারপর আর্য ভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর ভারতে, গঙ্গা-যমুনার দেশে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে। এই সময় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'রলে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর কথিত রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ বইগুলিতে কিছু কিছু আভাস পাই; তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে পূর্ব অঞ্চলে যে আর্য ভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতেই আদি-যুগের আর্য ভাষার ভাঙন ধ'রেছিল; প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব দেশেই হয়। পূর্ব দেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই নে, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—“বিকট, ক্ষুল, শিখিল, মল্ল, দণ্ড, গিল্” প্রভৃতি।

[৩] এর পর দেখি, প্রাচ্য অঞ্চলের এই ভাষা প্রাকৃত রূপ নিয়ে, দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে :—এক, পশ্চিম খণ্ডের প্রাচ্য; আর দুই, পূর্ব খণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটাকে মাগধী নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্বী প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা প্রাচ্যের তফাৎ খালি এই জায়গাটায় যে, পূর্বীতে সব জায়গায় 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য 'স'-র ব্যবহার ছিল। দু' একটা ছোটো লেখে এই পূর্বী প্রাচ্য বা মাগধী প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক যুগের; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের স্তম্ভকা-লিপি সব চেয়ে মূল্যবান। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে, মৌর্যদের কালে এই পূর্বী-প্রাচ্য বাঙলা দেশে তার জড় গাড়াতে সমর্থ হয়।

[৪] পরবর্তী কালের মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন পাই সংস্কৃত নাটকে আর বরকচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলা দেশে এর যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছিল অনুমান করা যায়।

[৫] তারপর কয় শতাব্দী ধ'রে সব চুপ-চাপ,—বাঙলা দেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চার কোনও চিহ্ন নেই—তাম্র-শাসনের দু' একটা নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধী প্রাকৃত আস্তে আস্তে ব'ন্দলে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহী), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে পরিণত হ'চ্ছিল।

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলাভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে' দিলে—১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চর্যাপদের কালে নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হ'ল।

[৭] তারপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ, তুর্কীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু' শ' বছর ধ'রে বাঙলাভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ হয় অরাজকতা অশান্তি তখন দেশব্যাপী হ'য়েছিল। পরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের উত্থান, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা অনেকটা পরবর্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তার পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির. আর অস্ত নেই। এই শতকের পর থেকে যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়ো-দরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা দাঁড়িয়ে' গেল, তখন থেকে বাঙলাভাষার গতি পর্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে কটা মস্ত কাঁক থেকে যাচ্ছে, সেগুলো কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি ? ভাষার ক্রমিক বিবর্তন দেখাতে হলে সেগুলোকে ট'প্কে বা ডিঙিয়ে' তো যাওয়া যেতে পারে'না, কারণ সেই সমস্ত যুগের মধ্যে দিয়েও ভাষা-স্রোত অব্যাহত গতিতে চ'লে এসেছে।—এখানে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আগেই ব'লেছি যে, মাগধী প্রাকৃতের কাল থেকে চর্যাপদের কাল, মোটামুটি খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে একাদশ শতক—এই সাত শ' বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ' বছরের ইতিহাস তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক'রতে পারা যায় ? এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী প্রাকৃত কোন্ ধারায় পরিবর্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে ?—সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী প্রাকৃতের সমকালীন আর তার স্বস্থানীয় শৌরসেনী, প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শৌরসেনী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে, তাই দেখে'। শৌরসেনী প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত ; বরকুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বরকুচির ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্তী যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে পরিবর্তন ধর্মের নিয়ম অনুসারে অন্য মূর্তি গ্রহণ করে; আর, একটা নাতিবৃহৎ গীতিকাব্যসাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্নবাচীন অবস্থা আমরা দেখতে পাই। পরবর্তী যুগের এই শৌরসেনীকে “শৌরসেনী অপভ্রংশ” বা খালি “অপভ্রংশ” বলা হয়। শৌরসেনী হ'চ্ছে একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আর্যভাষা হিন্দী—এই দুইয়ের সন্ধি-

স্থল। শৌরসেনী অপভ্রংশ থাকায় বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে কিরকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ'ল। এখন যদি মাগধী প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে (শৌরসেনী-অপভ্রংশের মতন) উভয়ের সংযোগস্থল এক “মাগধী অপভ্রংশের” নিদর্শন পেতুম,—“মাগধী অপভ্রংশ” নাম যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে থাকত, তাহলে বাঙলার উৎপত্তি নির্ধারণ করবার উপযোগী কতটা না মাল-মশলা আমাদের হাতে জুটতে পারত! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সাত শ' বছরের মধ্যে বাঙলা দেশের পণ্ডিতেরা দেশ-ভাষার দিকে নজর দেন নি, তাতে কিছু লেখেন নি, সব লিখেছেন দেব-ভাষা সংস্কৃতে ;—আর জনসাধারণ চিত্ত-বিনোদনের জন্য বা দেবতার আরাধনার জন্য ভাষায় যে গীতিকবিতা গান আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখত, সেগুলি সব লোপ পেয়েছে। যুক্তিতর্কের অনুসারে, মাগধী প্রাকৃত আর বাঙলা ভাষা এই দুইয়ের সন্ধিস্থল-স্বরূপ একটা মাঝের অবস্থা আমাদের স্থাপিত ক'রতে হবে; আর তাকে “শৌরসেনী-অপভ্রংশের” নজীরে “মাগধী-অপভ্রংশ” নাম দিতে হয়। আর যুক্তিতর্ক আর ভাষাতত্ত্বের নিয়ম খাটিয়ে' পৌর্ক্বাপর্য্য বিচার ক'রে এই মাঝের অবস্থার, আমাদের কল্পিত এই মাগধী অপভ্রংশের, রূপ কিরকম ছিল তাও স্থির ক'রতে হবে। অবশ্য যঁারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি তাঁদের চোখে এই ব্যাপারটা একটু জটিল ঠেকবে, কিন্তু এটা হ'চ্ছে ভাষাতত্ত্বের সকল নিয়ম-কানুন বা সূত্র বা পদ্ধতির অনুমোদিত পথ। সূত্র যেখানে ছিল, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে' ছিল অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিয়ে' অবিচ্ছিন্ন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে।

বাঙলার বংশপীঠিকা তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বদিক > প্রাচ্য > মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > প্রাচীন বাঙলা > মধ্যযুগের বাঙলা > আধুনিক বাঙলা। বাঙলাভাষার ইতিহাস চর্চা ক'রতে হ'লে এই কয় ধাপের প্রত্যেকটির সঙ্গে পরিচয় দরকার ;—মানসিক চিন্তার বিষয়ীভূত হ'লেও ভাষা মুখ্যতঃ একটী প্রাকৃতিক বস্তু ; আর প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কার্যাকারণাত্মক নিয়ম ধ'রেই হ'য়েছে, সেই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বলবার স্থান এ নয়, তবে বাঙলাভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্মে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে দুটী ছত্র উদ্ধার ক'রে বাঙলাভাষার পূর্ব পূর্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিক্রম কিরকম ছিল বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখাবার প্রয়াস করা গেল। ছত্র দুটী “সোনার তরী” কবিতা থেকে নেওয়া সর্বজন পরিচিত ছত্র—“গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।” আলোচনার সুবিধার জন্মে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ “তরী”কে বাদ দিয়ে নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ “না”টী বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ “উহারে”কে বর্জন ক'রে “আধুনিক “ওরে”কে নেওয়া হ'ল।

আধুনিক বাঙলা	{	গান গেয়ে [না] বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন (জেন) মনে হয় চিনি [ওরে]।
মধ্যযুগের বাঙলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)	{	গান গায়্যা (গাইছা) মাও বায়্যা (বাইছা) কে আশ্বে (আইসে) পে পারে, দেখ্যা (দেইখ্যা) জেহু মনে হোএ চিহী ওহারে।

প্রাচীন বাঙলা (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ)	{ গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারই, দেখিআ জৈহণ মণে (মণ্হি) হোই, চিহ্ণিবি (চিহ্ণিমি) ওহারই ।
মাগধী অপভ্রংশ (আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ)	{ গাণঁ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কি (কএ, কই) আইশই পারহি, দেক্খিঅ জইহণ মণহি হোই, চিহ্ণিমি ওহ- করহি (ওহ) ।
গামধী প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ)	{ গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) কে (*কগে) আবিশদি পালধি (পালে), দেক্খিঅ (দেক্খিত্তা) জাদিশণং মণধি হোদি, চিহ্ণেমি অমুশ্শ ।
প্রাচ্য প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীঃ পূঃ)	{ গানং গাথৈত্বা নাবং বাহেত্বা কে (ককে) আবিশতি পালে, দেক্খিত্বা যাদিশং মনোধি (মধসি) হোতি (ভোতি), চিহ্ণেমি অমুম্ ।
বৈদিক (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ)	{ গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা কঃ (*ককঃ) আবিশতি পারে, *দৃক্ষিত্বা যাদৃশম্ মনসি ভবতি, চিহ্ণয়ামি অমুম্ ।

এর পূর্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে যে অবস্থা ছিল, সেই প্রাক-বৈদিক অবস্থাও আমরা প্রাচীন ইরাণীয়, গ্রীক, লাতিন, কেল্টিক, শ্লাভ, আর জার্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠন করতে পারি।

সাধারণ ভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটো মোটা কথা ব'ল্‌লুম । এ ছাড়া বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,—যেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্‌লে কি বুঝতে হবে ; বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান কিরকম, আর কতটা ; বাঙলাভাষার উপর অনার্য্য প্রভাব ; মুসলমান আর বাঙলাভাষা ; বাঙলাভাষার আধুনিক গতি আর তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-আশঙ্কা ;—এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় নেই । আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে । যে যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক'রলুম, সে সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন । সে সম্বন্ধে কিছু বিচার ক'রতে গেলে বা মত দিতে গেলে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আর বাঙলা ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সেটা সকলেই স্বীকার ক'রবেন ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

কাব্য জিজ্ঞাসা ।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

(১)

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' নামে গল্পের অশরীরী নায়িকাটি তার জীবিত কালের শরীরাবশেষ কঙ্কালটিকে নিয়ে বড়ই লজ্জায় পড়েছিল। অস্থি বিদ্যার্থী ছাত্রকে সে কি করে' বোঝাবে যে ঐ কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর তার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন "এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা" নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, যে সে শরীর থেকে যে অস্থি বিদ্যা শেখা যেতে পারে তা অতি বড় শরীর-বিদ্যাবিদেরও বিশ্বাস হ'ত না! কাব্যের রসাত্মা যদি কাব্যরসের তত্ত্বালোচনা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে তাঁকেও নিশ্চয় এমনি লজ্জা পেতে হ'ত। কারণ কাব্যের তত্ত্ব বিচার কাব্যের কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচারা। রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্ব মাত্র। ধর্ম-পিপাসুর কাছে 'থিয়লজি' যে বস্তু, কাব্যরসিকের কাছে কাব্যের রস বিচারও সেই জিনিষ। তবুও এ বিচারের দায় থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। যা মুখ্যত বুদ্ধির বিষয় নয় তাকেও বুদ্ধির কোঠায় এনে, বুদ্ধির যন্ত্রপাতি দিয়ে একবার মাপযোগ করে না দেখলে, মানুষের মনের কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে 'থিয়লজি' থাকবেই, কাব্যে সাথে সাথে অলঙ্কার-শাস্ত্র গড়ে' উঠবেই। কেবল ও শাস্ত্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলেই বিপদ।

কাব্যের রস বিচার মানুষকে কাব্য-রসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিষ। আলঙ্কারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে “সহৃদয়সহৃদয়সংবাদী”। তদ্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্য-রসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে ‘রসের’ আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ঐ আস্বাদই হচ্ছে রস। যখন বলা হয় ‘রসের আস্বাদ’, তখন রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ অঙ্গীকার করে’ কথা বলা হয়। (১) যেমন আমরা কথায় বলি ‘ভাত পাক হচ্ছে’, যদিও পাকের যা ফল তাই ভাত। তেমনি যদিও কথায় বলি ‘রসের প্রতীতি বা অনুভূতি’, কিন্তু ঐ প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে ‘রস’। (২) সহৃদয় লোকের, অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মত নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, (৩) এমন দরদী লোকের স্রুকাব্য-জনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই ‘রস’। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়—সহৃদয় কাব্য পাঠকের মন। “কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্।”

রস যখন এক রকমের মানসিক অবস্থা, তখন স্বভাবতই তার পরিচয়ের প্রথম কথা.—কি করে’ মনে ঐ অবস্থার উদয় হয়।

(১) “রসঃ স্বাভূতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কৰ্ম্মকর্ত্ত্বি বা প্রয়োগঃ”। (সাহিত্য দর্পণ)।

(২) “ওদনং পচতীতিবদ্যাবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ।” (অভিনব-গুপ্ত । ২।৪)।

(৩) ‘যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাচ্ছিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ী-ভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।’ (অভিনবগুপ্ত । ১।১)।

মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে' কাণ্ট দেখিয়েছেন যে তাতে দু'রকমের উপাদান—মানসিক ও বাহ্যিক। বাইরের উপাদান ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের তখনি উদয় হয়, যখন মনের কতকগুলি তত্ত্ব, ঐ বাহ্যিক উপাদানের উপর ক্রিয়া করে', তাকে এক বিশেষ পরিণতি ও আকার দান করে। এই সব তত্ত্ব মন বাইরে থেকে পায় না, নিজের ভিতর থেকে এনে বাইরের জিনিষের উপর ছাপ দেয়। রৌদ্রের তাপে যে মাথা গরম হয়, এ জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান, রৌদ্র এবং পূর্বেই ঠাণ্ডা ও পশ্চাৎ গরম মাথা—ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়েই মনে আসে; কিন্তু রৌদ্র ও গরম মাথার সম্বন্ধটি, অর্থাৎ ওদের কার্যকারণ সম্বন্ধ মনের নিজের দান। এই কার্যকারণ তত্ত্বের প্রয়োগেই ঐ বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। অথবা উন্টে বলাও চলে, ঐ বাহ্যিক উপাদানই মনোগত সাধারণ কার্যকারণ তত্ত্বকে বিশেষ কার্যকারণের জ্ঞানে পরিণত করে। এবং জ্ঞান অর্থই বিশেষ জ্ঞান। বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব এ দুয়ের সংযোগ হ'লে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এর দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি অন্ধ, ও প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টিপক্ষু নয়, একবারে শূন্য।

রসের বিশ্লেষণে আলঙ্কারিকেরাও এই দুই উপাদান পেয়েছেন,— মানসিক ও বাহ্যিক। রসের মানসিক উপাদান হ'ল মনের 'ভাব' নামে চিন্তাবৃত্তি বা 'ইমোশন্' গুলি। আর ওর বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মত, বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না, আসে কবির সৃষ্টি কাব্যের জগৎ থেকে। আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্যজগতের ঐ বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের 'ভাব' রূপান্তরিত হয়ে 'রসে' পরিণত হয়। সুতরাং আলঙ্কারিকদের মতে 'রস' জিনিষটি

লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে সব 'ভাব' রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্য লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতেই তাদের অস্তিত্ব, এবং সেই জগতের সঙ্গেই তাদের কারবার। কিন্তু এই 'ভাব বা 'ইমোশন' 'রস' নয়, এবং মানুষের মনে যাতে এই 'ভাব' জাগিয়ে তোলে তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা 'ইমোশন'। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকাক্ত হয়। কিন্তু শোকাক্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে 'রসের, উদয় হয়, যার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয় তা, চোখে জল আন্লেও, মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আশ্বাদ যার আছে সেই জানে। যদিও একে প্রমাণ করে' দেখান কঠিন। কারণ,—

“করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥” (সাহিত্যদর্পণ।)

'করুণা প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব সুখ জন্মে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি'। তবু এ কথাও আলঙ্কারিকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে করুণ রস যদি দুঃখেরই কারণ হ'ত, তবে রামায়ণ প্রভৃতি করুণ রসের কাব্যের দিকেও কেউ যেত না।

“কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোহপি স্মাত্তদুশ্মুখঃ ।

তদা রামায়ণদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥” (সাহিত্যদর্পণ ।)

কিন্তু করুণ রসের আনন্দ কাব্য-রসিক মানুষকে নিয়তই সে দিকে টানছে। “Our sweetest songs are those that tell of saddest thought”। আলঙ্কারিকেরা বলবেন, “ঠিক কথা। কিন্তু মনে থাকে যেন, ‘tell of saddest thought’। যা মনে সোজা-সুজি sad thought আনে তা, sweet ও নয়, song ও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought এর কথা বলেন, তখন তা sweetest song হয়।”

ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্য-জগতের এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলঙ্কারিকেরা বলেন, রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনটি সুখের, কোনটি দুঃখময়। কিন্তু ঐ সব লৌকিক ভাব, ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে, পাঠকের মনে ঐ সব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা ‘বাসনা’ আছে তাদের এক অলৌকিক বস্তু—‘রসে’—পরিণত করে। ‘রসের মানসিক উপাদান যে ‘ভাব’ তা দুঃখময় হলেও, তার পরিণাম যে ‘রস’ তা নিত্য স্নানন্দের হেতু। কারণ লৌকিক দুঃখের অলৌকিক পরিণতি আনন্দময় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

“হেতুত্বং শোকহর্ষাদে

র্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ ।

শোকহর্ষাদয়ো লোকে

জায়স্তাং নাম লৌকিকাঃ ॥

অলৌকিক বিভাবহঃ

প্রাপ্তেভঃ কাব্য সংশ্রয়াৎ ।

সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ

সর্বভোহপিতি কা কৃতিঃ ॥” (সাহিত্য দর্পণ ।)

(২)

কবি যে কাব্যের মাজাগৎ সৃষ্টি করেন তার কৌশলটি কি ? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবশ্য অসম্ভব । কারণ, এ প্রশ্ন হচ্ছে নিখিল কবি—প্রতিভার নিঃশেষ পরিচয় দাবী করা । কিন্তু প্রতি কবির প্রত্যেক কাব্যের নির্মাণ কৌশল অন্য সকল কাব্য থেকে অল্প বিস্তর স্বতন্ত্র । কারণ প্রত্যেক কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি, কালের তৈরী জিনিষ নয় । সুতরাং কাব্যতত্ত্ব সে কৌশলের যে পরিচয় দিতে পারে, সে পরিচয় সকল—কাব্য-সাধারণ কাব্য—কৌশলের কঙ্কাল মাত্রের পরিচয় । এ কাজ সম্ভব, কারণ দেহের রূপের ভেদ সত্ত্বেও, কঙ্কালের রূপ প্রায় এক ।

আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্য—নির্মাণ কৌশলের তিন ভাগ । বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ।

‘বিভাব’ কি ?

“রত্যাছুদ্বোধকা লোকে

বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ।” (সাহিত্য দর্পণ)

‘লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাঁকেই ‘বিভাব’ বলে’ । যেমন,—

“যে হি লোকে রামাদিগত—রতি—হাসাদীনামুদ্বোধকারণানি সীতাদয়স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তো ‘বিভাব্যন্তে আশ্বাদাকুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি--ভাবাঃ’ ইতি বিভাবাউচ্যন্তে ।” (সাহিত্য দর্পণ ।) লৌকিক জগতে যে সীতা, ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি, হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধের কারণ, তাই যখন কাব্য ও নাট্যে নিবেশিত হয় তখন তাকে ‘বিভাব’ বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনের রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে, যে তা থেকে আশ্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

‘অনুভাব’ বলে কাকে ?

“উদ্বুদ্ধং কারণৈ স্বেঃ স্বে—

বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্ ।

লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোহ—

নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥” (সাহিত্য দর্পণ ।)

‘মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যে সব স্বাভাবিক বিকার, ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকের ‘অনুভাব।’

“দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে

স্মিতহাস্তে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর শয্যাতে

স্তুক্ অর্ধরাতে ।”

“মিলন-মধুর লাজের” এই কাব্য ছবিটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি ‘অনুভাব’ ।

(৩)

এইখানে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত যে এক দীর্ঘ সমাস বাক্যে কাব্য রসের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিনা ব্যাখ্যাতেই এখন তার অর্থবোধ হবে।

“শব্দসমর্পমানহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত,—প্রাণ্ণিবি-
ষ্টিরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার,—স্বসংবিদানন্দচর্ষণব্যাপার,—রসনীয়-
রূপো রসঃ।” (১৪৮)

‘রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সন্নিদের (consciousness) আশ্বাদনরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্ব নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সন্নিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক ‘ভাবের’ কারণ ও কার্য্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সম-বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য—পাঠকের অন্তনিবিষ্ট ‘ভাব’গুলিকে উদ্বুদ্ধ করে।’

অভিনবগুপ্ত ‘বিভাব’ ও ‘অনুভাব’ কে বলেছেন—‘সকল হৃদয়ে সমবাদী’। কারণ যে লৌকিক ভাবের তারা রসমূর্ত্তি, সে লৌকিক ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়।

“পারিমিত্যালৌকিকত্বাৎ—

সান্তুরায়তয়া তথা।

অনু কার্ঘ্যস্য রত্যাৎ—

রুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ ॥” (সাহিত্য দর্পণ)

‘প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক;

সুতরাং প্রেমের রস--বোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত, লৌকিক ভাবে "সকলসহৃদয়সংবাদী," অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের 'বিভাব' ও 'অনুভাবের' মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্য-চিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়,—

“ব্যাপারোহস্তি বিভাবাদেনান্না সাধারণী কৃতিঃ।”

(সাহিত্য দর্পণ ।)

যার ফলে,—

“পরশ্চ ন পরশ্চেতি

মমেতি ন মমেতি চ ।

তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ

পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥”

(সাহিত্য দর্পণ ।)

‘কাব্য পাঠকের মনে হয় কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনও ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।’

কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের মত, তা একটি abstract জিনিস। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা বর্ণ রূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ concrete ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই নিখিল সহৃদয়জন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।

এই জন্মই কবি যখন কাব্যে ভাবকে রসের মূর্তিতে রূপান্তর করেন, তখন তিনি ভাবের লৌকিক পরিমিতত্বকে ছাড়িয়ে উঠেন। লৌকিক ভাবের গভীর মধ্যে আবদ্ধ ও অভিভূত থাকলে, যেমন কাব্যরসের আস্বাদ হয় না, তেমনি কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না। 'ধ্বন্যালোকের' একটি কারিকা আছে,—

“কাব্যস্তাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা ।

ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোথঃ শোকঃ শ্লোকহমাগতঃ ॥” (১।৫।)

‘সেই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। যেমন, পুরাতনী কথায় বলে, আদিকবির ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব—বিয়োগজনিত শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল।’ এই কারিকার প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন,—‘এ কথা মানতেই হবে যে, এ শোক মূনির নিজের শোক নয়। যদি তা হ’ত তবে, ক্রৌঞ্চের শোকে মূনি দুঃখিত হয়েই থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হ’ত না। কারণ কেবল দুঃখ সমুপ্তের কাব্য রচনা কখনও দেখা যায় না।’ (“ন তু মূনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদুখেন সোহপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্তাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসংতপ্তশ্চৈষা দশেতি।”) অভিনবগুপ্ত বলেন, এখানে যা ঘটেছে তা এই;—

সহচরী—বিয়োগ—কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মূনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদন স্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুন্ত থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে’ ঐ রস মূনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে। (“সহচরীহননোদ্ভুতেন সাহচর্যধ্বং-

সনেনোথিতো ষঃ শোকঃ...স এব...আস্বাঃস্থমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণ-
রসরূপতাংলৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিন্তবৃত্তিসমাস্বাঃস্থসারাং প্রতি-
পন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুস্তোচ্ছলনবৎ...সমুচিতছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিত শ্লোক-
রূপতাং প্রাপ্তঃ।”)

আলঙ্কারিকদের আবিষ্কৃত, লৌকিক ‘ভাবকে’ কাব্যের ‘রসে’
রূপান্তরের এই তত্ত্বটি, ইতালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচ
অনেকটা ধরেছেন। তাঁর “কাব্য ও অকাব্য” নামক গ্রন্থে ক্রোচ
লিখেছেন,—

“What should we call the blindness of a poet ?
The incapacity of seeing particular passions in the light
of human passion, aspirations in the fundamental and
total aspiration, partial and discordant ideals in the
ideal which shall compose them in harmony : what at
one time was called incapacity of “idealizing.” For
poetic idealization is not a frivolous embellishment,
but a profound penetration, in virtue of which we
pass from troublous emotion to the serenity of con-
templation. He who fails to accomplish this passage,
but remains immersed in passionate agitation, never
succeeds in bestowing pure poetic joy either upon
others or upon himself, whatever may be his
efforts.” (৪)

(৪) European Literature in the Nineteenth Century নামে
ইংরেজী অনুবাদ : ৫২ পৃষ্ঠা।

ক্রোচের “poetic idealization” আলঙ্কারিকদের ‘ভাব’ ও তার কারণ কার্যের, “সকল হৃদয়সংবাদী” ‘বিভাব’, ‘অনুভাবে’ পরিণতি। ক্রোচের ‘passage from troublous emotion to the serenity of contemplation’, আলঙ্কারিকদের লৌকিক ‘ভাবকে’ আপাদ্যমান ‘রসে’ রূপান্তর। “Serenity of contemplation” হচ্ছে দার্শনিক সুলভ ‘মনন’ বৃদ্ধির উপর ঝোক দিয়ে কথা বলা। আলঙ্কারিকদের “রস চর্চণ” কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশী ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি Wordsworth যে কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, poetry “takes its origin from emotion recollected in tranquility”, সেটি আলঙ্কারিকদের এই ‘রূপান্তর বাদের’ ই অস্পষ্ট অনুভূতি, ও অস্ফুট বিবৃতি।

আজকের দিনের ‘লিরিক’ কাব্যের যুগে, যখন কবির নিজের মনের ‘ভাবই’ কাব্যের উপাদান, তখন এ ভ্রম সহজেই হয় যে, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই নুবি কাব্যের লক্ষ্য। এবং যে কবির হৃদয়ের ভাব যত তীব্র ও যত আবেগময় তাঁর কাব্য-রচনাও তত সার্থক। কিন্তু ‘লিরিক’ কিছু আলঙ্কারিকদের কাব্য-বিশ্লেষণের বাইরে নয়। ‘ভাব’ যদি না কবির মনে রসের মূর্তি পরিগ্রহ করে, তবে কবি কখনও তাঁকে সে ‘বিভাব’ ও ‘অনুভাবে’ প্রকাশ করতে পারেন না, যা পাঠকের মনেও সেই রসের রূপ ফুটিয়ে তোলে। মনে যাতে ‘ভাব’ উদ্ভূত হয় তাই যদি কাব্য হ’ত, তবে আজ বাংলাদেশে যে সব হিন্দু মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হ’ত। কারণ অনেক হিন্দু-

মুসলমানের ক্রোধই তাতে জ্ঞাপ্ত হচ্ছে। অভিনবগুপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন, “তোমার পুত্র জন্মেছে”, এই কথা শুনে পিতার যে হর্ষ তা রস নয়, এবং ও বাক্যটিও কাব্য নয়। (‘পুত্রস্তে জাতঃ’ ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা নাপি লক্ষণয়া।” ১।৪) ‘অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতো সিদ্ধস্বভাবসুখাদিবিলক্ষণঃ পরি-স্ফুরতি।” ‘কিন্তু কবি সমুচিত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা, সহৃদয় পাঠকের সম বাদী তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত মনে, ঐ হর্ষকেই, স্বভাবসিদ্ধ সুখ থেকে বিভিন্ন লক্ষণ, আশ্বাচ্ছমান রসের রূপে পরিণত করতে পারেন।’ যেমন কালিদাস রঘুর জন্ম শ্রবণে দিলীপের ‘হর্ষকে’ করেছেন ;—

“জনায় শুদ্ধাস্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসন্মিতাক্ষরম্ ।
অদেয়মাসীৎ এয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥
নিবাতপদ্যস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কাশ্চং পিবতঃ স্তৃতাননম্ ।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাঅানি ॥”

তবুও যে ভাবোদ্বেল কবির আবেগময় কাব্য কাব্য-রস থেকে বঞ্চিত নয়, তার কারণ ‘ভাব’ “শব্দে সমর্পিত” হ’লেই ব্যক্তিগত লৌকিকত্বের গণ্ডী থেকে কতকটা মুক্ত হয়। কেন না ভাষা জিনিষটিই সামাজিক। কিন্তু ‘লিরিক’ যত ‘ভাব’—ঘাসা হয় ততই যে শ্রেষ্ঠ হয় না, তা যে কোনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদাহরণ নিলেই দেখা যায়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের ‘অনন্তপ্রেম’।

“তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার !

* * * * *

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি
 যুগল প্রেমের স্রোতে,
 অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হ'তে ।

আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা
 কোটি প্রেমিকের মাঝে,
 বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
 মিলন-মধুর লাঞ্জে ।

পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে ।”

এর সঙ্গে যদি হেমচন্দ্রের “আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে”, কি
 নবীনচন্দ্রের “কেন দেখিলাম”, তুলনা করা যায়, তবেই কাব্যের রস
 ও ভাবের উচ্ছ্বাসের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হবে ।

(৪)

আলঙ্কারিকেরা ‘বিভাব’ ও ‘অনুভাব’ ছাড়া “সঞ্চারী” নামে কাব্য-
 কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন, তার পরিচয় দিতে হ’লে,
 ‘ভাবের’ যে মনোবিজ্ঞানের উপর আলঙ্কারিকেরা তাঁদের রসতত্ত্বের
 ভিত্তি গড়েছেন তার একটু বিবরণ দিতে হয় ।

মানুষের মনের ‘ভাব’ বা ‘ইমোশন’ অনন্ত । কারণ ‘ইমোশন’
 শুধু feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয় । আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদদের
 ভাষায় ‘ইমোশন’ হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্বাবয়ব
 মানসিক অবস্থা । অর্থাৎ ‘ইমোশন’ বা ‘ভাবের’ সুখদুঃখানুভূতি
 কতকগুলি idea বা ‘বিজ্ঞানকে’ অবলম্বন করে’ বিদ্যমান থাকে । এই
 ‘আইডিয়া’ পুঞ্জের কোনও অংশের কিছু পরিবর্তন ঘটলেই, ‘ইমোশন’

বা 'ভাব' নামক মানসিক অবস্থাটিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। 'আইডিয়ার' সংখ্যা অগণ্য এবং তাদের পরস্পর যোগ বিয়োগের প্রকারও অসংখ্য। সুতরাং 'ভাব' বা 'ইমোশন' সংখ্যাভীত। এবং কোনও 'ভাব' অন্য 'ভাবের' সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। কিন্তু তবুও, যেমন মনোবিজ্ঞানবিদ, তেমনি আলঙ্কারিক, কাজের সুবিধার জন্য, অগণ্য স্বলক্ষণ 'ভাবের' মধ্যে কয়েক প্রকারের 'ভাবকে,' সাদৃশ্য বশত কয়েকটি সাধারণ নামে নামাঙ্কিত করে, পৃথক করে' নিয়েছেন। আলঙ্কারিকেরা এই রকম নয়টি প্রধান 'ভাব' স্বীকার করেছেন,—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, ওশম।

“রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চৈত্মর্ষৌ প্রোক্তাঃ শমোহপি চ ॥”

এই নয়টি ভাবকে তাঁরা বলেছেন “স্থায়ী ভাব”। কারণ, “বহুনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথো-পলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ” (অভিনবগুপ্ত, ৩২৪)। ‘ভাবরূপ’ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় সেইটি স্থায়ীভাব।’ আলঙ্কারিকদের মতে এই নয়টি ‘ভাব’, কাব্যের ‘বিভাব’, ‘অনুভাবের’ সংস্পর্শে, যথাক্রমে নয়টি ‘রসে’ পরিণত হয়,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, ও শাস্ত।

“শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।

বীভৎসোহদ্ভুত ইত্যর্কৌ রসাঃ শাস্তস্তথা মতঃ ॥”

কিন্তু এই নয়টি ছাড়াও অবশ্য মানুষের মনে বহু ‘ভাব’ আছে, এবং তার মধ্যে অনেক ‘ভাব’, কাব্যের ‘বিভাব ও অনুভাবে’,

আলঙ্কারিকদের কথায়, “আশ্বাচ্ছমানতা” প্রাপ্ত হয়। আলঙ্কারিকেরা ‘নির্বেদ’, ‘লজ্জা’, ‘হর্ষ’, ‘অসূয়া’, ‘বিষাদ’ প্রভৃতি এ রকম তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন, এবং তা ছাড়াও যে আরও অনেক ‘ভাব’ আছে তা স্বীকার করেছেন। “ত্রয়স্বিংশদিতি নূনসংখ্যায়াঃ ব্যবচ্ছেদকং ন ত্বধিকসংখ্যায়াঃ।” এই সব ‘ভাবকে’ আলঙ্কারিকেরা বলেছেন ‘সঞ্চারী’ বা ‘ব্যভিচারী’ ভাব। তাঁদের ‘খিওরী’ হচ্ছে যে, এই সব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না; কোনও না কোনও ‘স্থায়ীভাবের’ সম্পর্কেই মনে যাতায়াত করে, সেই ‘স্থায়ীভাবের’ অভিমুখে মনকে চালিত করে। এইজন্য এদের নাম ‘সঞ্চারী’ বা ‘ব্যভিচারী’। (৫) ‘ভাবের’ এই খিওরী থেকে স্বভাবতই ‘রসের’ খিওরী এসেছে যে, কাব্যে ‘সঞ্চারী’ ভাবের স্বতন্ত্র রস-মূর্তি নেই; তাদের “আশ্বাচ্ছমানতা” স্থায়ীভাবের পরিণতি নয়টি রসকেই নানারকমে পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। সুতরাং যদিও কাব্যের নব রসের রসত্ব অনেক পরিমাণে এই ‘সঞ্চারীর’ আশ্বাদের উপর নির্ভর করে, তবুও অনেক আলঙ্কারিকই, স্বাতন্ত্র্যের অভাবে, ‘সঞ্চারী’ ভাবের পরিণতিকে ‘রস’ বলতে রাজী নন। অভিনব গুণ্ড বলেছেন, “স চ রসো রসকরণযোগাঃ, শেষাস্তু সংচারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়ি সংচারি ভাবেনাঙ্গাগিতা যুক্তা”। ‘স্থায়ীভাবের পরিণতিই ‘রস’, বাকীগুলিকে বলে ‘সঞ্চারী’। রসের ধ্য আবার ‘স্থায়ীরস’ ও ‘সঞ্চারী রস’ এই ভাবে অঙ্গী ও অঙ্গের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।’ এবং তাঁর মতই অধিকাংশ আলঙ্কারিকের মত। কিন্তু ‘স্থায়ী’ ও ‘সঞ্চারী’র এই প্রভেদ কিছু মূলগত

(৫) “স্থিরতরা বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাহৃত্যবতিরোভাবাত্যা-
মভির্স্থান চরণাভ্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।” (সাহিত্যদর্পণ।)

প্রভেদ নয় ; এবং 'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র 'রসে' পরিণতি সম্ভব নয়, এও একটু অতি সাহসের কথা । সেই জন্ম আলঙ্কারিকদের মধ্যে এ মতও প্রচলিত ছিল যে, 'সঞ্চারী' ও 'রস', কেবল 'রসের' পরিপূষ্টি সাধক নয় । অভিনবগুপ্ত ভাগুরি নামে এক আলঙ্কারিকের মত তুলেছেন, "তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসনামপি স্থায়িসংচারিতান্তি ইত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমে নৈবোত্তরমবোচৎ রাঢ়মস্তীতি" । 'রসেরও কি আবার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ আদে । এর উত্তরে ভাগুরিও বলেছেন, অবশ্য আছে ।' এবং সকল আলঙ্কারিককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যে 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী' এই ভেদটি আপেক্ষিক । কারণ, এক কাব্য-প্রবন্ধে যখন নানা রস থাকে, তখন দেখা যায় যে তার মধ্যে একটি 'রস' প্রধান, এবং স্থায়ীভাবে পরিণতি অন্য 'রস' তার পরিপোষক হয়ে 'সঞ্চারীর' কাজ করছে । "রসো রসাস্তরস্ব ব্যভিচারী ভবতি" (ধন্যালোক, ৩২৪) । 'এক 'রস' অন্য 'রসের' ব্যভিচারীর কাজ করে' ।

"প্রসিদ্ধেহপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে ।

একো রসোহঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা ॥" (ধন্যালোক, ৩২১) ।

'এক কাব্য-প্রবন্ধে নানা রস একত্র থাকলেও, দেখা যায় কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্ম তার মধ্যে একটী রসকেই প্রধান করেন ।' এবং বাকী 'রস'গুলি তার পরিপোষক বা 'সঞ্চারী' । এই 'সঞ্চারী' কাব্যের ঐতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলঙ্কারিকদের মধ্যে এ মতও চলুতি হয়েছিল যে 'সঞ্চারী' দিয়ে পরিপূষ্টি না হলে 'রসের' রসত্বই হয় না । "পরিপোষরহিতস্ব কথং রসত্বম্" (ধন্যালোক, ৩২৪, স্থিতি ।) ।

কবিরাজ বিশ্বনাথ যে কারিকায় 'রসের' 'উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন, 'সাহিত্য-দর্শনের' সেই কারিকাটি এখন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

“বিভাবেনামুভাবেন

ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা ।

রসভামেতি রত্যাদিঃ

স্থায়ীভাবঃ সচেতনাম্ ॥”

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, (কাব্যের) 'বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে', রসে পরিণত হয়।' আশা করা যায় এর আর এখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

(৫)

আলঙ্কারিকদের রসের তত্ত্ব একটা উদাহরণে বিশদ করা যাক। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন দুর্ঘ্যোধন বিনাযুদ্ধে কিছুই ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রণা সভায় স্থির হ'ল শ্রীকৃষ্ণকে দূত করে' ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্ঘ্যোধনের কাছে পাঠান হোক। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে সকলেই মত দিলেন যুদ্ধ না করে' শান্তিতেই যাতে বিবাদ মীমাংসা হয় সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'যাতে শান্তি স্থাপন হয় সেই চেষ্টা কোরো। দুর্ঘ্যোধনকে উগ্র কথা না বলে, মিষ্ট কথায় বুঝিও'। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'ভীমের এই অক্রোধ অভূতপূর্ব। এ যেন ভারহীন পর্বত, তাপহীন অগ্নি'। কেবল সহদেব ও সাত্যকি সোজামুজি যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন। তখন, :—

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मार्थं सहितं हितम् ।
 कृष्णं दाशार्हं मासौनमत्रवीच्छोकं कर्षिता ॥
 सूता द्रुपदराजस्य स्वसितायत मुद्गजा ।
 सम्पूज्य सहदेवकं सात्यकिकं महारथम् ॥
 भीमसेनकं संशास्तुं दृष्ट्वा परमदुर्मनाः ।
 अश्रुपूर्णेक्षणं वाक्यं मुवाचेदं वशस्विनी ॥

* * * * *

का नु सौमस्तिनी मादृक् पृथिव्यामस्ति केशव ॥
 सूता द्रुपदराजस्य वेदीमध्यां समुत्थिता ।
 धृष्टदुम्नस्य भगिनी तव कृष्णं प्रिया सखी ॥
 आजमीढकुलं प्राप्ता नूषा पाण्डोर्महात्मानः ।
 महिषी पाण्डुपुत्राणां पक्वेन्द्रसमवर्त्तसाम् ॥
 साहं केशग्रहं प्राप्ता परिक्रिष्टा सभां गता ।
 पश्यातां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केशव ॥
 जीवन्सु पाण्डुपुत्रेषु पाण्डालेषु वृषिषु ।
 दासीभूतास्मि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥

* * * * *

धिक् पार्थस्य धनुश्चक्रां भीमसेनस्य धिग्वलम् ।
 यत्र दुर्योधनः कृष्णं मुहूर्त्तमपि जीवति ॥
 यदि तेहमनुग्राह्या यदि तेहस्ति कृपा मयि ।
 धार्तराष्ट्रेषु वै कोपः सर्वः कृष्णं विधीयताम् ॥
 इत्युक्त्वा मूढसंहारं वृजिनाग्रं सुदर्शनम् ।
 सुनीलमसितापाङ्गी सर्वव गङ्गा धिवासिताम् ॥

সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগ বর্চসম্ ।
 কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা ॥
 পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী ।
 অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥
 অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসন করোদ্ধতঃ ।
 স্মর্তৃবাঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥
 যদি ভীমার্জ্জুনো কৃষ্ণ কৃপণো সন্ধিকামুকো ।
 পিতা মে যোৎস্বতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥
 পঞ্চ চৈব মহাবীৰ্য্যাঃ পুত্রা সে মধুসূদন ।
 অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্বন্তে কুরুভিঃ সহ ॥
 দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংচ্ছিন্নং পাংশুগুষ্ঠিতম্ ।
 যত্নহস্তু ন পশ্যামি কা শাস্তি হৃদয়স্য সে ॥
 এয়োদশ হি বর্ষানি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে ।
 নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥
 বিদীৰ্ঘ্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্শল্যপীড়িতম্ ।
 যোহয়মত্ন মহাবাল্ধর্ষ্মমেবানু পশ্যতি ॥
 ইত্যুক্ত্বা বাস্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়ত লোচনা ।
 রুরোদ কৃষ্ণা সোৎকম্পং সম্বরং বাস্পগদ্গদম্ ॥

(মহাভারত ; উদ্যোগ পর্ব, ৮১ ।)

‘ঘোরকৃষ্ণ আয়ত কেশা, যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত
 বাক্যশ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত
 অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করত অশ্রুপূর্ণলোচনে
 কৃষ্ণকে কহিতে, লাগিলেন,—“হে কেশব ! এই ভূমণ্ডল মধ্যে

আমার তুল্য নারী আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদীসমুখিতা কন্যা, ধৃষ্ঠদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীড়কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুঘা ও পঞ্চইন্দ্রের তুল্য পাণ্ডবগণের মহিষী। সেই আমি, তুমি এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণে পরিক্রিষ্টা হইয়াছি; পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছি। পার্থের ধনুর্বিছা ও ভীমসেনের বলে দিক! যে দুর্ঘোষন এখনও জীবিত আছে। হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।”

‘অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র, সুদর্শন, ঘোরকৃষ্ণ, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ববলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগ সদৃশ বেণীবন্ধ কেশকলাপ বামহস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই কেশকলাপ স্মরণ করিও। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিকামী হইবেন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কোরবগণকে সংহার করিবে। দুর্ভাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, পাংশুগুপ্তিত না দেখিলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়। আমি হৃদয়কেন্দ্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধকে স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদকের

বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।” আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া বাষ্পগদগদস্বরে, কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।’

ব্যাসের এই মহাকাব্যখণ্ডের কাব্যত্ব সম্বন্ধে কোনও কাব্য-রসিককে সচেতন করতে হবে না। ওর কাব্যের দ্ব্যতি মধ্যাহ্নের সূর্যের মত স্বপ্রকাশ। এখন আলঙ্কারিকদের কাব্য বিশ্লেষণ ওতে প্রয়োগ করে’ দেখা যাক্।

আলঙ্কারিকেরা বলবেন, এ কাব্যের আত্মা হচ্ছে কয়েকটি রস। কিন্তু কাব্যটি “নানা রস নিবন্ধ” হলেও কবি একটি রসকেই প্রধান করেছেন। সে রস ‘রৌদ্র’ রস। রৌদ্ররসের লৌকিক ‘ভাব’-উপাদান হচ্ছে ‘ক্রোধ’। বাস্তব জীবনে ‘ক্রোধ’ মনোহারী জিনিষ নয়। কিন্তু মহাকবির প্রতিভার মায়া দ্রৌপদীর ক্রোধকে অপূর্ব রস-মূর্তিতে পরিণত করেছে। রৌদ্ররসের ‘বিভাব’ হচ্ছে লৌকিক জগতে যাতে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় তার শব্দে সমপিত হৃদয়-সংবাদী চিত্র। দুর্যোধন, দুঃশাসন ও তাদের নিদারুণ অপমানের সেই চিত্র এখানে সামান্য কয়েকটি রেখায় ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কারণ ‘সভাপর্বে’ তার অভ্যাগ্ন, উজ্জ্বল ছবি সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে পূর্ব থেকেই ক্রোধের রৌদ্র রাগে রক্তিম করে’ রেখেছে।

কিন্তু রৌদ্র রসই যদি এ কাব্যের একমাত্র রস হ’ত তবে এর কাব্যত্বের শতাংশও অবশিষ্ট থাকত না। আলঙ্কারিকেরা বলবেন, কয়েকটি ‘সঞ্চারী’ এর রৌদ্র রসকে আশ্চর্য্য সরসতা ও পরম উৎকর্ষ দিয়েছে। নবরসের দুইটি প্রধান রস, বীর ও করুণ, এবং কয়েকটি

ব্যভিচারী—বিষাদ, গর্ভ, দৈন্ত,—রৌদ্রের রক্তরাগকে অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে' তুলেছে।

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর শোককর্ষিত, অশ্রুগলোচন, বিষাদ মূর্তিতে কাব্যের আরম্ভ হ'ল। তার পর দ্রৌপদীর পিতৃকুল, পতিকুল ও মিত্র—সৌভাগ্যের যে গর্ভ তা শোকের করুণ রসকেই গভীর করেছে। আর শোকের অন্তরে যে ক্রোধ তার রৌদ্রের রক্তিমদ্যুতি করুণ রসের অশ্রুজলে রক্তের রামধনু ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার মুহূর্তেই রৌদ্রের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায় মিলিয়ে গেছে।

মহাভারতকার যে দুটি শ্লোকে দ্রৌপদীর মহাভূজঙ্গের মত দীর্ঘ বেণীর ছবি এঁকেছেন, সেই বেণী যা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করবে, আলঙ্কারিকেরা তাকেই বলেন কাব্যের 'বিভাব'। এ কাব্যের সমস্ত রসের অবলম্বন হচ্ছে দ্রৌপদী। সূত্রাং সেই সব রসের অনুগত দ্রৌপদীর, ও তার চেষ্টার ছবি,

“কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা।

পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।”

এ কাব্যের 'বিভাব'। বলা বাহুল্য এর মত 'বিভাব' মহাকবিতেই সম্ভব। অন্য কবির হয় এ ছবি কল্পনায় আস্ত না, না হয় বেণীর বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক চলতো।

এর পর দ্রৌপদীর বাক্য করুণ ও রৌদ্রের এক অপরূপ মিশ্রণ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি কখনও সন্ধির কথা মনে হয়, দুঃশাসনকরোদ্ধত আমার এই বেণীর কথা মনে কোরো।' এবং এই মিশ্র রস বীর-পিতা, বীর-ভ্রাতা ও বীর-পুত্র ক্ষত্রিয় নারীর বীর রসের তাপে তপ্ত হ'য়ে, রৌদ্রের বহ্নিরাগে দপ্ করে জ্বলে' উঠেছে।

এবং অভিমান ও শোকের অশ্রুজলে কাব্য শেষ হ'লেও, সে করুণ রস মুখ্য-রৌদ্ররসকে নির্বাপিত না করে', তাকে পরিপুষ্ট ও স্থায়ী করেছে। যে শোকের ছবিতে কাব্য সমাপ্ত, সে ছবি কয়েকটি 'অনুভাব' দিকে ঝাঁক। লৌকিক শোক যা দিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়, ও ছবি তারই কাব্যে সমর্পিত রস-মূর্তি।

এ কাব্যের রসের বিবরণ এখনও শেষ হয় নি। কারণ এর রৌদ্র, বীর, করুণ, সমস্ত রসের অন্তরালে আর একটি রসের মূর্তি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ কাব্যের ক্রোধ, বীরত্ব, শোক—সকলই মেতেজস্বিনী, সুন্দরী নারীর ক্রোধ, বীর্য ও শোক, কবি এ কথা বিস্মৃত হতে' দেন নি। সমস্ত কাব্যের মধ্যেই সে স্মৃতির উদ্বোধ ছড়িয়ে রেখেছেন। মধুর বা শৃঙ্গার রসের 'বিভাব' সুন্দরী নারীর সংস্পর্শ এর রৌদ্র, বীর, করুণ—সমস্ত রসের উপরেই একটা মাধুর্যের রশ্মিপাত করেছে।

• এ কাব্যে রৌদ্র ও বীর-রস পাশাপাশি রয়েছে। একটু অবাস্তুর হ'লেও এদের প্রভেদটা একটু স্পষ্ট করা বোধ হয় নিরর্থক নয়। রৌদ্র রসের 'ভাবের' উপাদান হ'ল 'ক্রোধ', কিন্তু বীর রসের 'ভাবের' উপাদান হচ্ছে 'উৎসাহ'। যাত্রার বীররস যে হাস্যাস্পদতার কারণ যাত্রাওয়ালা রৌদ্র রসকে বীররস বলে' ভুল করে। তার মনে ধারণা যে বীর রসের উপাদান 'ক্রোধ'। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলবে"—আলঙ্কারিকদের মতে বীর রসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!"—কবি বীর রসের কবিতা মনে করে'

লিখলেও, আলঙ্কারিকেরা ওকে কখনই বীর রস বলতে রাজী হতেন না। কারণ ওটি 'উৎসাহের' রস-মূর্ত্তি নয়।

আলঙ্কারিকদের এই কাব্য-বিশ্লেষণ যে আধুনিক constructive criticism, 'গঠন-মূলক' সমালোচনায় অভ্যস্ত পাঠকের মনে ধরবে না, তা বেশ জানি। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা কাব্য নিয়ে কবিত্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ওর অর্থ ও সার্থকতা তাঁরা বুঝতেন না। কাব্যের গাঢ় রাগকে সমালোচনার ফাঁকে রঙে এঁকে কার কি হিত হয় তা তাঁদের বুদ্ধির অতীত ছিল। অধিকাংশ constructive criticism যে হয় কাব্যের রসকে, রস-হীন বাক্যের জল মিশিয়ে, পাতলা করে' পাঠকদের সামনে ধরা; না হয়, কাব্যের 'ইমোশনকে' সমালোচনার sentimentalism এর একটা উপলক্ষ করা—এ কথা "আধুনিকতার" ঠুলি, যা আজ বাদে কালই পুরাতন বলে' গণ্য হবে, তা একটু খুলে ফেললেই হৃদয়ঙ্গম হবে। আলঙ্কারিকেরা বুঝে-ছিলেন কাব্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস, দরকার হ'লে পাতলা করে', পাঠককে গিলেয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়; কারণ ও কাজে কেউ কখনও সফলকাম হতে পারবে না। আলঙ্কারিকেরা জানতেন কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে। সমালোচকের 'কবিত্ব' পড়ে কাব্যের রসাস্বাদনের আধুনিক তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল না।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের এখানেই 'ইতি' করা যাক। 'রসের' সঙ্গে কাব্যের আর সব উপাদান—তার বাচ্য-বাচক, তার ছন্দ ও অলঙ্কার—এদের সম্বন্ধ কি তা এখানেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু পাঠকের ধৈর্যের উপর আর জবরদস্তী করা অসম্ভব। আর একটি প্রস্তাবে

এর আলোচনা করা যাবে। Truth বা সত্যের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কি তা এই বিচারেরই অন্তর্গত। এবং আলঙ্কারিকেরা সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধের কি মত পোষণ করতেন তৃতীয় প্রস্তাবে তারও পরিচয় দেবো।

॥অতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সাধুমা'র কথা ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

কিন্তু মা'র আর চিন্তার হাত থেকে নিস্তার ছিল না । তাঁর হয় একটি মেয়ে কি একটি ছেলে লিবার জ্বরে ভুগছে, নয় মারা গেছে,— এ সব একটা কিছু ঘটনা আছেই । নয়ত আমার পিতা, দিদিমা কর্তামণিব সঙ্গে কিছু বাদবিসম্বাদ করছেন । তার দরুণ মা'র সর্বদা শঙ্কিতচিত্ত হয়ে থাকতে হত । আমার পিতা যে কিছু মন্দ লোক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর একটা দোষ ছিল, তিনি মাঝে মাঝে নেশার বশীভূত হয়ে কলহ গোলমাল করতেন । তাঁর সংসারে মন বসত না, কেননা তিনি বেশ বুঝতে পারতেন যে, এ সংসার কেবল পাঁচ জনের লুটের বাজার । যদি এ কথা বুঝিয়ে বলতে যেতেন, কোন ফল হত না; দিদিমা ধমক দিতেন । কিন্তু বাবা বেশ বুঝতে পারতেন যে, তাঁর সমস্তানগুলির ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার । বাবাকে আমার কর্তামণি খুব আদরযত্ন করতেন ও বাবুয়ানায় লালন পালন করেন । ছোটবেলায় বাড়িতে মেম রেখে ইংরাজি শেখান । সাহেবের ইস্কুলে পড়ান । শুনেছি যে বাবা যদি অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে ইংরাজি বলতেন, লোকে বলত এ ইংরাজে কথা কইছে । পরিষ্কার উচ্চারণ ছিল । আর তাঁর মন খুব খোলা, ও পরোপকারে রত ছিল । তিনি দুঃখ প্রকাশ করে' বলতেন যে, আমায় একটা বাবু করে' মানুষ করেছেন, একটু কষ্ট সইবার ক্ষমতা নেই; মখমল জরিঁ মুড়ে, ক্ষীর সর ছানা খাইয়ে, আব আদর দিয়ে দিয়ে একটি

কিন্তুতকিমাকার জানোয়ার বামিয়েছেন ; আর আমার ছেলে মেয়েগুলিকেও সেইমত করেছেন ; কিন্তু এ সকল বাবুয়ানা কিসে চিরকাল চলবে, বিষয় বে-বন্দোবস্ত, প্রচুর বায়, আর তেমনি দেনা ; আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার । এই সকল নানা কারণে বাবার মন বড় খারাপ হত ; হলেই তিনি চিন্তারাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ঐ সুরাদেবীর আশ্রয় নিতেন । তিনি প্রায় নানা দেশভ্রমণেই জীবনাতিবাহিত করেছিলেন । শেষ তাঁর মৃত্যু হয় প্রয়াগধামে, ২৪ ঘণ্টার ভিতর, কলেরায় । আমার বাবা বাড়ীতে এলে বড় খুসি হতুম, কিন্তু যেদিন নেশা করতেন, আমি সেদিন বড় ভয় পেতুম । আমি দিদিমার কাছে আর ওবাড়ীতেই বেশী সময় অতিবাহিত করতুম । খেলা, আমোদআহ্লাদ—এইটাই হলেই বড় আনন্দে থাকি । বাবা বৃন্দাবনে গিয়ে বনযাত্রা করেছিলেন, পরে অতি সুন্দর একখানি সচিত্র গোলকধাম এঁকেছিলেন । প্রথম আঁকেন সংসার-আশ্রম—তাতে চিত্রিত ছিল পুত্রকন্যা, স্ত্রী, পিতামাতা, দাসদাসী, গৃহপালিত পশুপক্ষীবেষ্টিত একটা ভবন । আবার তিন নং চিত্র বিশ্রাম-ঘাট—সেটা আমাদের নিজ বাড়ী ; আর দশ নং ছিল নরককুণ্ড, একটা কঙ্কালবেষ্টিত কূপ । উচ্চস্থানে ছিল সুরলোক, তাতে ইন্দ্ররাজার যে প্রতিমূর্তি, সেটা অঙ্কিত করেছিলেন তাঁর পিতার । তিনি বড় আদুরে ছেলে ছিলেন, তাঁকে কর্তামণি বাবু বলে ডাকতেন, আর তিনি বাবা বলতেন । আমার পিতার চেহারা ঠিক ইংরাজদের মতই ছিল । আর তাঁর স্বভাব ছিল—এ না হলে চলে না, এটা না হলে আহ্বার করা যাবে না, তা নয় ; যেদিন যা হোক চলে যেত । আর

খুব নকল করতে পারতেন। সব জাতীয় কথা কইতে পারতেন—বেহারা, বামুন, রজুক, জলের ভারী, পরামাণিক, এদের সকলকার সঙ্গেই নকল আনন্দ করতেন।

আমি পূর্বেই লিখেছি আমার নীচে দুটা ভগ্নী ছিল, তারা দুজনেই পীড়িত ছিল; তাদের বিস্তর চিকিৎসা হয়, কিন্তু পরমায়ু ছিল না। একটার মৃত্যু হয় ৪ বৎসর বয়সে; তখন মা আমার পূর্ণগর্ভা ছিলেন। সেইদিন রাত ২টার সময় একটা পুত্রসন্তান হয়েছিল; তার পরদিন আর একটা কন্যা মারা যায়, তার বয়স ছ'বৎসর। এই রকম মা বিস্তর শোক পেয়েছিলেন।

আমার বিবাহের সম্বন্ধ হবার মধ্যে নানা কথা এসে পড়েছে। দুর্গাপূজা হয়ে গেল, পরে পূর্বদর্শিত দেবতার মত লোকটা, যিনি ইউডেন পার্কে দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি পূজার পর দ্বাদশীর দিন পুনরায় আমাদের বাড়ীতে দর্শন দেন। দিদিমার কাছে এসে, প্রণাম করে' বসে, মিষ্টি মিষ্টি করে' কত কথা কইতে লাগলেন। আমিও দিদিমার কাছে বসেছিলুম। ক্রমে ক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। দিদিমা আমায় বললেন—যাও দাদা, খেলা করগে। আমি চলে গেলুম, একেবারে পাশের বাড়ী। পরে বাড়ী এসে সকলেরি মুখে শুনতে লাগলুম যে, আমার বেশ ভাল জায়গায় বিয়ে হবার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। যিনি এসেছিলেন, তিনি আমার খুব খুব অমায়িক লোক। আর তিনি এটনি, তাঁর একটা ছেলে; ছেলেটাও নাকি খুব সুন্দর, ও ভালমানুষ। ঝিয়েরা সব আমায় খুব ক্ষেপায়,—এইবার আর গাড়া চড়ে' বিরি হয়ে বেড়াতে পাবে না, ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকতে হবে।

আমিও শুনে শুনে যেন কিছু একটু বদলে গেলুম, একবার একবার একটু একটু চিন্তা করতে লাগলুম, মনে হতে লাগল মা ও মেজমা যেমন বউ, সেইরকম আমিও বউ হব ত? আর বেড়াতে যেতে পারব না, ঠাকুরবাড়ী গিয়ে কীর্তন শোনা হবে না। হোলির সময় দেউড়িতে বড় গামলায় আবীর গুলে একবার ঠাকুরবাড়ীতে, একবার রাস্তায়, একবার ও-বাড়ীর দিদিদের সঙ্গে আবীরখেলা আর হবে না। কিন্তু কি জানি আমার দেহটা পরমেশ্বর কি উপাদানে গঠিত করেছেন, চিন্তা আমায় বেশীক্ষণ চিন্তিত করতে সক্ষম হয় না, তখনি মন জোর করে নূতন আনন্দ এনে চিন্তা প্রফুল্ল করে। আমি অমনি একটা স্থির করে' গঠন করে নিলুম। বেশ ত ভালই, বরের বাড়ী যাব, কত গহনা পরব, ভাল ভাল জরির কাপড় পরব, আবার নতুন বাড়ী দেখব; শুনছি বাগান পুকুর আছে, ফুল তুলব, পুকুরে স্নান করব, বেশ কত মজা হবে। আমরা ত কাউকে শ্বশুরবাড়ী যেতে দেখিনি, ওবিষয় যে কি দুঃখ তা জানিনে। আমার যেমন খেলাধুলা, খাওয়াপরা চলছিল, সেই মতই চলেছে। নূতন ঘটনার মধ্যে একবার আমি, দাদা, খাজাঞ্চিদাদা আর কর্তামণি, বামুন, চাকর, বেহারা নিয়ে, বজরায় ক'রে ফরাসডাঙ্গায় হীরালাল শীলের গঙ্গার উপর যে বাগান ছিল, তাতে গিয়ে মাসখানেক থাকি। আমার খুব আমোদ, বেলা ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত জলের উপর থাকতুম। বাগানে নেমে স্নান আহারটা সেরে নিয়ে, আবার ওঠা হত। তারপর রাত্রি ৮টার পরে নেমে বৈঠকখানায় শোওয়া হত। কর্তামণির বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে, সাহেব ডাক্তার ব্যবস্থা দেয় কিছুদিন জলে জলে বেড়ালে উপকার হবে। তবে কর্তামণি বড়ই ভীতু

ছিলেম, তাঁর রাত্রে বোটে থাকতে সাহস হত না, সেইজন্য ঐ বাগানে
 নেমে থাকা হত। আর রান্না, ভাঁড়ার, লোকজনের থাকা, সবই
 বাগানেই ছিল। এক মাস থেকে কর্তামণির একটু সুস্থ ভাব হয়,
 কিন্তু তাঁর আর ভাল লাগল না। দাদার পড়া কামাই, আমিও যাহোক
 টটা টিটি করি, তাও বন্ধ; এইসব নানা কথার আলোচনা করে,
 কর্তামণি বলেন আর নয়, বাড়ী চল; পরদিনই আমরা বাড়ীর দিকে
 আসতে লাগলুম, দু'রাত বুকি বজরায় যুমতে হয়, ভাঁটার টানে টানে
 তবে তিন দিনে কলকাতায় পৌঁছলুম। তার দিনকয়েক বাদে এক-
 দিন সন্ধ্যাকালে, একটী আধবুড়ো লোক এল, তার কালো রং, নাকটী
 খুব মোটা, খাঁদা, আর ঠোঁট দুটীও খুব মোটা, মাথায় আধপাকা আধ-
 কাঁচা চুল, সেগুলি সব খোঁচা খোঁচা হয়ে উর্দ্ধমুখে আছে; চক্ষু দুটী
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাও আবার কোটরে প্রবিষ্ট; আর তায় সাজ একখানি সরু
 লালপাড় ধুতি, আর গলায় একখানা কোঁচানো চাদর, পরে মনে পড়ে
 গেল গলায় দু'কণ্ঠী মালা, হাতে একটী ছাতা। তখন আমি বেড়িয়ে
 এসে প্রায় দিদিমার কাছেই সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকতুম; দিদিমা মহা-
 ভারত রামায়ণ পড়তেন, আবার কোনদিন পদ্মপুরাণ, কি যোগবাশিষ্ঠ
 রামায়ণ পড়তেন। আমার শুনতে খুব ভাল লাগত। আবার কোন
 দিন আমায় আস্তে আস্তে ভাল উপদেশ দিতেন,—এমনি করে' শশুর
 বাড়ী যেয়ে ননদকে ভক্তি করবে, ননদের আর কেউ নেই, তিনি
 শশুরবাড়ী থেকে এলে প্রণাম করবে; তোমার সব জায়েরা
 আছেন, তাঁদের কথা শুনবে, তাঁদের সব ছেলেমেয়ে আছে, তাঁদের
 সঙ্গে ভাব করে খেলা করবে, যেন কখনও কাউকে 'মারাধরা
 কোরনা। যদিও দিদিমা জানতেন যে, আমি কখনও কারও ছেলে

মেয়েকে মারিনি, তবু আমার ভবিষ্যতের জন্ম শিক্ষা দিতেন। সেই যে অপক্লপ সুন্দর মূর্তিটাকে বসিয়ে রেখেছি, এখন তার কথা হোক। সে বুড়ো বলছে—আজ্ঞা মা, বড় মা পাঠালেন, তাঁর ছোট ছেলের বউটা ও-মাসে মারা গেছেন, একটা ১ বছরের মেয়ে রেখে গেছেন। তাই মা তাঁর বিবাহের জন্মে একটা মেয়ে খুঁজছেন,—যদি আপনার পৌত্রীটির সঙ্গে দেন, তাহলে এই শ্রাবণ মাসে বিবাহ হয়ে যায়। দিদিমা একটু ইতস্ততঃ করে বলেন যে, তোমাদের ছোট বাবুর ছেলেটা কেমন, তাঁর বিবাহ কবে হবে? দিদিমা একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন, কেননা ছোট বাবু ছেলের সঙ্গে স্থির করে গেছেন, সে ছেলেকেও ঐ গিন্নিই মানুষ করেছেন; আবার নিজের ছেলের জন্মে বলে পাঠালেন,—এর ভাবটা কি বুঝতে হবে। তখন ঐ লোকটা বলছে যে, ঐ বড়মার ভাইঝি আছেন দুটা, তার বড়টা খুব সুন্দরী, তার সঙ্গে সে বাবুর বিয়ে দিতে মা'র খুব ইচ্ছা, তবে এখনও কিছু ঠিক নেই। তখন দিদিমা একটু ভাব পেলেন, বলেন আচ্ছা, তুমি কাল একবার এস, ও মেয়ে এখন ছোট, এই আট বৎসরে চলছে, আর ওর মা বাপকে বলি, আমি এখনি কি বলব। পরে বুড়ো আর একটা প্রণাম করে চলে গেল। দিদিমা সব কাণ্ড শুনে আর থাকতে পারলেন না, মাকে ডেকে বলেন—আবার বিয়ে টলমল, এখন কোন আশা নেই।

এইরকম কথাবার্তা হয়ে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আর এখন কোন ঘটনা নেই। আমার বোনগুলি যে মারা যায় তা' আগেই লিখেছি। এখন একটা খোকা ছিল, আমি আর দাদা। আমি দাদার সঙ্গে একদিন একদিন লুকিয়ে স্কুলের গাড়ীতে উঠে বসে থাকতুম, কেউ জানতে পারত না, পরে খোঁজ নিয়ে শুনতেন। আমার দাদা

তখন পড়তেন নর্ম্যাল স্কুলে, আমি একটু স্কুলে বেড়িয়ে চলে আসতুম। সেইবার পোষ মাসে সপ্তম এডওয়ার্ড আসেন, কলকাতার খুব ধুম পড়ে' যায়, আলোকমালায় সজ্জিত করা হয় ; তবে এখনকার মত বৈদ্যুতিক আলো তখন আবিষ্কার হয় নি, ল্যাম্পে রং গুলে গুলে বাহারি করে সাজানো হয়েছিল, আর গ্যাস্। তবে বাজি নানাপ্রকার হয়েছিল। জগদানন্দের বাড়ী বরণ হয়েছিলেন, আমরা আহাজ দেখতেও গিয়েছিলুম। জাহাজের নীচের গহ্বরে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু ছিল, তাদের দুধ বাদসা খেতেন; তাদের গায়ের রং সাদা ধবধবে, তার ভিতর থেকে গোলাপী আভা বেরচ্ছে। তারপর দোতলায় খানার তদ্বির হচ্ছে, তেতলায় সব আফিস ঘর, পল্টনরা পাহারা দিচ্ছে, আর সুবরাজ চৌতলায় থাকেন। এক এক করে' সব ঘরগুলি দেখলুম, বড় চমৎকার; আয়নার দরজা আর রকম রকম মখমল-মোড়া কোঁচ সোফা ছিল, বড় বড় আয়না টাঙ্গানো। এক ঘরে প্রকাণ্ড স্নানের টব, আলনা, আয়না, টয়েল করবার সব জিনিস ; আর একটি ঘর লাইব্রেরি, তাতে সব সোনালীমোড়া বাঁধানো বই আর টেবিলচেয়ার সাজানো ছিল; আবার তাস খেলবার একটা টেবিল ছিল, তার চারদিকে চেয়ার দেওয়া। শোবার ঘরটা অন্য ধরণের সাজানো, খাট মশারী আয়না ফুলদান, মোটা কারপেট মোড়া ছিল। আমার কর্তামণি আমায় কিছু দেখাতে কি খাওয়াতে পরাতে বাকি রাখেন নি, যখন কলকতায় যা নতুন হবে, সারকাস্, ইংরাজি থিয়েটার, ফেন্সি-ফেয়ার—সব দেখাতেন ; মিউজিয়মে প্রায় যেতুম, জুলাজিকলে মাসে একদিন যাওয়া হত ; আমার বেড়াবার আমোদটা বড় ছিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে ।

(সিংহল হতে নেপাল)

৩।

কবির আশপাশের জীবনযাত্রা ।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্বানুবৃত্তি]

২২ নবেম্বর ।—আজ সকালে বেলা ৭টায়, কর্তার জন্ম দর্জি হাজির । এই দর্জিটির বেশ-বিন্যাস নেহাৎ মন্দ নয় বলতে হবে, যেহেতু তার পরণে পাজামাও নেই, জুতাও নেই ; কিন্তু একটা ময়লাটে গামছাগোছ কাপড় বেশ জাঁকালোরকমে গায়ে জড়ানো রয়েছে । মুখটি কালো, চোখ দুটি জ্বল্জ্বলে । সে গায়ের মাপজোখ এমনভাবে নিলে, যেন নিউটন তাঁর গণনা করছেন । * * *

* * * * *

তারপর ফি—বাবুর আগমন ; ইনি আমাদের বিশেষ জগতের শক্তিমান পুরুষদের মধ্যে একজন । ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম্য সঙ্গীত, কিশদন্তি প্রভৃতি মস্ত এক লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন । জাতিতে বৈষ্ণ হওয়ার দরুণ চিকিৎসাবিজ্ঞা তাঁর জানা আছে এবং তাই নিয়েই গুছিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় ঠাকুরমশায় তাঁকে আসতে লেখেন । তিনি উত্তরে লিখলেন : আপনার কাছে যাবার উপযুক্ত উঁচুদের মানুষ আমি নই ; প্রত্যুত্তরে আবার কবি লিখলেন “আমি নীচুদের মানুষই চাই ।” ফলে ফি—বাবু পরাস্ত হয়ে আশ্রমে বাস করতে এলেন ।

ঠাকুরমশায়ের আকর্ষণী শক্তি, তাঁর লোককে লওয়াবার ও চুম্বকবৎ টানবার ক্ষমতা বাস্তবিক অদ্ভুত। এই যে নিভৃত মনোরম বিছাপীঠ, কতকটা আমাদের Port Royal-*এর মত, অথচ তার চেয়ে হাশ্চাঙ্গুল, কোমল, আনন্দময়,—এখানে বাসকালীন আমার কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধুর কথা মনে পড়ে, যাঁরা থাকলে এই সরল অনাড়ম্বর জীবনের মর্যাদা বুঝতে পারতেন; যে-সব বাইরের ঠাট বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে আমরা কাতর, যে-সব প্রয়োজনের বোঝায় আমরা এমন ভারাক্রান্ত, প্রতিবেশীর নকল করা ও সমকক্ষ হবার যে আকাঙ্ক্ষা বা আবশ্যিকতা আমরা অনুভব করি—তার থেকে মুক্ত এই জীবন; এই শান্তি তাঁদের কাছে কত না উপভোগ্য হত, তাই ভাবি।

এই বুধবার ২৩শে, ৭টার সময়, মন্দিরে উপাসনা; মন্দিরটি কাঁচ ও লোহা দিয়ে তৈরি একটি অতি কদাকার ইमारৎ; শুনতে পাই তার জন্মে নাকি কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দায়ী। অনুষ্ঠানের মধ্যে জটিলতা কিছুই নেই; মন্দিরের ভিতরে ইস্কুলসুদ্ধ লোক,—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ছাত্র,—সকলেই কবিকে ঘিরে বসে; বাইরে সিঁড়ির উপর স্ত্রীলোক ও ছোট মেয়েরা থাকে। উপনিষদের শ্লোকপাঠ ও বাঙ্গলায় তার ব্যাখ্যা পড়া হয়; পোনে ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়।

পরদিন সকালে উঠে আমার শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হল। বারান্দায় একটা লম্বা চৌকিতে আস্তানা গাড়লুম; পশ্চিমখোলা বলে' এখানে সারা সকালটি সুন্দর ঠাণ্ডা থাকে; দুপুর পর্যন্ত সেই

* বিখ্যাত ফরাসী খৃষ্টধর্মসম্প্রদায়।

খানে কাটালুম, ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করলুম, পড়লুম, লিখলুম। কিন্তু যতই সূর্যের তেজে আকাশের আলো বাড়তে লাগল, আমারও তত বেশি অসুখ করতে লাগল; এই আলোটাই আমার অস্বস্তির কারণ, সে বিষয় সন্দেহ নেই; অথচ সকালে কেমন সাদা, নরম ও পরিষ্কার থাকে। শেষে কি এর সৌন্দর্যের মায়া কাটাতে হবে? সেই কুৎসিত কালো চষমাগুলি ভিন্ন কি গতি নেই? * * * সন্ধ্যাবেলা সেই ভিক্ষু (বৌদ্ধ সম্মাসী) তাঁর বাচ্ছা ভিক্ষু এবং একটি সিংহলী যুবককে সঙ্গে করে' আমার খোঁজ নিতে এলেন; তাঁরা ভদ্রোচিতভাবে জানতে চাইলেন আমি কোন ওষুধ খেয়েছি কি না? আমি ওষুধপত্র সম্বন্ধে আমার অনাস্ত্রা প্রকাশ করলুম। তারপর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রার্থনায় কি উপকার হওয়া সম্ভব নয়?—আমি বললুম নিশ্চয়ই, কেন হবে না। তখন তাঁরা আমার সূতোর রীল থেকে লম্বা এক খেঁই সূতা টেনে বের করে' নিয়ে দড়ি পাকালেন, ভিক্ষুটি তার একদিক ধরলেন, আমি আর এক দিক ধরলুম, বাচ্ছা ভিক্ষু মাঝখানটা ধরলে (বোধহয় যাতে আমাকে না ছুঁয়েও যোগাযোগ স্থাপন হয়)—তারপর তাঁদের ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সুদীর্ঘ বৌদ্ধ উপাসনামন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল। প্রার্থনা শেষ হলে আমি স্বীকার করলুম যে, এরই মধ্যে আমার অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে। তাঁরা সূতোটা গুটিয়ে নিয়ে আমাকে বল্লেন রাত্রে বালিশের তলায় রেখে দিতে, তারপর কাল সকালে তাঁরা এসে আবার আরম্ভ করবেন। কিন্তু যখন তাঁরা এলেন, তখন আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে' আমার ভৌগলিকের সঙ্গে পড়াশুনা করছি। ওঁরা সম্প্রতি যে বৌদ্ধ-সম্মিলনীতে যোগ

দেবার জগু কলকাতায় যাচ্ছেন, তা'তে এই সুন্দর গল্পটি বেশ বলতে পারবেন।

* * * * *

এখানকার ইস্কুলটি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে অভিনব প্রতিষ্ঠান। কবি যখন অবসর গ্রহণ করে' তাঁর পিতার কাছে শান্তিনিকেতনে নির্জনবাস করতে এলেন, তখন গুটিকতক ছেলেকে তাঁর মত এবং ইচ্ছানুযায়ী গড়ে' তোলবার সঙ্কল্প করলেন। প্রথমে অল্প কয়েকজন এল। ধর্ম্য এবং সামাজিক আচারব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা অবলম্বন করাই ছিল প্রথম ও মূল নিয়ম। প্রথম প্রথম কোন কোন ছেলে নিম্নতর জাতের সঙ্গে একত্রে বসে' খেতে একটু অপ্রবৃত্তি বোধ করত, তাদের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে চলবার স্বাধীনতা দেওয়া হত। ক্রমশঃ হিন্দুর প্রাণে একান্ত গভীরভাবে বন্ধমূল এই কুসংস্কার একটু শিথিল হল, এবং এখন অধিকাংশ ছেলেই ভ্রাতৃভাবে একত্রে বসবাস করে। কেবলমাত্র জনকতক গুজরাটী ও মারহাটী বেশী গোঁড়া ছেলে এখনো আলাদা খায়। * * * ছেলেরা খুব ছোট, ১২ বৎসর বয়সের কম না হলে নেওয়া হয় না। এখানকার শিক্ষাসোপান তাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়; এবং এখন থেকে আশ্রমে অন্ততঃ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত হতে পারবে, কারণ বিশ্ব-ভারতী বা আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভোর ৫টায় ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটবড় সকলকে ঘুম থেকে তোলা হয়। তারপর গান, উপাসনা, ধ্যানধারণা; গান দিয়েই আবার দিন শেষ হয়। খাওয়াদাওয়ায় নিরামিষের ব্যবস্থা কড়াকড়; শোবার ঘর

ছেলেরা নিজেই সাফ করে। তাদের বিছানা?—এক তক্তা-পোষের উপর একটা কাপড় ঢাকা; ঘরকন্নার কাজে বিশেষ সময় লাগে না। তারা কিছুদিনের জন্মে এক একজনকে নেতা বা কাপ্তেন পদে বরণ করে, সে নিজের দলের তত্ত্বাবধান করে; দেখে শুনে ত 'মনে হয় বেশ নিখির্কিচে সংসারযাত্রা চলে' যাচ্ছে।

২৬ নবেম্বর।—সকালেই কবির আগমন, তিনি শিষ্টিতাপূর্বক আমার খবর নিতে এসেছেন। দীর্ঘ কথোপকথন, আমি সানন্দে শুনতে লাগলুম। তিনি শ্রাস্ত, তিনি সহরের হাঙ্গাম ও হুজুৎ এড়াবার জন্মে এখানে বাস করতে এলেন, আর তাঁর চারপাশে এখানেই এক সহর গড়ে' উঠছে। যেন এমন প্রাগপ্রতিষ্ঠাতার চতুর্দিকে দূরতম বিজনতাও লোকালয় হয়ে উঠতে বাধ্য নয়। কৃষি বিদ্যালয় গড়ে' তোলবার উদ্যোগ হচ্ছে, তাঁর স্কুলের জমিতে তার পস্তন করেছেন। সেটি আশ্রমের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড বড় বাড়ী, তার বাগান এত মস্ত যে এখান থেকে মনে হয় যেন একটি ছোট বনবিশেষ। ভারতের জাতীয় কবি তাঁর দেশের তরুণদের রাজোচিত দানখয়রাৎ করছেন।

২৭ নবেম্বর।—বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে সি—এর বক্তৃতা। কলকাতা থেকে জন কুড়িক শ্রোতা এসেছিল, তার মধ্যে তিনজন বক্তৃতার পর আমাদের এখানে এসে অনেকক্ষণ রইল। প্রথমে লেখাপড়া পরীক্ষাদি সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়ে পরে রাজনীতির কথা উঠল,—যে রাজনীতিতে এদের সমস্ত জীবন এমন ওতঃপ্রোত, এবং লেখাপড়ার চর্চা এমন ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চলে' যেতে না যেতে অপর একটি যুবক এল, যার ভাইকে আমরা প্যারিসে চিনতুম। সেই একই প্রসঙ্গ প্রায় একই

ভাষায় উত্থাপিত হল। এই বৃহৎ দেশের মানসিক তিক্ততা, আর এই দুই বৃহৎ জাতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভরা বিরুদ্ধতা দেখলে খারাপ লাগে। দিনশেষে আমরা শুতে যাব মনে করছি, এমন সময় জোসেফ তার হিসেব নিয়ে এল। আসুছে হুপ্তায় অবশ্য সে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ও পরে নেপালে যাবে,—কিন্তু “সাহেব মেমসাহেবের কাশ্মীর যাওয়া উচিত নয়, সেখানে গোলমাল হবার সম্ভাবনা।” পরে এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যান শুরু হল,—এবারত ওর পালা,—তা’তে জর্মান ও অষ্ট্রিয়ানরা (কখনো কখনো তাদের বল্ছিল অষ্ট্রেলিয়ান) বোলশেভিকদের সঙ্গে মিলেমিশে একটা ডিটেক্টিভ উপন্যাসের খেলা খেলতে লাগল। “আর আফগানিস্তান—এই কাবুলীরা কাশ্মীরীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, তারাই কাশ্মীর নিয়ে নেবে! সত্যি, বাজারে অনেক জিনিষ শোনা যায়, যা’ সাহেবরা জানেন না।” সেকন্দরশাহা এখনো জীবিত, অথচ এরই মধ্যে তাঁর রাজ্যভাগ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধ্যায়, খাবার আগে, কলাভবনে সন্মিলন। আমরা যখন এলুম, সবাই সেখানে জড় হয়েছে ও আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে—সেই স্তব্ধ নিশ্চল ভাবে যা’ প্রাচ্যদেশের বিশেষত্ব, যদিও এ দেশের লোক চোঁচাতে ও হাত পা নাড়তে বিলক্ষণ পারে। একটি যুবক বক্তৃতা করলে, এ ভবনের সে একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র, এবং তার উপরেই এঁদের আশাভরসা; তার বয়স বছর আঠারো, মুখ চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত প—সাহেব বলে’ একজন ফরাসী ভারতবাসীর পোষ্যপুত্র। সে “দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু আচারব্যবহার” সম্বন্ধে বলে। তার বক্তৃতা হয়ে গেলে পর—সব চুপ। ফরাসী

অধ্যাপক বলেন যে, এই সাধারণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গবেষণার ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করে' আনলে ভাল হয় ; যদি কোন যুবক, নিজের ঠাকুরদাদার আমল থেকে নিজের আমল পর্য্যন্ত তার আপন পরিবারের আচারব্যবহার তার চোখের সামনেই কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, শুধু সরলভাবে তাই লিপিবদ্ধ করে, তাহলেও মহৎ উপকার সাধন হয়। একজন মারাঠী সেকালের আচারবিচার সম্বন্ধে একালের শৈথিল্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ঠাকুরমশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ অথচ মহান ভাবে আলোচনাকে উচ্চতর স্তরে তুলে ক্রমোবিকাশের আবশ্যিকতার কথা বলেন, যা' নইলে জীবনের অস্তিত্বই থাকে না।

(ক্রমশঃ)
